লীলা মজুমদার ও সেকেন্দার আলি সেখ সম্পাদিত

সেরা ভূত সেরা গোয়েন্দা

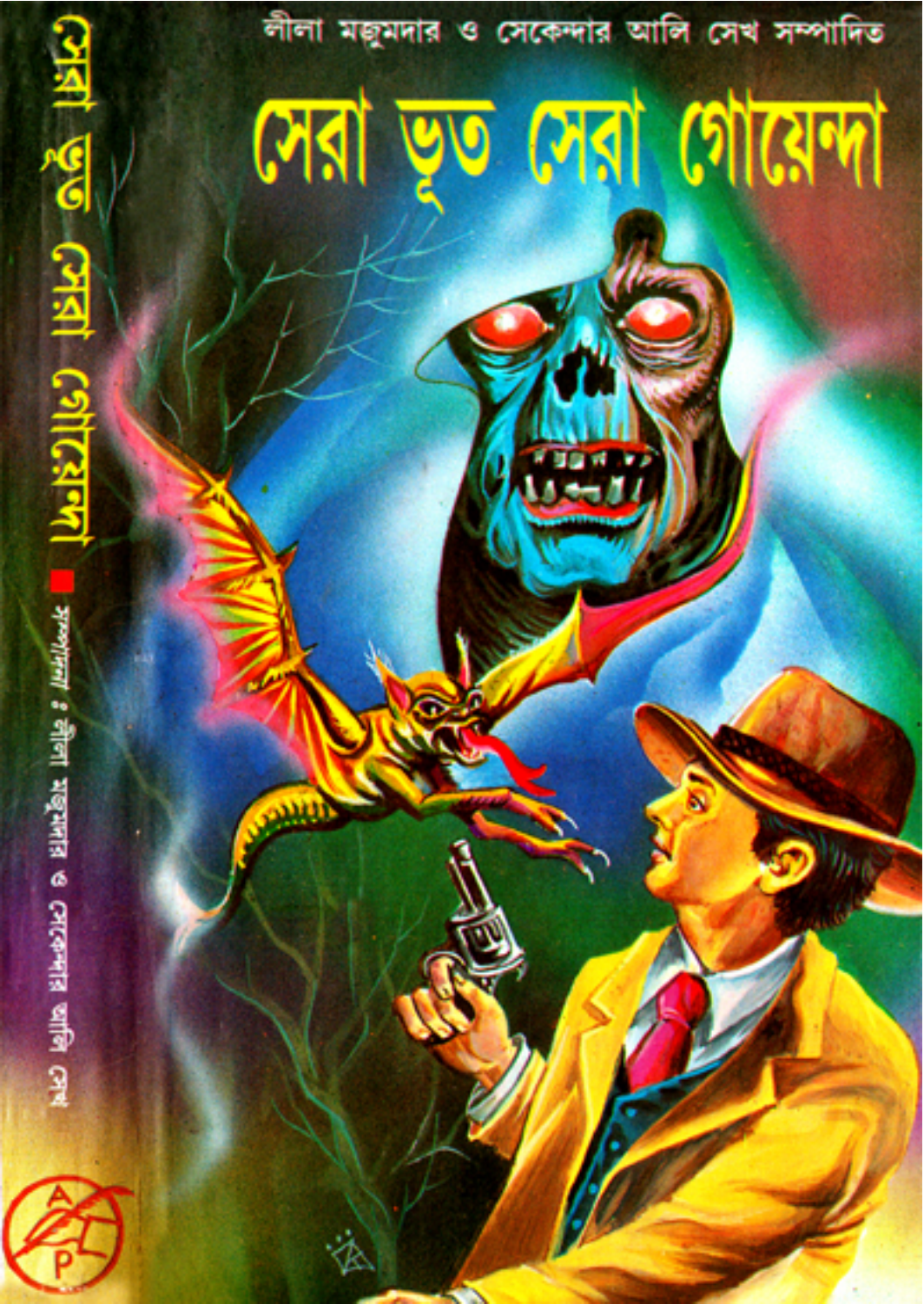

সেরা ভূত সেরা গোয়েন্দা ■ সম্পাদনা ঃ লীলা মজুমদার ও সেকেন্দার আলি সেখ

সেকেন্দার আলি সেখ সম্পাদিত

সেরা ভূত সেরা গোয়েন্দা

ভূমিকা ঃ লীলা মজুমদার

আনন্দ প্রকাশন

স্টল-৪২, ভবানী দত্ত লেন
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা- ৭০০ ০৭৩

SERA BHUT SERA GOENDA Rs. 45

Edited by

SEKENDER ALI SHAIKH

B.Com, B.A (Spl), B.Ed (Ist class), M.A (Beng), M.Ed (1st Class)..

Lecturer : Minority Post Graduate Basic Training College.

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ মহালয়া, ১৯৯৯

প্রকাশিকা ঃ কৃষ্ণা মণ্ডল

১৩৮/৭, বেচারাম চ্যাটার্জী রোড, কলিকাতা- ৩৪

অক্ষর বিন্যাস ঃ লোকনাথ লেজারোগ্রাফার

৪৪এ, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা- ৯

প্রচ্ছদ ঃ অঞ্জন বসু

অলংকরণ ঃ দোলা পুততুণ্ড ও পল্লব পুততুণ্ড

পরিকল্পনা ঃ আনন্দ মণ্ডল

মুদ্রাকর ঃ শ্রীকান্ত প্রেস

কলিকাতা - ৯

মূল্য ঃ ৪৫ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আশিস চক্রবর্ত্তী

শ্রদ্ধাভাজনেষু
যাঁর প্রেরণা আমাদের পাথেয়

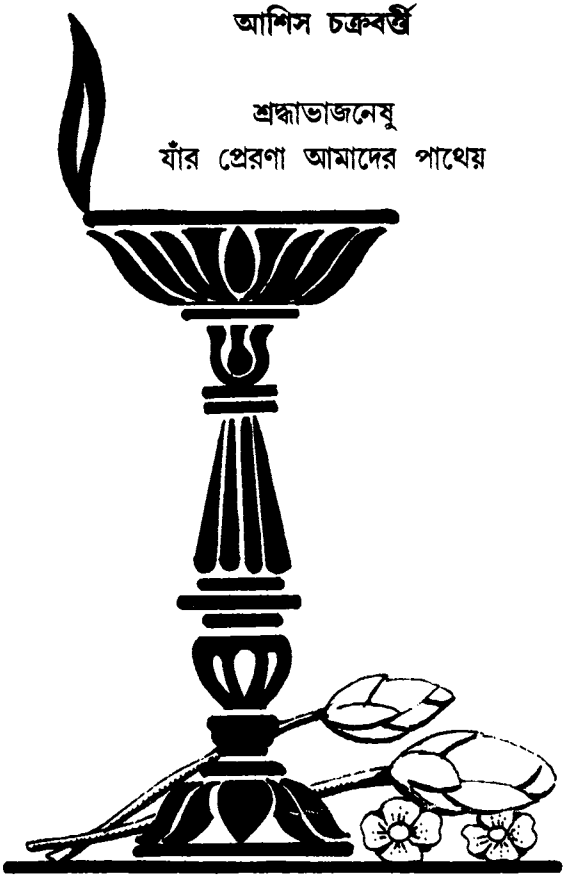

সেকেন্দার আলি সেখ রচিত ও সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থ

- নিশিরাতের ভূত (রামধনু পুরস্কার প্রাপ্ত)
- খুনীর সন্ধানে গোয়েন্দা
- খুশির সানাই
- হাসির বাদশা মোল্লা নাসিরুদ্দিন
- বাংলার সেরা ভূতের গল্প
- বাংলার সেরা হাসির গল্প
- সেরা ভূত সেরা গোয়েন্দা
- চৌরঙ্গী (নবম মুদ্রণ)
- চারমূর্তি (পঞ্চম মুদ্রণ)
- ছড়ায় ধাঁধা
- সোনার কাঠি রূপোর কাঠি
- ভূতের মেয়ের বিয়ে
- ভূত চলেছে শ্বশুরবাড়ি
- ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প
- দুই বাংলার বাছাই ছড়া
- দুই বাংলার বাছাই গল্প
- দুই বাংলার বাছাই ভূতের গল্প
- সেরা সায়েন্স ফিকসন
- ভূতের কীর্তন
- ডাইনির কালো বিড়াল
- রক্তখেকো ভূত
- দি বেস্ট সায়েন্স ক্যুইজ কনটেস্ট
- ছড়ায় হোমিওপ্যাথি
- এপার বাংলার ওপার বাংলার নির্বাচিত কিশোর গল্প
- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প
- শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প
- রক্তপিপাসু ড্রাকুলা
- শ্রেষ্ঠ কমেডি অমনিবাস
- সুকুমার রায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

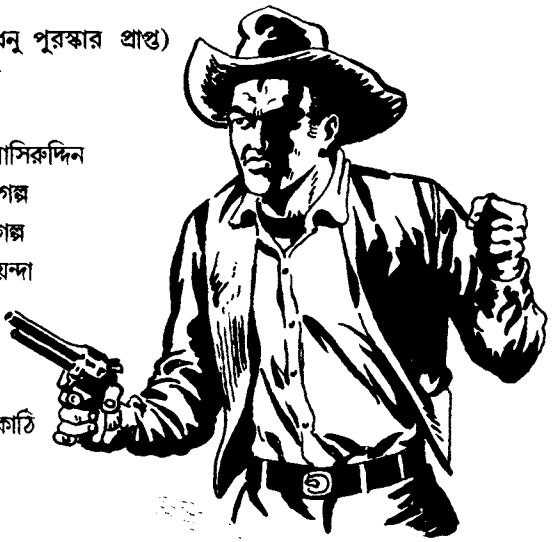

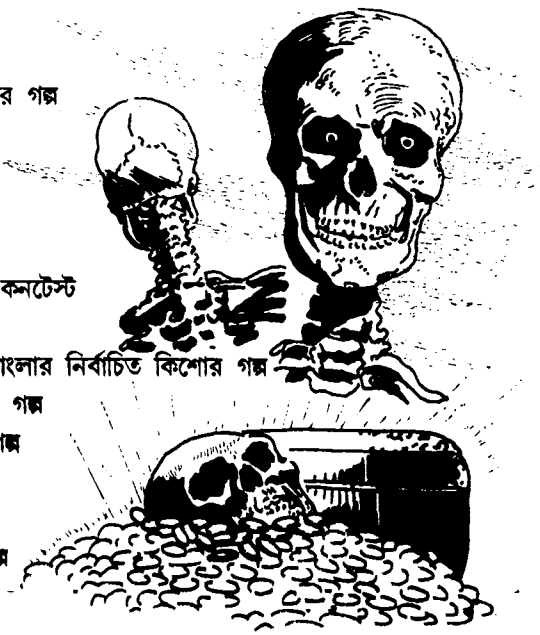

ভূমিকা

ছোটরা ভূত আর রহস্য গল্প পেলেই হুড়োহুড়ি করে পড়ে। ভূতের গল্পে পায় তারা গা ছমছম করা অনাবিল এক মজার স্বাদ। আর গোয়েন্দা গল্পে খুঁজে পায় টানটান উত্তেজনা। তাই, আদ্যিকাল থেকেই ঠাকুরমা—ঠাকুর্দারা বাড়ির দাবায় বসে ছোটদের ভূতের গল্প শুনিয়ে আসছে। কিন্তু ইদানিং সেই পরিবেশ নেই। তাই দরকার মজার-মজার শিহরণ জাগানো ভূতের গল্প। তেমনি গোয়েন্দা গল্পের নাম শুনলে ছোটদের ঘুম টুটে যায়। রহস্যের জাল উন্মোচন করার জন্য, স্কুলের বই পড়ার ফাঁকে ছোটরা গোয়েন্দা গল্পের বই এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলে। ভালো-ভালো গোয়েন্দা গল্প পড়ে, হিসেব- নিকেশ করতে করতে ছোটরা নিজেদের বুদ্ধি শানিয়ে নেয়। শ্রীমান সেকেন্দার আলি সেখ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে 'সেরা ভূত সেরা গোয়েন্দা' সম্পাদনা করেছে। ইতোমধ্যে তার সম্পাদিত ছোটদের উপযোগী বিভিন্ন সংকলন যেভাবে সবার মন কেড়েছে, তেমনই এই সংকলন নিঃসন্দেহে ছোটদের মন কাড়বে। এই সংকলনের ডালিতে বেশ কিছু সেরা সাহিত্যিক ভূত ও গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন যা শুধু ছোটদের কেন বড়দেরও ভালো লাগবে। সবাইকে শুভেচ্ছা ও ছোটদের স্নেহাশীষ জানিয়ে থামছি।

লীলা মজুমদার

সূচীপত্র

গল্পের নাম	পৃষ্ঠা	লেখকের নাম
একটি ভৌতিক কাহিনী	৯	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
সর্বনাশিনী	১৭	পাঁচকড়ি দে
বাড়ি, বুড়ো, বুট	৩৫	হেমেন্দ্রকুমার রায়
বিলুকাকুর চিঠি	৪১	স্বপনকুমার মান্না
হাতে-নাতে পাকড়ানো	৪৮	শিবরাম চক্রবর্ত্তী
রহস্যের সন্ধানে	৫৩	আশাপূর্ণা দেবী
নেপুর নবীকরণ	৬০	লীলা মজুমদার
আলোক ভাষা	৬৭	শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
একটি ভৌতিক রেল ট্রলি	৭৯	বিমল কর
প্রেমলতার হাসি	৮৭	নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
মুর্গি থেকে মামদো	৯৬	সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
রক্তমন্দিরের রত্নরশ্মি	১০৪	অদ্রীশ বর্ধন
পার্বতীপুরের রাজকুমার	১১৩	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গন্ধটা খুব সন্দেহজনক	১২১	শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
নিশির ডাক	১৩১	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
দাঁত বাঁধানো কংকাল	১৩৬	শেখর বসু
জোড়া খুনের তদন্ত	১৪১	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
ডিমাপুরের ডিম রহস্য	১৫৪	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
চন্দ্রদার গোয়েন্দাগিরি	১৬৫	রূপক চট্টরাজ
ডাকিনীর রাত	১৭২	ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত
চুনিলালবাবুর লাল চুনি	১৭৯	অনীশ দেব
মিঃ কাকুম্	১৯৪	সেকেন্দার আলি সেখ
বিড়াল ভূত	২০৫	নিরুপম ঘোষাল

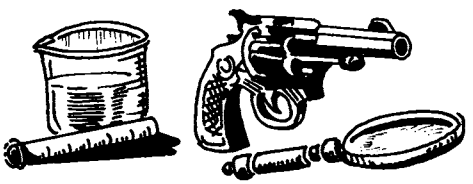

সম্পাদকের নিবেদন

শিশু ও কিশোর সাহিত্যে ভূত ও গোয়েন্দা গল্প সর্বাধিক জনপ্রিয়। গা-ছম্ ছম্ করা ভূতের গল্প ছোটদের মনে যেমন নাম না জানা শিহরণ জাগায়, ঠিক তেমনই রহস্য-রোমাঞ্চভরা গোয়েন্দা গল্প ছোটদের নতুন করে ভাবতে শেখায়, অজানা এক রহস্যের মধ্যে কল্পনাপ্রবণ মনকে শিহরিত করে তোলে।

আসলে, ভূতের গল্প ও গোয়েন্দা গল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে রহস্য। রহস্য মানেই পাঠকমনের কিছু জানা ও কিছু অজানা তথ্য। সেই রহস্যের গন্ধ যেখানে ভূত উঁকি মারে সেখানেই। তাই শুধু আমাদের দেশে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকেরা ভূত-কে নিয়েই চিরায়ত সাহিত্য রচনা করে গেছেন। আমাদের দেশের সব সাহিত্যিক বড়দের গল্প লিখতে লিখতে ছোটদের জন্য মজাদার ভূতের গল্প লিখেছেন। এইসব গল্পের পটভূমিকায় ভয়াল ভয়ংকর রূপে দেখা দিয়েছে—, গেছো ভূত, মেছো ভূত, মামদো, ব্রহ্মদত্যি, দত্যি-দানো, শাঁকচুন্নি, পিশাচ.....। এদের মধ্যে কোনও ভূত কোদালের মতো দাঁত বার করে কামড়াতে তেড়ে আসে, কোনও ভূত শ্যাওড়াগাছের ডালে বসে পা দুলিয়ে ভয় দেখায়, কোনও ভূত পুকুর থেকে মাছ চুরি করে, কোনও ভূত ছিঁচকে চোরের মতো বাড়ির আনাচে কানাচে ঘোরাঘুরি করে, কেউবা ঝড় তুফান তুলে বাড়ির হ্যারিকেন-লণ্ঠন উল্টে দিয়ে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। এইসব বিচিত্রধরনের হিংসুটে বজ্জাত আর বদমাশ ভূতের জন্য ছোটরা ভয়ে সিটকে থাকে। অন্ধকারে বাড়ির বাইরে পা ফেলতে ভয় পায়। ভূতের উপর ঠিক-ঠিক বিশ্বাস না থাকলেও ছোটরা তাই-ই ভূতের গল্প পড়তে ভালবাসে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই, ভূতগুলো যুগের পর যুগ বেঁচে আছে-নির্জন হানাবাড়িতে, পরিত্যক্ত জমিদার বাড়িতে, বর্ষণমুখর খেয়াঘাটে, তেলেভাজার গন্ধমাখা মেলার ভিড়ে, মড়া পোড়ানো শ্মশানে, হাসপাতালে আর লাশকাটা ঘরে।

কল্পনার রাজ্যে চিত্তবৃত্তির খোরাক জোগানোর জন্য বেশ কয়েকজন সেরা সাহিত্যিকদের কয়েকটি সেরা ভূতের গল্প ছোটদের মনের কথা ভেবে এই সংকলনে সাজিয়ে দেওয়া হল।

ঠিক তেমনই ভূতের গল্পের পাশাপাশি, গোয়েন্দা গল্পেরও আকর্ষণ কম নয়। কিশোরমন সব সময় নতুন কে জানতে চায়, অজানা তথ্যের রহস্য উদঘাটন করতে চায়। তবে বিদেশী সাহিত্যে গোয়েন্দা গল্প যতটা প্রাণবন্ত, ঠিক ততটা আমাদের দেশের গোয়েন্দা গল্প স্বাবলম্বী হতে পারেনি। আমাদের দেশের গোয়েন্দা গল্পের একটা পুরানো ট্রাডিশন থাকলেও তার মধ্যে বিদেশী গল্পের প্রাবল্য লক্ষণীয়। ফলেই, বিদেশে ডিটেকটিভ গল্প কিংবা থ্রিলার যখন দারুণভাবে জনপ্রিয়, এবং সেই সব অমূল্য সৃষ্টি-সম্পদ যখন বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হতে শুরু করেছে। তখনও বহুক্ষেত্রেই আমাদের দেশের গোয়েন্দা গল্প রহস্য সৃষ্টিতে পিছিয়ে, পিছিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সূক্ষ যুক্তি তর্কের মাধ্যমে অপরাধকর্মীদের চিহ্নিত করতে। তবুও সুখের বিষয়-বাংলা সাহিত্যের বেশ কয়েকজন লেখক রয়েছেন যাঁরা বিদেশী অনুকরণপ্রিয়তা সজ্ঞানে এড়িয়ে, এ দেশের পরিবেশ-পরিস্থিতি, এ দেশের সাজ-সরঞ্জাম ও মাল মশলা নিয়ে যথার্থ গোয়েন্দা গল্প উপহার দিচ্ছেন। এইসব গল্পের উপাদানে লুকিয়ে আছে শিহরণ, গল্পের পরতে- পরতে শুধু রহস্য উন্মোচনের খেলা ও জমজমাট রহস্যের ঠাস বুনোট।

এই ধরনের বেশ কয়েকজন সেরা ও কালজয়ী সাহিত্যিকদের কয়েকটি সেরা গোয়েন্দা গল্প এই সংকলনে সাজিয়ে দেওয়া হল। গল্পের এই ডালি পেয়ে ছোটরাও গোয়েন্দা হবার চেষ্টা করবে। শুধু ছোটরা কেন সব বয়সের চিরঞ্জীব মনের শিশুরাও পাবে অনাবিল মুক্তির স্বাদ, মনের খোরাক।

ফলেই, একদিকে ভূতের গল্প অন্যদিকে গোয়েন্দা গল্পের সংমিশ্রণে 'সেরা ভূত সেরা গোয়েন্দা' সহজেই পাঠকমন জয় করতে পারবে। বাছাই করা গল্পগুলো পাঠক পাঠিকদের মনে শিহরণ জাগাবে।

সংকলনটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আনন্দ প্রকাশনের কর্ণধার-বন্ধুবর আনন্দ মণ্ডল ও প্রকাশিকা কৃষ্ণা মণ্ডল যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। এই সংকলনে যে সব লেখক তাঁদের মূল্যবান লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন সেইসব যশস্বী লেখকদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নয়। তেমনি কৃতজ্ঞতা জানাই-প্রয়াত লেখকদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে।

এই সংকলনটি পাঠে ছোটরা খুশি হলে, আমিও খুশি হব।

একরাশ অজস্র শুভেচ্ছাসহ—

সেকেন্দার আলি সেখ

একটি ভৌতিক কাহিনী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার নাম শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ। নিবাস বীরভূম জেলার টগরা নামক গ্রামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আমি বি. এ. পাশ করিয়া চাকরীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হই। কয়েকমাস ধরিয়া বহু স্থানে বহু আবেদন করিলাম কিন্তু কোনরূপ ফল হইল না। অবশেষে সিউড়ী জেলা স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হইয়াছে সংবাদ পাইয়া স্বয়ং সদরে গিয়া বহু লোকের খোসামোদ করিয়া উক্ত কর্মে নিযুক্ত হইলাম। আমার বেতন হইল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

আমাদের গ্রাম হইতে সিউড়ী বারো ক্রোশ পথ ব্যবধান। বরাবর একটি কাঁচা রাস্তা আছে। আমি গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিজের জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া দুই দিন পরে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হইলাম। যেমন অল্প বেতন, সেইরূপ একটি ছোটখাটো সস্তা বাড়ি খুঁজিতে লাগিলাম। কিন্তু পাইলাম না। হেড্ মাস্টার মহাশয়ের বাসাতেই শয়ন ও আহারাদি করি, দিবসে বিদ্যালয়ে কর্ম করি, এবং অবসর সময়ে বাসা খুঁজিয়া বেড়াই। অবশেষে শহরের প্রান্তে একটি বৃহৎ খালি পাকা বাড়ির সন্ধান পাইলাম। বাড়িটি বহুকাল খালি পড়িয়া আছে। স্থানে স্থানে ভগ্ন তথাপি বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘর তাহাতে ছিল। মাসিক পাঁচ সিকা মাত্র ভাড়া দিলেই বাড়িখানি পাওয়া যায়। কিন্তু গুজব এই যে বাড়িটিতে ভূত আছে। তখন আমি সদ্য কলেজের ছোকরা—

ইয়ংবেঙ্গল —ভূতের ভয়ে যদি পশ্চাৎপদ হই তবে আমার বিদ্যা—মর্যাদা একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। সুতরাং বাড়ি লওয়াই স্থির করিলাম। কিন্তু অত—দূরে একাকী থাকা নিরাপদ নহে। চোর—ডাকাতের ভয়ও তো আছে—তাই একজন সঙ্গী অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। একজন জুটিয়াও গেলেন, তিনি আমাদেরই স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক—নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। যদিও তিনি বি. এ. পাশ করেন নাই, তথাপি কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং নিজেকে ইয়ংবেঙ্গল শ্রেণীভুক্তই মনে করেন। তাঁহার পূর্ব বাসায় কিছু অসুবিধা হইতেছিল, তাই তিনি আমার সহিত যোগদান করিয়া সেই বাড়িটি লইতে প্রস্তুত হইলেন। একজন পাচক ব্রাহ্মণ স্থির করা গেল কিন্তু তাহারা রাত্রিকালে সে বাড়িতে থাকিতে অস্বীকৃত হইল, বলিল কাজকর্ম সারিয়া, আমাদিগকে খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া রাত্রি নয়টার মধ্যেই আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাইবে। কি করি, তাহাতেই সম্মত হইতে হইল। পরবর্তী রবিবার প্রাতে জিনিসপত্র লইয়া সেই বাড়িতে গিয়া বাসা করিলাম।

বাড়িটি বহুকালের নির্মিত। চারিদিকের প্রাচীর স্থানে স্থানে ভগ্ন, গো-মহিষাদি নিবারণ করিবার জন্য বাঁশের বেড়া বাঁধা আছে। বাড়িটির চারিদিকে বাগান। অনেকগুলি নারিকেল, আম, কাঁঠাল, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ আছে। সেগুলি ফড়িয়াগণের নিকট জমা দেওয়া। বাড়িটি দ্বিতল। নিম্নতলে সম্মুখভাগে বেশ বড় বড় দু'খানি ঘর আছে, সেই ঘর দু'টি মাত্র আমরা দখল করিলাম কারণ আমাদের প্রয়োজন অল্প। বাড়ির পশ্চাতে একটি পুষ্করিণী তাহার জল পানযোগ্য নহে, স্নানযোগ্যও নহে, তবে বাসনমাজা প্রভৃতি গৃহকর্ম তাহাতে হইতে পারিত। বাড়ির অল্পদূরে একটি উৎকৃষ্ট দীর্ঘিকা ছিল, আমরা সেইখানে গিয়াই স্নান করিতাম, এবং পান-রন্ধনের জন্য সেই জল আনয়ন করিত। একখানি ঘর আহারাদি করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলাম। অপরখানিতে দুইটি চৌকি পাতিয়া আমরা দুইজনে শয়ন করিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি ঘরে প্রদীপ জ্বালা থাকিত।

এইরূপে কিছুদিন যায়। ইতিমধ্যে দশহরার দুইদিন ছুটি হইল, সেইসঙ্গে একটা রবিবারও পাওয়া গেল। আমি বাড়ি গেলাম।

বাড়িতে দুইদিন মাত্র থাকিয়া তৃতীয় দিন পদব্রজে সিউড়ী যাত্রা করিলাম। আমাদের গ্রামের এক ক্রোশ পরে হাতছালা বলিয়া একটি গ্রাম আছে। পূর্বে এখানে স্থানীয় জমিদারের অনেকগুলি হাতি বাঁধা থাকিত, হাতিশালা হইতে

হাতছালা নামটি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই গ্রামের প্রান্তে সড়কের ধারে একটি মন্দির আছে সেই মন্দিরে রমাপ্রসন্ন মজুমদার নামক একজন ব্রাহ্মণ সর্বদা বাস করেন এবং আপনার তপজপে নিযুক্ত থাকেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করে। সেইখান দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, মজুমদার মহাশয় খড়ম পায়ে দিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া রাস্তা হইতে নামিয়া গিয়া আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আশীর্বাদ করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"বাবা, তুমি কোথা যাইতেছ?"

আমি উত্তর করিলাম—"সিউড়ি স্কুলে আমার মাস্টারি চাকরী হইয়াছে। দশহরার ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছিলাম। কল্য স্কুল খুলিবে, তাই ফিরিয়া যাইতেছি।"

মজুমদার মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ কি তোমার না গেলেই নয়? আজ বাড়ি ফিরিয়া যাও, কল্য তখন যাইও।"

আমি বলিলাম—"কল্য স্কুল খুলিবে। আমার নূতন চাকরী, কামাই হওয়াটা বড়ো খারাপ কথা, সুতরাং আমাকে ও-রূপে আজ্ঞা করিবেন না।"

মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি কোথায় বাসা লইয়াছ?"

—"শহরের দক্ষিণাংশে একটি পুরাতন খালি বাড়ি ছিল, সেইটি ভাড়া লইয়া আমি ও আমাদের স্কুলের অন্য একটি মাস্টার রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় একত্র বাসা করিয়াছি।" বলিয়া মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আমি পথ চলিতে লাগিলাম।

বেলা আন্দাজ দুইটার সময় সিউড়ী পৌঁছিলাম। স্নানাহার করিতে পাঁচটা বাজিয়া গেল। আহার করিয়া বারান্দায় বসিয়া তামাক খাইতেছি, এমন সময় দেখি আমাদেরই গ্রামের একজন কৈবর্ত বৃহৎ লাঠি ঘাড়ে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রে! তুই হঠাৎ কোথা থেকে এলি?"

সে বলিল—"আজ্ঞে, মা ঠাকুরাণী এই চিঠি দিয়েছেন এবং এই একটি কবচ আপনার হাতে পরবার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" বলিয়া চিঠি ও কবচ দিল।

চিঠি পড়িয়া দেখিলাম, মাতা ঠাকুরাণী লিখিতেছেন— "তুমি বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার পর রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় আসিয়াছিলেন এবং একটি

কবচ দিয়া বলিলেন—'মা তোমার ছেলে আজ প্রাতে সিউড়ী রওনা হইয়াছে পথে তাহার সঙ্গে দেখা হইল, তাহার জন্য আমি এই রামকবচটি আনিয়াছি তুমি যেমন করিয়া পার আজই এই কবচটি তোমার ছেলেক পাঠাইয়া দাও এবং বিশেষ করিয়া লেখ যেন আজই সে এই কবচটি ধারণ করে। আর লিখিয়া দাও, যদি কোনরকম ভয় পায় তবে যেন তারকব্রহ্ম নাম জপ করে। এই কবচের গুণে এবং নামের বলে সে সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। সুতরাং আমি দীনু কৈবর্তকে দিয়া এই চিঠি ও কবচ পাঠাইলাম। প্রাপ্তিমাত্রে রামনাম স্মরণ করিয়া তুমি কবচটি ভক্তিপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিবে,যেন কোনমতে অন্যথা না হয়। ইহা তোমার মাতৃ-আজ্ঞা জানিবে।"

পত্র ও কবচ লইয়া আমি দীনুকে বলিলাম, "তুই আজ এখানেই থাকবি তো? তোর খাবার জোগাড় করি?"

সে বলিল "আজ্ঞে না, মা ঠাকুরাণী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন, 'তুই নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কবচটি পরাইয়া দিবি এবং আজ রাত্রেই আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবি যে, আমার ছেলে কবচ পরিয়াছে।"

সুতরাং তাহাকে থাকিবার জন্য আর অনুরোধ করিলাম না। তাহার হাতে দুই আনা পয়সা দিয়া বলিলেম— "এই নে, বাজার হইতে কিছু মুড়ি মুড়কি কিনিয়া পথে খাইতে খাইতে যাইবি।" তাহার সম্মুখে কবচটি আমি হস্তে ধারণ করিলাম, সে আমায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর যথাসময়ে দুইজনে শয়ন করিলাম। উভয়ের চৌকির শিয়রে দুইটি বড় বড় জানালা খোলা ছিল। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আবার মাঝে মাঝে প্রবল বায়ু আসিয়া মেঘকে উড়াইয়া একাদশীর চন্দ্রকে দৃশ্যমান করিতেছে। আমরা দু'জনে কিয়ৎক্ষণ গল্পগুজব করিয়া নিস্তব্ধ হইলাম। পথশ্রমে কাতর ছিলাম, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অনেক রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি বাতাসে প্রদীপটা নিবিয়া গিয়াছে। ক্ষীণ মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে জ্যোৎস্নালোক জানালা পথে প্রবেশ করিয়া বিপরীত দিকের দেওয়ালের একটা অংশ আলোকিত করিয়াছে। ঘুমে জড়িত চক্ষু অল্প খুলিয়া দেখিলাম, যেন একটা কঙ্কালসার বৃদ্ধ আমার শয্যার উপর হাঁটু গাড়িয়া থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে তাহার মুখখানা যেন বহুদিন রোগে শীর্ণ গালের চামড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, দন্তহীন মাড়ীর উপর তাহার ওষ্ঠদ্বয়

চুপসিয়া বসিয়া গিয়াছে। মাথায় সাদা ছোট চুলগুলো যেন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চক্ষু দু'টা হইতে যেন ক্রোধ, ঘৃণা ও বিদ্রূপের জ্বালা বহির্গত হইতেছে।

দেখিয়া আমি আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিলাম। ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু সে অবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আবার চক্ষু খুলিলাম। আবার দেখিলাম সেই বীভৎস মূর্তি ঠিক সেই অবস্থায় বসিয়া আছে। আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। তখন হঠাৎ মাতাঠাকুরাণীর পত্রের কথা স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, আমার ভয় কি, আমার হস্তে রক্ষাকবচ রহিয়াছে এবং মৃদুস্বরে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার চক্ষু খুলিলাম, তখন সে মূর্তি আর নাই। সাহস পাইয়া উঠিয়া বসিলাম এবং জড়িতকণ্ঠে আমার বন্ধুকে ডাকিতে লাগিলাম। রাসবিহারীবাবু উঠিয়া বলিলেন—"মহাশয়?"

আমি তখন প্রদীপ জ্বালিয়া সমস্ত ঘটনা তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। সমস্ত রাত্রি আমরা গল্প করিয়াই কাটাইয়া দিলাম। পরদিন প্রভাতে সে গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

আহারাদি করিয়া সাড়ে দশটার সময় স্কুলে গেলাম। টিফিনের সময় ডাকওয়ালা পিওন একখানি পত্র দিল। দেখিলাম সেখানি রমাপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন। চিঠির তারিখ ও ছাপ গতকল্যকার। চিঠিখানিতে লেখা আছেঃ

শ্রীশ্রীদুর্গাশরণং

পরমশুভাশীর্বাদাঃ সন্তু বিশেষঃ

বাবাজীবন গতকল্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম এবং তোমার মাতাঠাকুরাণীকে তোমার নিমিত্ত একটি রামকবচ দিয়া আসিয়াছি। তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছি যে অদ্যই তিনি সেটি যে কোন উপায়ে যেন তোমাকে পাঠাইয়া দেন যাহাতে অদ্যই নিশাগমের পূর্বে কবচটি তুমি ধারণ করিতে পার। বোধ হয় অদ্য রাত্রে তুমি কোনরূপ ভয় পাইবে কিন্তু সেই রামকবচটির গুণে তোমার কোনও বিপদ হইবে না। কবচটি তুমি নিয়ত ধারণ করিয়া থাকিবে এবং আর যদি কখনও ভয়ের কারণ ঘটে তবে তারকব্রহ্ম নাম জপ করিবে। সর্বদা শুদ্ধাচারে থাকিবে। অত্র কুশল। মা ভবানী তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি নিয়ত আশীর্বার্দক
শ্রীরমাপ্রসন্ন দেবশর্মা

পত্রখানি পড়িয়া আমার বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সেখানি রাসবিহারীবাবুকে দেখাইলাম, তিনিও খুব আশ্চর্য হইলেন।

পূজার ছুটির সময় বাড়ি গিয়া প্রথমেই মজুমদার মহাশয়কে প্রণাম করিতে গেলাম। যে বিপদ হইতে আমাকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা আমি যে সেই রাত্রে ভয় পাইব একথা আপনি কি করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন?"

একটু মৃদু হাস্য করিয়া মজুমদার মহাশয় বলিলেন—"তুমি যখন সেদিন আসিয়া আমাকে প্রণাম করিলে, তখনই আমি দেখিলাম একটি প্রেতাত্মা তোমার পশ্চাতে বেড়াইতেছে। কোনও কারণে সে তোমার উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং তোমার প্রাণহানি করিবার মানসেই তোমার সঙ্গ লইয়াছে। কেবল উপযুক্ত ক্ষণ পায় নাই বলিয়া সে পর্যন্ত কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তুমি চলিয়া গেলে আমি গণনা করিয়া দেখিলাম যে, সেই রাত্রেই ক্ষণ উপস্থিত হইবে তাই তাড়াতাড়ি একটি রামকবচ লিখিয়া তোমার মাতাঠাকুরাণীকে দিয়া আসিয়াছিলাম। যাহা হউক কবচটি তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।"

আমি বলিলাম—"মজুমদার মহাশয়, আমার সঙ্গে যে লোকটি সেই ঘরে শয়ন করিতেন, তিনি কোনরূপ ভয় দেখিলেন না কেন? আমরা উভয়েই একত্র সেই বাড়িতে ছিলাম, তবে আমার উপরেই ভূতের এত আক্রোশ কেন?"

মজুমদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে লোকটির নাম কি?"

—"তাহার নাম রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।"

—"তিনি ব্রাহ্মণ, এই কারণে ভূত সহসা তাঁহার কিছু করিতে পারে নাই। তুমি কায়স্থ, তোমার প্রাণহানি করা তাহার পক্ষে সহজ হইত।"

এই কথা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ আমি নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরে বলিলাম— "সে ভূত কি এখনও আমার অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে?"

—"করিতেছে। আর একবার সে তোমায় দেখা দিবে কিন্তু সে ক্ষণ কতদিনে উপস্থিত হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না। কিন্তু এই রামকবচের বলে তোমার কোন বিপদ হইবে না।"

তাহার পর অষ্টাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সে ভূতের কথা আমি প্রায় বিস্মৃত হইলাম। কিন্তু রামকবচটি বরাবর সযত্নে ধারণ করিয়া ছিলাম। আমি ক্রমে দ্বিতীয় শিক্ষক হইতে প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলাম। পরে আরও

কয়েক বৎসর সুখ্যাতির সহিত কর্ম করিয়া প্রেসিডেন্সী বিভাগের ডেপুটি ইন্‌সপেক্টারী পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। মফস্বলে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে হইত। এক দিন মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুল পরিদর্শন করিতে যাইতেছি। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, সেই গ্রামাভিমুখে রওয়ানা হইলাম, শরৎকালের পরিষ্কার রাত্রি। আকাশে চাঁদ ছিল। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গাড়ী মন্থর গমনে চলিয়াছে। আমি প্রথম শুইয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম। ঘণ্টা দুই এপাশ ও-পাশ করিয়া যখন কিছুতেই ঘুম হইল না, তখন চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিলাম। দেখিলাম গাড়োয়ান তাহার বসিবার সেই সংকীর্ণ স্থানটুকুতে কোন প্রকারে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি—পরিষ্কার পথ পাইয়াছে—গরু দুইটি অবাধে আপন মনে চলিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে বৃক্ষের শ্রেণী, কোথাও দূরে দূরে, কোথাও বা ঘন-সন্নিবদ্ধ। ঝুর ঝুর করিয়া বাতাস দিতেছে। গাড়োয়ান আরামে নিদ্রা যাইতেছে দেখিয়া গরীবকে জাগাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। অথচ গরু দুইটা অরক্ষিত অবস্থায় পথ চলে তাহাও নিরাপদ নহে। এই বিবেচনা করিয়া আমি শুইলাম না বসিয়াই রহিলাম।

এই অবস্থায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। আমার একটু তন্দ্রা আসিতে লাগিল। আমি বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে লাগিলাম। হঠাৎ গরু দুইটা থামিয়া গেল, একটা ঝাঁকুনি দিয়া গাড়িখানা দাঁড়াইয়া পড়িল। আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

চক্ষু খুলিয়া দেখি, সেই ভীষণ মূর্তি। গরু দুইটার সম্মুখে পথ অবরোধ করিয়া গাড়ির জোয়ালের উপর দুইটা জীর্ণ হস্ত রাখিয়া, সেই শুষ্ক চর্মাবৃত কঙ্কাল দাঁড়াইয়া আছে এবং সেই জ্বলন্ত চক্ষু দুইটা হইতে আমার প্রতি ক্রোধানল বর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। আমি কাঁপিতে লগিলাম। বুকের কাছে হাত রাখিয়া তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলাম সে মূর্তি ছায়ার ন্যায় মিলাইয়া যাইতেছে। যখন সে একবারে অদৃশ্য হইয়া গেল, গরু দুইটা তখন গাড়ি পশ্চাতে ঘুরাইয়া দিয়া, মহাবেগে ছুটিতে লাগিল।

ঝাঁকানিতে গাড়োয়ানের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বলিল—"বাবু, এ কি? গরু এমন করিয়া ছুটিতেছে কেন?"

আমি আসল কথা তাহাকে না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলাম—"হয়ত পথে কোনও ভয় দেখিয়াছে তাই ছুটিয়া বাড়ি যাইতেছে?"

গাড়োয়ান তখন গাড়ি থামাইবার এবং মুখ ঘুরাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, গরু দুইটির লাঙ্গুল টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহারা দাঁড়াইল না। দৌড়িতে দৌড়িতে অবশেষে যখন একটি গ্রামের বাজারে উপনীত হইল এবং সেখানে অনেক লোকজন ও অন্যান্য গরুর গাড়ি দেখিতে পাইল, তখন দাঁড়াইল। গরু দুইটি ভয়ানক শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল দেখিয়া আমি গাড়োয়ানকে বলিলাম— "থাক্, আজ আর কাজ নাই, গরুকে খুলিয়া দাও, উহাদের মুখে ঘাস জল দাও, কল্য প্রভাতে তখন আবার যাওয়া যাইবে। অদ্য রাত্রে এইখানেই বিশ্রাম করি।

তাহার পর আরও সাত বৎসর কাটিয়াছে—কিন্তু আর কখনও কোনরূপ ভয় পাই নাই। সে রামকবচটি এখনও ধারণ করিয়া আছি এবং যতদিন বাঁচিব ধারণ করিয়া থাকিব. আমার মাতৃদেবীর এবং মজুমদার মহাশয়ের লিখিত সেই পত্র দুইখানি অদ্যাপি আমার নিকট আছে, যদি কেহ দেখিতে ইচ্ছা করেন ত দেখাইতে পারি।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট আমি যেমন শুনিয়াছি উপরে অবিকল স্বহস্তে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি।

—শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

উপরের লিখিত ঘটনাগুলি আমি যেমন বলিয়াছি ইন্দুবাবু তাহা যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং ঐ ঘটনাগুলি আমার প্রত্যক্ষীভূত ও অবিকল সত্য। ✍

সর্বনাশিনী

পাঁচকড়ি দে

তুষারমন্ডিত অভ্রভেদী হিমালয় দেখিবার ইচ্ছা বহুকাল হইতে আমার হৃদয়ে নিতান্তই বলবতী ছিল, তাই আমার চিরসহচর প্রাণের বন্ধু প্রবোধচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া আমি একদিন দার্জিলিং রওনা হইলাম।

আমরা পথে এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। আমাদের উভয়েরই মত যে, রেলে গেলে হিমালয় প্রকৃতভাবে দেখা হইবে না। রেল যেন উড়িয়া যায়, এরূপ অবস্থায় রেলে গমন করিলে হিমালয়ের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য প্রকৃত উপলব্ধি করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইবে না। এই জন্য আমরা উভয়েই স্থির করিলাম যে, আমরা শিলিগুড়ি হইতে পদব্রজে দার্জিলিং রওনা হইব।

সকালে শিলিগুড়ি উপস্থিত হইলাম। যতক্ষণ দার্জিলিং-এর সুন্দর ক্ষুদ্র গাড়িগুলি দৃষ্টিপথে রহিল, ততক্ষণ স্টেশনে আমরা তাহার বিচিত্রগতি দেখিতে লাগিলাম। তৎপরে দুই কুলির মস্তকে আমাদের দুইজনের দুই ট্রাঙ্ক চড়াইয়া দিয়া নিজ নিজ হাতে ব্যাগ ঝুলাইয়া বাজারের দিকে চলিলাম।

পথেই দুই একটি বাঙালীর সহিত দেখা হইল। আমরা বাজারেই বাসা লইব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাহা করিতে দিলেন না। জোর করিয়া তাঁহাদের বাসায় লইয়া গেলেন। আমরা যাঁহার বাড়ীতে উঠিলাম, তিনি এখানে শালকাঠের ব্যবসা করেন।

সেদিন সে রাত্রি আমরা শিলিগুড়িতেই রহিলাম। সকলেই আমাদিগকে বলিলেন পাহাড়ে হাঁটিয়া যাইতে ভারি কষ্ট হইবে, বরং গরুর গাড়ী করিয়া যান। আমরা পদব্রজে যাওয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম। প্রকাশ্য সদর রাস্তা দিয়া যাইব না, তাহাও স্থির। সে রাস্তায় বহু লোক চলাচল করে, বহু গরুর গাড়ি মাল লইয়া সর্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকে, অধিকন্তু তাহারই পার্শ্ব দিয়া রেল গিয়াছে। সুতরাং এ রাস্তায় হিমালয়ের গুরুগম্ভীর সৌন্দর্য উপভোগের সুবিধা হইবে না, সুতরাং আমরা সে পথে প্রাণ থাকিতে যাইব না।

যে পথে পাহাড়িয়াগণ চলা-ফিরা করে, সেই ক্ষুদ্র অপরিসর পথ দিয়া আমরা যাইব। তবে পাহাড়ের পথ দুর্গম, তাহাতে আমরা পথ চিনি না, সুতরাং আমাদের একজন পথপ্রদর্শক আবশ্যক।

অর্থে কি না হয়? আমাদের নূতন বন্ধুদিগের অনুগ্রহে আমরা তাহাদের বিশ্বাসী একজন মহাবলবান ভুটিয়া পথপ্রদর্শক পাইলাম। সে তাহার তিনজন বিশ্বাসী কুলি সংগ্রহ করিল। পরদিবস অতি প্রত্যূষে কুলির মস্তকে দ্রব্যাদি দিয়া ভগবানের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম।

প্রথমে আমাদের অগ্রে—কোমরে দুই খুক্‌রী, হস্তে এক বৃহৎ লগুড়, ভুটিয়া থম্বিমেনা। তৎপশ্চাতে আমরা দুইজন, তৎপশ্চাতে তিনজন কুলি। আমরা মহানন্দা নদীর পোল পার হইয়া মাটিয়াখোলার হাট উত্তীর্ণ হইলাম, তৎপরে নক্সালবারীর পথ ধরিয়া চলিলাম।

পথে এক মারোয়ারি দোকান পাইয়া তথায় রন্ধন ও ভোজনকার্য সারিয়া লইলাম। এই দুর্গম জঙ্গলেও মাড়োয়ারী মহাত্মাদিগের অভাব নাই, মধ্যে মধ্যেই দোকান, দোকানে প্রায় সর্বদ্রব্যই ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

আহারাদির পর একটু বিশ্রাম করিয়া আবার রওনা হইলাম। আমাদের হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য বর্ণনা করিবার এখানে উদ্দেশ্য নহে, নতুবা আমরা এই রূপের শিখর শ্রীযুত হিমালয় মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইতাম। সুতরাং আমরা এ কথার উত্থাপন করিব না।

এই হিমালয়ে এমন প্রায়ই ঘটে যে কোথাও কিছু নাই অকস্মাৎ কুয়াশা উত্থিত হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় হইয়া যায়। তখন আর কিছুই দেখা যায় না—অতি কষ্টে, অতি সাবধানে পথ অতিক্রম করিতে হয়।

আমরা যে পথে যাইতেছিলাম, তাহা অতি দুর্গম,—একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, পড়িলে সহস্রহস্ত নিম্নে আসীন হইতে হয়। একজনের অধিক দুইজনে

পাশাপাশি যাইবার উপায় নাই। অনেক সময় হামাগুড়ি দিয়া কষ্টে উঠিতে হয়। অতিকষ্টে কুয়াশার অন্ধকার ঠেলিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম।

এ দিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়—দারুণ প্রবল শীত, তাহার উপর বৃষ্টি। হিমালয়ে এই বৃষ্টি না থাকিলে বোধ হয় ইহাই ইন্দ্রের অমরাবতী ও নন্দনকানন হইত। একটা মাথা রাখিবার স্থান পাইলেই আমরা তথায় আজিকার মতো বিশ্রাম করি। নিতান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। কুয়াশার ভিতর দিয়া কোন দিকে যাইতেছি তাহাও স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের পথপ্রদর্শক বলিতেছিল যে, নিকটেই দোকান ও বস্তি আছে। কিন্তু আমরা এক ঘন্টা কষ্টে চলিয়াও কোন পল্লী পাইলাম না।

হিমালয়ের সন্ধ্যা আমাদের দেশের মতো সহজ রকমে হয় না। সন্ধ্যা বলিয়া কোন ব্যাপার এখানে নাই। সহসা না বলিয়া কহিয়া অবাধ্য মেয়ের মতো যেন একেবারে তিমিরবসনা নিশা হিমালয়কে নিজের কৃষ্ণাঞ্চলে ঢাকিয়া দেয়। আজ ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। অনুভব করিলাম, সহসা চারিদিক ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইল। আর কিছু দেখিবার উপায় নাই।

আমাদের পথপ্রদর্শক উচ্চৈঃস্বরে নানাবিধ শব্দ করিতে করিতে চলিল, আমরা তাহার গলার স্বর অনুসরণ করিয়া হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া চলিলাম। একটু পা পিছলাইলেই গিয়াছি আর কি—ভয়াবহ মৃত্যু। এখন আমরা বুঝিলাম, আমাদের শিলিগুড়ির বন্ধুগণ হিতবাদী বটে। কিন্তু—মরণকালেতে যে রোগী ঔষধ না খায়—গতানুশোচনায় আর ফল কি?

সহসা পথপ্রদর্শক দাঁড়াইল, আমরাও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন বুঝিলাম, সে নিজেই অন্ধকারে পথ হারাইয়াছে—গ্রামের পথে না গিয়া অন্য পথে আসিয়াছে, দুর্গম পাহাড়ের দুর্গমতম স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে—কোনদিকে কোথায় যাইবে, স্থির করিতে পারিতেছে না। সে নিজে এ কথা স্বীকার না করিলেও তাহার গলার স্বরে আমাদের বেশ উপলব্ধি হইতেছিল।

তখন আমাদের হৃদয়ের ভিতর হৃদয় বসিয়া গেল। বুঝিলাম, রাত্রে এই পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গলমধ্যেই আজ রাত্রি কাটাইতে হইবে। তাহাতে বড় কিছু যায় আসে না—তবে পতিত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ না হইলেই এক্ষণে ভগবানের অসীম দয়া।

থম্বিমেনা বলিল, "ফিরিয়া এই পথে একটু নামিয়া গেলেই একটা বস্তি পাইব।"

অগত্যা তাহাই করা শ্রেয়ঃ ভাবিয়া আমরা ফিরিলাম। কিন্তু কয়েক পদ যাইবামাত্র আমি একটা গড়ানে স্থানে আসিলাম। তাহার পর কি হইল, ঠিক মনে নাই। আমি গড়াইতে গড়াইতে কতদূর চলিলাম, তাহাও মনে নাই। এইমাত্র বুঝিলাম আমার লম্বা কোট দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া বন্ধুবর প্রবোধচন্দ্রও ঠিক আমার গতি অনুসরণ করিয়া আমার অনুসরণ করিতেছে। শব্দে বুঝিলাম, গুণবন্ত থম্বিমেনারও সেইরূপ দশা,—গড়াইয়া আসিতেছে।

সহসা কিসে লাগিয়া আমাদের অধঃপতনের গতি বন্ধ হইল। স্পর্শে বুঝিলাম কি একটা কাষ্ঠনির্মিত দ্রব্যে আমাদের বেগ নিরোধ হইয়াছে! পকেটে দেশলাই ও বাতি ছিল, জ্বালিলাম।

সেই অন্ধকারে দীপালোকেও ভালো দেখা যায় না।

আলোটা উচ্চে তুলিয়া দেখিলাম, সেটা একখানা কাষ্ঠনির্মিত ঘর। আমরা তিনজনেই সেই গৃহের কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীরপার্শ্বে পতিত। আমরা কষ্টে-সৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

যাহা হউক, প্রাণটা যে বাজে খরচ হয় নাই, ইহাই ভালো! সম্ভবতঃ আশ্রয়ও মিলিবে। এ গৃহে যেই থাকুক না কেন, এ অবস্থায় আশ্রয় দিতে কখনও অসম্মত হইবে না। আমরা আলো ধরিয়া ধরিয়া গৃহের দ্বারে আসিলাম। দরজা বন্ধ।

আমি দরজায় করাঘাত করিলাম—কেহ উত্তর দিল না। এবার আমি আরও বেশিরকম শব্দ করিয়া সবলে করাঘাত করিলম, তবুও কেহ উত্তর দিল না। তখন আমি দরজা ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিলাম, কড় কড় শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া গেল। ভিতরে বাহির হইতেও অন্ধকার।

আমি আলো লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম—প্রবোধ ও থম্বিমেনা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু তৎপরে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটিল। থম্বিমেনা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, তৎপরে ছুটিয়া অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল। আমরা উভয়ে বিস্মিত হইয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু অন্ধকার হইতে কেবল একটি ভীতিব্যঞ্জক আর্তরব আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, আমরা কেবলমাত্র সেই শব্দের এইমাত্র বুঝিলাম—

"শয়তান কা ঔরত।"

প্রবোধ বলিল, "বোধ হয় এখানকার লোকের বিশ্বাস, এই বাড়ীতে ভূত আছে—পাহাড়ীমাত্রেই ভূত বড় বিশ্বাস করে। যাহাই হউক, খাদে পড়িয়া

যে আজ প্রাণটা যায় নাই, এইজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিই। শীতে বুক গুর্-গুর্ করিতেছে। এ আশ্রয়ও ভগবান মিলাইয়া দিয়াছেন। এখন কাঠকুটা সংগ্রহ করিয়া আগুন জ্বালা যাক। আলো দেখিলে কুলি দুইটা আর গুণবন্ত থম্বিমেনা প্রাণের দায়ে এখানে আবার ফিরিয়া আসিতে পথ পাইবে না।

আমরা বাহিরে আলো লইয়া কতকগুলা শুষ্ক ডালপালা সংগ্রহ করিলাম তৎপরে তাহা জ্বালাইয়া গৃহমধ্যে আগুন করিলাম। আগুনে হাত সেঁকিয়া কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। আমাদের ব্যাগে সর্বদাই আমরা কিছু না কিছু আহার্য রাখিতাম। প্রবোধ তাহাই বাহির করিয়া প্রবলবেগে ভোজন আরম্ভ করিল। আমি বলিলাম, "আগে ঘরটা ভালো করিয়া দেখা যাক্।"

প্রবোধ বলিল, "আগে প্রাণে বাঁচলে ত আর সব, ক্ষুধায় প্রাণ যায়। এই পাহাড়ে শীতে আর এই পাহাড়ে রাস্তায় যেন ক্ষুধা হাজার গুণ বাড়িয়া উঠে।" অগত্যা আমরা উভয়ে সেই আগুনের পাশে বসিয়া কিছু আহার করিয়া লইলাম।

আহার শেষ হইলে উভয়ে বাতি লইয়া ঘরটি ভালো করিয়া দেখিতে চলিলাম, একটি ঘর নহে, পাশাপাশি দুইটি ঘর। গৃহমধ্যে নানাবিধ তৈজসপত্র পড়িয়া আছে। দেখিলেই বোধ হয়, শেষে যাহারা এই বাড়ীতে ছিল, তাহারা যে কারণেই হউক, হঠাৎ এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের অনেক জিনিসপত্র পড়িয়া আছে, লইয়া যাইবার সময় হয় নাই—তাড়াতাড়ি যে চলিয়া গিয়াছে, এই ঘরের অবস্থা দেখিলে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

একটা বাক্সও ঘরের কোণে পড়িয়া আছে। —দেখিলাম, ডালা খোলা। তুলিয়া দেখি, তাহার ভিতর অনেকগুলি নানা তারিখের বাংলা চিঠি রহিয়াছে।

এই দুর্গম স্থানে এই নির্জন বাড়ীতে তাহা হইলে পূর্বে কোন বাঙালী বাস করিয়াছিল। কে সে? এত স্থান হইতে এখানে আসিয়াছিল কেন? দারুণ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আমরা বাতিটি সেই বাক্সের উপর রাখিয়া পত্রগুলি একে একে পাঠ করিতে লাগিলাম। যখন সর্বশেষ পত্রখানির পাঠ শেষ হইল, তখন নিম্ন হইতে সেই অন্ধকার আলোড়িত করিয়া এক হৃদয়বিদারক উচ্চ আর্তনাদ উঠিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রিই এই ভয়াবহ শব্দ আমাদের কানে আসিতে লাগিল। ইহা আমাদের বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা না কোন মানুষের আর্তনাদ, তাহা কেবল ভগবান বলিতে পারেন। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, আমরা সমস্ত রাত্রি সেই গৃহমধ্যে জাগিয়া বসিয়া রহিলাম, ভয়ে চক্ষু

মুদ্রিত করিতে সাহস করিলাম না।

যে সকল পত্র আমরা পাঠ করিলাম, তাহার প্রথমখানি এই—

প্রথম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

কলিকাতার সেই সোরগোল অশান্তির মধ্য হইতে আসিয়া এই নির্জন পাহাড়মধ্যে এই স্থানে আমি যে কি শান্তি অনুভব করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আর লোকালয়ে থাকিব না। লোকালয়ে থাকিলে আর আরাম হইতে পারিব না, এইজন্য এই দুর্গম স্থানে আশ্রয় লইয়াছি। আমার মস্তিষ্কও যেরূপ উষ্ণ হইয়াছিল—তাহা আর নাই, আমি এখন শান্তচিত্তে চিন্তা করিতে পারিতেছি। আর এই স্থানের ন্যায় চিন্তা করিবার স্থান দ্বিতীয় আর কোথায়?

আমার এই বাড়ী পর্বতের মাঝামাঝি স্থাপিত, পশ্চাতে স্তরে স্তরে পর্বতশ্রেণী আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়া গিয়াছে, সম্মুখে একটু আগে একেবারে মহাখাদ, দুই সহস্র হাত নিম্নে একটি নদী রজতসূত্রের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

এ বাড়ীখানিতে দুইটি মাত্র ঘর। ঘর বলিতে চাও, আর যাহা বলিতে চাও, তাহাই ইহাকে বলা যায়। কতকগুলি শালকাঠ জোড়া দিয়া প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে—চালও ঐ শালকাঠ জোড়া। এখানে শালকাঠের অভাব নাই, চারিদিকেই শালকাঠ—কাটিয়া লইলেই হইল। আমার সঙ্গে চাকর-বাকর নাই, চেষ্টা করিয়াও পাই নাই। প্রায় দুই ক্রোশ দূরে একটা ভুটিয়া বস্তি আছে, সেখানে সপ্তাহে একদিন হাট হয়। হাটের দিন সকালে রওনা হইয়া আমার দরকারমতো দ্রব্যাদি লইয়া সন্ধ্যার সময় ফিরি।

সময় কাটাইবার জন্য একখানা খুব বড় উপন্যাস লিখিতেছি। বোধ হয় তাহাতেই আমি জগদ্বিখ্যাত হইব।

আমি একজন লোক পাইয়াছি। রাত্রে সে কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকিতে চাহে না। তা না থাকুক ক্ষতি নাই। দিনেই সমস্ত কাজকর্ম সারিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং আমার স্ত্রীকে আর পূর্বের ন্যায় খাটিতে হইতেছে না।

এই নির্জন দুর্গম স্থানে থাকিতে সে সম্পূর্ণ নারাজ হইয়াছিল। আমিই বুঝাইয়া রাখিয়াছি, লোকালয়ে থাকিলে আমার রোগ আরাম হইবার আশা নাই। এই কথা বলায় সে সম্মত হইয়াছে।

রাত্রে সে পার্শ্বের ঘরে নিদ্রা যায়—আমি সম্মুখের ঘরে বসিয়া অনেক

রাত্রি পর্যন্ত সেই প্রকাণ্ড উপন্যাসখানা লিখি।

তোমার মন্মথ।

দ্বিতীয় পত্র

(দ্বিতীয়পত্রে কেবল সেই উপন্যাসের কথা এবং সেই উপন্যাসের প্রশংসার ভাগই অধিক।)

তৃতীয় পত্র

প্রিয় সুরেশ,

তোমাকে দুইখানা পত্র লিখিয়াছি, এইখানা লইয়া তিনখানা হইবে, কিন্তু কোনখানাই এখনও ডাকে দিতে পারি নাই। ডাকঘর প্রায় দশ ক্রোশ দূরে। পত্র তিনখান ডাকে দিবার জন্য এখনও কোন লোক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তাহার একটা গুরুতর কারণ আছে। সহজে এ বাড়ীর নিকট কেহ আসিতে চাহে না, অধিক পয়সা দিতে চাহিলেও না। আগে ইহার কারণ জানিতে পারি নাই, একদিন এক বৃদ্ধকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই বৃদ্ধ আমাকে এ রহস্যের বর্ণনা করিল। ব্যাপার এই—

সোহো বলিয়া একটা লোক এই কুটীর নির্মাণ করে। সে ভুটিয়াদিগের মধ্যে একজন কবি বলিয়া গণ্য ছিল। সে নির্জনে বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াই এই দুর্গমস্থানে এই কুটীর নির্মাণ করিয়াছিল। এখানে সে নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে লইয়া বাস করিত।

সুখেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিকটস্থ এক ব্যক্তির একটি ভুটিয়া যুবতী সেই নিভৃত-নিবাসী কবির প্রেমে পড়িল। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই কুটীরে দুইটি ঘর। যখন গভীর রাত্রে পার্শ্বের গৃহে সোহোর যুবতী স্ত্রী নিদ্রা যাইত, সেই সময়ে এই যুবতী তাহার পার্শ্বে বসিয়া মৃদুমন্দকণ্ঠে প্রেমালাপ করিত।

একদিন রাত্রে তাহার স্ত্রী সমস্তই জানিতে পারিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না।

এই যুবতীকে এই কুটীরে আসিতে হইলে একটা কাঠের সাঁকো পার হইয়া আসিতে হইত। এই সাঁকোর প্রায় পাঁচশত হাত নিম্নে এক ঝরণা বা ঝোরা। প্রবলবেগে সেই ঝরণা দিয়া জল পড়িত বলিয়া ভুটিয়ারা ইহার নাম "পাগলা ঝোরা" রাখিয়াছে। প্রত্যহ রাত্রে এই ঝরণার উপরের সাঁকো দিয়া সেই যুবতী যাতায়াত করিত।

একদিন সোহো গৃহে না থাকায় তাহার স্ত্রী সুবিধা পাইয়া সেই সাঁকোর কাঠ একদিন টাঙ্গি দিয়া কাটিয়া রাখিয়া আসিল। এমন সামান্যমাত্র সাঁকোর কাঠ পাহাড়ে সংলগ্ন রহিল যে, মনুষ্যভার পড়িলেই তাহা নিশ্চিত পতিত হইবে।

তাহাই ঘটিল। সে রাত্রে, পূর্বের ন্যায় সোহো প্রণয়িনীর প্রতীক্ষা করিতেছে, সহসা তাহার কর্ণে এক মর্মভেদী আর্তনাদ প্রবেশ করিল। তাহার পরই প্রকান্ড কাঠ ও পাথরের শব্দ আসিল, তাহার প্রণয়িনী পাঁচশত হস্ত নিম্নে পাগলা ঝোরায়া বিসর্জিত হইয়াছে।

কে এ কাজ করিয়াছে, তাহা সোহোর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইহার ফলে সোহোও তাঁর স্ত্রী উভয়েই গভীর খাতে পতিত হইল। একদিন সোহো ও তাহার স্ত্রীর গলা টিপিয়া তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু ভুটিয়া স্ত্রীলোকদিগের দেহে অসীম বল, সোহোর স্ত্রী তাহাকে টানিতে টানিতে খাদের নিকট লইয়া আইসে, তথাপি সোহো তাহার গলা হইতে হাত অপসারিত করিল না। তাহার স্ত্রীর চক্ষু কপালে উঠিল, তাহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, তবুও সে তাহার স্বামীকে ছাড়িল না। উভয়েই দুই সহস্র হাত নিম্নে গিয়ে চুর্ণবিচূর্ণ হইল।

এতদূর বলিয়া বৃদ্ধ ভুটিয়া বলিল, 'সেই পর্যন্ত সোহোর প্রণয়িনী সোহোর বাড়ীতে প্রেত হইয়া আইসে। ভিতরে আলো দেখিলে সে দরজায় আঘাত করে। তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দেয়, এমন সাধ্য কাহারও নাই। অনেকে এই বাড়ীতে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু এ বাড়ীতে যে বাস করে তাহারই মৃত্যু হয়।'

এইজন্যই এই সোহো-প্রণয়িনীর ভূতের জন্য কেহ সাহস করিয়া এখানে আসে না। আমার দ্রব্যাদি হাট হইতে আমাকেই নিজে আনিতে হয়, এই জন্যই এ পর্যন্ত পত্র ডাকে পাঠাইতে পারি নাই।

তোমার মন্মথ।

চতুর্থ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

দেশে হইলে এ কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। বোধ হয় অর্ধ-ঘন্টার মধ্যেই একথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এই নির্জন দুর্গম স্থানে ভূতের কথা সহজে বিস্মৃত হওয়া যায় না।

রাত্রে—অনেক রাত্রি পর্যন্ত—বসিয়া আমার সেই বিরাট উপন্যাসখানা আমি প্রত্যহ লিখিয়া থাকি, কিন্তু বৃদ্ধ ভুটিয়ার নিকট এই কথা শোনা পর্যন্ত রাত্রে আমার লেখা একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তুমি শুনিলে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসিবে, কিন্তু সত্য গোপন করাও ঠিক নহে, প্রকৃতই সেই দিন হইতে রাত্রে লিখিতে লিখিতে মধ্যে মধ্যে লেখা বন্ধ করিয়া আমি কান পাতিয়া শুনিতাম, দরজায় কেহ ঘা মারিতেছে কিনা। যথার্থ-ই কি আমার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে। ইহারই মধ্যে যেন সোহো-প্রণয়িনী আমার স্কন্ধে ভর করিয়াছে! হাসিও না, এই নির্জন দুর্গম লোকশূন্য স্থানে সকলই সম্ভব। তোমার সেখানে যাহা হাস্যজনক, এখানে তাহা ভীতিপ্রদ।

কাল যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমারও যে বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে, মাথা খারাপ হইয়া আসিতেছে, তাহা আমারই নিজের বিশ্বাস হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময়ে আমি কুটীরের বাহিরে বেড়াইতেছি। বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ভগ্ন সাঁকোর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম। উঁকি মারিয়া সাঁকোটার নিম্নস্থ পাগলা ঝোরা দেখিতেছিলাম, সহসা মাথা তুলিয়া দেখিলাম, দূরে সুন্দর বনফুলে সজ্জিত একটি পাহাড়িয়া যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তখন চারিদিক ধীরে ধীরে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। এখানে এ কুটীরের এত নিকটে এ-পর্যন্ত আমি কোন স্ত্রীলোক বা পুরুষ জনপ্রাণী দেখিতে পাই নাই। এখান হইতে লোকালয় দুই ক্রোশের নিকটে নহে। রাত্রে এই দুর্গম পথ দিয়া কাহারও গমন করা সম্ভব নহে।

তবে এ তরুণী কে? এ এখনও এখানে কেন? আমি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কণ্ঠ পরিষ্কারের অব্যক্ত শব্দ করিলাম, তথাপি সে নড়িল না। আমি ডাকিলাম, তবুও সে নড়িল না। এই দুর্গম পর্বতে আমার গলার শব্দ তাহার নিকট পৌঁছিতেছে না ভাবিয়া, আমি তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিলাম। তখন সে ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশিয়া গেল।—আমি গৃহের দিকে ফিরিলাম, আমার শিরায় শিরায় যেন কে বরফের প্রবাহ ছাড়িয়া দিল। কেন আমার এ ভাব হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে কি মনুষ্য নহে,—এই কি সেই সোহো-প্রণয়িনী?

তোমার মন্মথ।

পঞ্চম পত্র

(পূর্বোক্ত পত্রের এগার দিন পরে লিখিত।)

প্রিয় সুরেশ,

যাহা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। সে আসিয়াছে। আমি যেদিন সন্ধ্যাকালে তাহাকে পর্বত-মধ্যে দেখিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিয়াছিলাম সে নিশ্চয়ই একদিন আসিবে।

কাল রাত্রে সে আসিয়াছে। আমরা উভয়ে উভয়ের চোখের দিকে চাহিয়া বহুক্ষণ বসিয়া ছিলাম।

তুমি নিশ্চয়ই বলিবে, আমি উন্মত্ত হইয়াছি—আমার রোগ সারে নাই, এখনও সেই জ্বর আছে, তাই সে জ্বরের প্রকোপে বিকৃতমস্তিষ্কে কল্পনায় আমি প্রেতাত্মা দেখিতেছি।

তুমি বলিবে কেন, আমি নিজেকেই নিজে এ কথা অনেকবার বলিয়াছি, এ সকল সত্য ও সে আসিয়াছে। কি সে? রক্তমাংসের দেহধারিণী নারীমূর্তি অথবা আকাশের প্রাণী—বায়ুমূর্তি—আমার কল্পনার সৃষ্টি? যাহাই হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। আমার নিকট ইহা কল্পনা নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে। মিথ্যা নহে, সত্য—অতি সত্য।

গত রাত্রে সে আসিয়াছিল। আমার স্ত্রী পাশের ঘরে নিদ্রিতা, আমি অনেক রাত্রি পর্যন্ত সম্মুখের ঘরে বসিয়া সেই উপন্যাসখানা লিখিতেছিলাম। ওই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রত্যহ রাত্রে আমি ইহার প্রতীক্ষা করিয়াছি—দ্বারে তাহার মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিয়াছি, ইহার আশায় প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইয়াছি। এখন আমি আমার মনের এ অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছি।

আমি সাঁকোর উপর ইহার পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছি, তিনবার দরজায় আঘাত সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়াছি—তিনবার মাত্র।

ইহাতে আমার কঙ্কালের ভিতর যেন তীক্ষ্ণ তুষারধারা প্রবাহিত হইয়াছে, মস্তিষ্কে একরূপ অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিয়াছি, আমি সবলে আমার বুক চাপিয়া ধরিয়াছি, তবুও সেই শব্দ, সেই দ্বারে আঘাত—তিনবার মাত্র। আমি উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিয়াছি।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। ধীরে ধীরে গিয়া পার্শ্ববর্তী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম—দ্বারে শিকল টানিয়া দিলাম। তৎপরে উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। আবার সেই শব্দ—সেই দ্বারে আঘাত, তিনবার—তিনবার মাত্র।

তখন আমি গিয়া বাহিরের দরজা খুলিয়া দিলাম—অতিশীতল বায়ু প্রবলবেগে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আমার কাগজপত্র কতক উল্টাইয়া, কতক গৃহতলে ছড়াইয়া দিল। রমণী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, আমি নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম।

সে তাহার মস্তক হইতে শাল সরাইয়া স্কন্ধে ফেলিল, কণ্ঠদেশ হইতে একখানা রঙ্গীন রুমাল খুলিয়া পার্শ্বে রাখিল, তাহার পর আমার সম্মুখে আগুনের কাছে আসিয়া বসিল। আমি দেখিলাম, তাহার উন্মুক্ত পা দুখানি তখনও শিশিরসিক্ত রহিয়াছে। আমি তাহার সম্মুখে বসিলাম, বিস্ফারিত নয়নে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর হাসিল—সে হাসি মধুর, অথচ বিস্ময়কর, যেন ধূর্ততা শঠতা তাহাতে মাখা। সেই হাসিতে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইল, আমি তাহাকে সর্বস্ব দিতে প্রস্তুত—সর্বত্যাগী হইতে প্রস্তুত।

সে কথা কহিল না, নড়িলও না। আমি তাহার কথা শুনিবার কোন আবশ্যকতা মনে করিলাম না। সেই বিলোল চোখ, সেই চপল দৃষ্টি, তাহাই যেন আমার সহিত কত প্রাণের কথা কহিতে লাগিল। সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, আমি তাহার দিকে চাহিয়া আছি—তাহার চক্ষু আমার চক্ষুর সহিত—আমার চক্ষু তাহার চক্ষুর সহিত পরস্পর সম্মিলিত—সে আনন্দ সে সুখ-সে যে কি, তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমার নাই।

আমি কতক্ষণ এইরূপভাবে বসিয়াছিলাম বলিতে পারি না। সহসা সে নিজের বুকের কাছে একটা হাত তুলিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কান পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। তখনই পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে একটা অতি মৃদু শব্দ কানে আসিল। অমনি সেই অপরিচিতা বামা সত্বর সেই শালখানা তাহারমাথায় টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তৎপরে অতি দ্রুতপদে দরজা খুলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল—যাইবার সময় দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া গেল।

আমি ভিতরের ঘরের শিকল খুলিয়া কান পাতিয়া শুনিলাম, কোন শব্দ নাই। তখন আমি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া বসিলাম। তাহার পর বোধ হয়, সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র আমার মনে হইল যে রমণী রাত্রে রুমালখানি লইয়া যাইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। সে যেখানে বসিয়াছিল, তাহার চলিয়া যাইবার পরও আমি তথায় রুমলাখানি দেখিয়াছিলাম।। তাই ঘুম ভাঙ্গিবামাত্র সেখানা লুকাইয়া রাখিব বলিয়া সেই দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, রুমাল তথায় নাই।

—আমার স্ত্রী ঘর ঝাঁট দিয়া সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়াছে, আমার চা-এর জল গরম করিতেছে। সে আমার দিকে দুই এক বার চাহিল—আমি তাহাকে এমন করিয়া চাহিতে আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না—রুমালের কথাও কিছু বলিল না।

তাহাতেই আমার মনে হইল যে, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি মাত্র। কাল রাত্রে যাহা সত্য ভাবিয়াছিলাম, তাহা আর কিছু নহে স্বপ্নমাত্র। কিন্তু অপরাহ্নে আমি একবার বাহির হইতে দেখিলাম, আমার স্ত্রী সেই রুমালখানি হাতে লইয়া বিশেষ করিয়া দেখিতেছে। তাহার মুখ অপর দিকে ছিল, সুতরাং সে আমাকে দেখিতে পাইল না। —আমি স্পষ্ট দেখিলাম, সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রুমালখানা দেখিতেছে।

আমি কতবার মনে করিলাম যে, রুমালখানা আমার স্ত্রীরই। কাল রাত্রে যাহা দেখিয়াছি, তাহা সমস্তই আমার কল্পনা—স্বপ্ন মাত্র। আর তাহা যদি না হয়, তবে কাল রাত্রে যে আসিয়াছিল, সে প্রেতাত্মা নহে—প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক।

কিন্তু মানুষ মানুষে চিনিতে পারে, বুঝিতে পারে। কাল রাত্রে যে আমার সম্মুখে বসিয়াছিল, সে রক্তমাংসের কোন জীব নহে—ইহা আমি বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম।

সম্ভবতঃ সে কোন স্ত্রীলোক হইতে পারে। এখান হইতে দুই ক্রোশের মধ্যে কোন বস্তি বা লোকালয় নাই। দিনেই এই পার্বত্যপথে চলা-ফেরা বিপজ্জনক—অসম্ভব কোন স্ত্রী অন্ধকার রাত্রে রাত্রে এই ভয়াবহ কঠিন পর্বত পথে আসিতে সাহস করিবে? তাহাতে ঘোর অন্ধকার, দারুণ শীত—কোন স্ত্রীলোকের এই দুর্গম স্থানে, এ কুটীরে আগমন একেবারেই অসম্ভব।

আরও কারণ—কোন স্ত্রীলোকের উপস্থিতিতে শিরায় শিরায় অস্থিমজ্জায় গলিত তুষারস্রোত প্রবাহিত হয়?

যাহাই হউক, সে যেই হউক, সে যদি একবার আসে, তাহা হইলে তাহার সহিত কথা কহিব। আমি হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিব। তাহা হইলেই দেখিতে পাইব সে রক্তমাংসের জীব, না বায়ু—কেবল কল্পনা, কেবল শূন্য, একটা ছায়ামাত্র।

তোমার মন্মথ।

ষষ্ঠ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

এই সকল পত্র কখনও যে তুমি পাইবে, সে আশা আমার নাই। আমি এখান হইতে এ সকল চিঠি তোমাকে পাঠাইব না। তোমার নিকট এ সকল পাগলের পাগলামি, উন্মত্তের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। যদি কখনও দেশে ফিরি, তাহা হইলে হয়ত কোনদিন-না-কোনদিন এই সকল পত্র তোমায় দেখাইতে পারি, তাহাও শীঘ্র নহে। যখন আসিয়া এইসব লইয়া হাস্যবিদ্রূপ করিতে পারিব, কেবল সেই সময়েই তোমায় এ সকল পত্র দেখাইব। এখন আমি এগুলি লিখিতেছি, আমার মনের যাতনায়। এগুলি এইরূপে না লিখিলে হয়ত আমাকে চীৎকার করিয়া মনের যাতনা লাঘব করিতে হইত।

সে প্রত্যহ রাত্রে আসে, সেইরকম আগুনের কাছে বসে, সেইরকম আমারদৃষ্টির সহিত দৃষ্টিবিন্যাস করে—সেই কুহকিনী মৃদুমধুর হাসি হাসে—আমার মস্তিষ্ক ঘোরতররূপে বিচঞ্চল হইয়া উঠে, আমি আত্মহারা হই—আমার অস্তিত্ব যেন তাহার মধ্যে লীন হইয়া যায়।

এখন আমার লেখা সম্পূর্ণ-ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে—লিখিবার চেষ্টাও করি না। আমি সাঁকোর উপর তাহার শুভাগমনের পদশব্দ—ঘাসের উপর পদশব্দ—দরজায় মৃদু করাঘাতের শব্দ শুনিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে উৎকর্ণ হইয়া থাকি।

সে আসিলে সেই ভাব—আমি আর কথা কহিতে পারি না—আমি আর আমাতে থাকি না—কোন কথাই আর মনে হয় না—সেও কোন কথা কহে না, কেবল সেইরূপভাবে চাহিয়া থাকে, সেইরূপ হাসি হাসে।

প্রত্যহ আমি মনে করি, আজ সে আসিলে আমি নিশ্চয়ই তাহার সহিত কথা কহিব, নিশ্চয়ই তাহাকে স্পর্শ করিব। কিন্তু সে আসিবামাত্র আমি সকলই ভুলিয়া যাই, আমার অস্থিত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

কাল রাত্রে যখন আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলাম, সেই সময়ে ক্রমে ক্রমে আমার মন তাহার অপরূপ সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাহার ওষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত হইল, সে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি পার্শ্ববর্তী কক্ষের গবাক্ষের দিকে চাহিলাম, চাহিবামাত্র বোধ হইল, কে জানালা হইতে সহসা মুখ সরাইয়া লইল। এদিকে নিমেষমধ্যে সে শাল মস্তকে টানিয়া দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

আমি আলো লইয়া পার্শ্বের গৃহে গেলাম। দেখিলাম আমার স্ত্রী নিদ্রিতা রহিয়াছে।

তোমার মন্মথ।

সপ্তম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

রাত্রির জন্য আমি ভীত নহি, দিনের জন্যই ভীত। যে স্ত্রীলোককে আমি আমার স্ত্রী বলিয়া আসিতেছি, তাহাকে আমি প্রাণের সহিত এখন ঘৃণা করি। সে ঘৃণার ইয়ত্তা নাই—সীমা নাই—অন্ত নাই। তাহার যত্ন শ্রদ্ধা সোহাগ সমস্তই এখন বিষবৎ বোধ হয়। কি জানি, কেন তাহার চোখের দিকে চাহিলে আমি শিহরিয়া উঠি।

সে সকলই দেখিয়াছে, সকলই জানিতে পারিয়াছে, আমি ইহা বেশ বুঝিতেছি।—তাহাই কি?

অথচ সে আমাকে এখনও ভালোবাসে, যত্ন পূর্ববৎ, অনুরাগ পূর্ববৎ—ভক্তি পূর্ববৎ। তথাপি আমার মনে হইতেছে সমস্ত জাল, সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই ছলনা, প্রতারণা—আমরা পরস্পরে প্রণয় ভালোবাসা জানাইতেছি—অথচ সব জাল, সব মিথ্যা, সব ছলনা। আমি জানি—সে সব দেখিয়াছে, সব জানিয়াছে, তাহার চোখ আমাকে ইহা স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে। আমি জানি, সে কেন এই ভীষণ প্রতিহিংসার আয়োজন করিতেছে।

তোমার মন্মথ।

অষ্টম পত্র

প্রিয় সুরেশ,

আজ সকালে হাটে যাইব বলিয়া আমি বাহির হইলাম। আমার স্ত্রী দরজায় দাঁড়াইয়া রহিল, ক্রমে আমি তাহার দূরবর্তী হইতে লাগিলাম। পরে একবার চাহিয়া দেখি, দূর হইতে আমার স্ত্রীকে একটি ক্ষুদ্র পুত্তলিকার ন্যায় দেখাইতেছে। অবশেষে পর্বত বেষ্টন করায় আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তখন আমি উঠিতে উঠিতে পড়িতে পড়িতে মহাবেগে ছুটিয়া অন্য পথ দিয়া গৃহের দিকে আসিতে লাগিলাম। পার্বত্যপথ সহজ নহে, কত উঠিয়া পড়িয়া তবে অন্যদিক দিয়া আমার গৃহের নিকট আসিলাম। তথায় এক বৃহৎ প্রস্তরখন্ডের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া আমার গৃহপ্রতি সতর্কদৃষ্টি রাখিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলাম, আমার স্ত্রী এক টাঙ্গি লইয়া কাঠের সাঁকোর নিকট আসিল। আমি যেখানে ছিলাম, তথা হইতে, সে কি করিতেছে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সেই দূর

হইতেও আমি তাহার মুখে হাসি লক্ষ্য করিলাম—কিন্তু মনে হইল, সে হাসির ভিতরে প্রতিহিংসার বহ্নি ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে।

সে গৃহে চলিয়া গেলে আমি আবার হাটের দিকে চলিলাম। হাট হইতে সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলাম, সে আমাকে পূর্বের ন্যায় সমাদরে গৃহে অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

আমি যে তাহার ভয়াবহ কার্য দেখিয়াছি, তাহা ঘুণাক্ষরে তাহাকে জানিতে দিলাম না। তাহার শয়তানী কার্য ঐরূপই থাক। সে ভাবিয়াছে, কোন স্ত্রীলোক রাত্রে সাঁকো পার হইয়া আমার সহিত প্রেমালাপ করিতে আসে, তাহাই সে সাঁকো কাটিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। আজ সে আসিলে অতল খাদ-নিম্নে পতিত হইয়া যাইবে।

আমি কিছু বলিলাম না। ইহাতে আজ সপ্রমাণ হইবে যে, প্রত্যহ রাত্রে আমার কাছে যে আসে—সে কে। যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে ভগ্নপ্রায় সেতুতে তাহার কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, আর যদি সে প্রকৃতই কোন স্ত্রীলোক হয়, তাহা হইলে—

আমি এ চিন্তা প্রাণ হইতে দূর করিলাম। ভাবিতেও আমার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল।

যদি প্রকৃতই মানবী হয়, তাহা হইলে কহিয়া কেবলই আমার দিকে চাহিয়া থাকে কেন? আমিই বা কেন তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি না? কেন তাহার সম্মুখে আমার অস্তিত্ব নষ্ট হইয়া যায়? নিশ্চয়ই মানবী নহে। আমার স্ত্রী তাহার কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না। হতভাগিনী প্রতিহিংসার এই ব্যর্থ চেষ্টায় আরও জ্বলিয়া অস্থির হইবে। —বেশ হইবে।

কিন্তু যদি সে প্রেতলোকবাসিনীই হইবে, তবে আমি তাহার পদশব্দ শুনিতে পাই কেন? কেনই বা তাহার পায়ে স্পষ্ট শিশিরের দাগ দেখিতে পাই—কেনই বা তাহার দ্বারে আঘাত শব্দ শুনিতে পাই? এ সকল ত প্রেতের চিহ্ন নহে।

রাত্রি হইয়াছে, পূর্বের ন্যায় পার্শ্বের ঘরে আমার স্ত্রী ঘুমাইতেছে। আমি একান্ত মনে গৃহে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহার পদশব্দের প্রতীক্ষা করিতেছি।

যদি সে প্রেতাত্মা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সাঁকো হইতে পড়িবার সময়ে আর্তনাদ শুনিতে পাইব। অথবা কোনো প্রেতলোকের অজানিত কুহকজালে আমাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছে! সহসা একি—একি এ প্রেতাত্মার বিদ্রূপ!

আমি শুনিয়াছি—আমি সেই ভয়াবহ আর্তনাদ এইমাত্র শুনিয়াছি, হৃদয়ভেদী—গগনভেদী আর্তনাদ আমি শুনিয়াছি।

আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করিয়া, অন্ধকাররাশি আলোড়িত করিয়া সেই ভয়ানক আর্তনাদ সাঁকোর নিকট হইতে উত্থিত হইল, সেই গভীর খাদ-মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে আর্তনাদের বর্ণনা নাই—সে আর্তনাদ এখনও আমার কর্ণপথ দিয়া আমার শিরায় শিরায় শোণিতের সহিত ছুটিতেছে।

আমি গৃহ হইতে সবেগে বাহির হইলাম। সাঁকোর নিকটে আসিলাম। শুইয়া পড়িয়া হাত বাড়াইয়া দেখিলাম, সাঁকো আর নাই।

নীচের দিকে চাহিয় দেখিলাম, ঘোর অন্ধকার—সেই গভীর গহ্বর ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ—কিছু দেখিবার উপায় নাই!

প্রবলবেগে বাতাস বহিতেছে। আমি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। সেই প্রবল বাতাসে আমার উচ্চ প্রবল চীৎকার যেন পৈশাচিক হাস্যকল্লোলের ন্যায় দিগ্বলয় কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আমি বুঝিতেছি। এতদিন যে উন্মত্ততা ধীরে ধীরে আমাকে অত্যন্ত কঠিনভাবে আঁক্‌ড়াইয়া ধরিয়াছে, আর কোন উপায় নাই—চেষ্ট বৃথা—বৃথা—বৃথা—

আমি কতবার মনে মনে বলিতেছি, এ কেবল আমর বিকৃত অসুস্থ পীড়িত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র—এ আর্তনাদও আমার কল্পনামাত্র।—না—না—না—ঐ সেই শব্দ! ঐ সেই আর্তনাদ! ঐ সেই মর্মভেদী আর্তনাদ!

প্রতিক্ষণে আমার মস্তিষ্কে কে যেন গুরুভার লোহার হাতুড়ি দিয়া নির্দয় আঘাত করিতেছে। আমি বুঝিয়াছি সে আর আমার কাছে আসিবে না। — এই শেষ!

তোমার মন্মথ।

শেষ পত্র

প্রিয় সুরেশ,

আমি একটা বড় খামে সমস্ত পত্রগুলি রাখিয়া তোমার ঠিকানা লিখিয়া যাইব। যদি কখনও কেহ এইখানে আসে, তাহা হইলে সে হয়ত তোমাকে এই পত্র পাঠাইয়া দিতে পারে।

আমার লেখাপড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা—আমি আর আমার স্ত্রী—

তোমাকে বুঝাইবার জন্য যাহাকে এখনও আমার স্ত্রী বলিতে হইতেছে,—আমরা উভয়ে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া থাকি, কেহ কোন কথা কহি না। এ এক অতি আশ্চর্য পরিবর্তন।

যখন কথা কহি, তখন এইরূপভাবে কথা কহি, যেন আমাদের উভয়ের এই প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। যে দুই একটা কথা কহি, তাহাও আমাদের পরস্পর মনের ভাব তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখিতেছি।—সে ইহা গোপন করিতে চেষ্টা পায়, কিন্তু আমি ইহা দেখিতেছি। তাহার চেষ্টা বৃথা!

প্রত্যহ রাত্রে নির্জনে বসিয়া থাকিতে থাকিতে মনে হয়, যেন সে পূর্বের ন্যায় দ্বারে আঘাত করিতেছে, আমি সত্বর গিয়া দরজা খুলিয়া দিই, কিন্তু কই, কেহ নাই, কেবল অন্ধকার—সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া গৃহমধ্যে বাহিরের কতকটা শীতল বাতাস প্রবেশ করে মাত্র—আর কিছুই না।

এই দুর্গম স্থানে বাস করিয়া আমি দানব হইয়াছি। ভালোবাসা ও ঘৃণা দুইই ভয়াবহভাবে আমার হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটাইয়াছে, আমর মস্তকে শত চিতানল জ্বালাইয়া দিয়াছে। আমার লেখাপড়া, শিক্ষা, সদ্‌গুণ—সমস্ত এই পাহাড়ের বাতাসে যেন আমার হৃদয় হইতে উড়িয়া গিয়াছে! আমি হিংস্র পশু হইয়াছি।

কবে ইহার—এই স্ত্রীলোকের, যে এক সময়ে আমার স্ত্রী ছিল, তাহার কুসুমকোমল কণ্ঠদেশ আমার এই রোগশীর্ণ কঙ্কালসার কঠিন আঙ্গুলি দ্বারা সবলে পেষণ করিব—তাহার আরক্ত জিহ্বা লতাইয়া পড়িবে, কবে তাহার গলা ধীরে ধীরে, জোরে জোরে, আরও জোরে টিপিতে থাকিব! দেরি নাই—দেরি নাই! তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিতে ঠেলিতে এই কুটীর হইতে লইয়া যাইব—এই বন্ধুর কঠিন পাথরের উপর দিয়া লইয়া যাইব—এই খাদের নিকট আনিব। সে বড় বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল বটে! এবার হাসির পালা আমার! হো-হো-হো—

আমি জোর করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে ঠেলিয়া লইয়া যাইব, ধীরে ধীরে আদর করিয়া—এই খাদের ধারে যখন তাহার পায়ের একটিমাত্র অঙ্গুষ্ঠ পাহাড়ে থাকিবে—সে হেলিয়া পড়িবে, তাহার পর নিম্নে-নিম্নে-নিম্নে—কুয়াসার মধ্য দিয়া, লতাপাদপগুল্ম ভেদ করিয়া, পশুপক্ষীকে স্তম্ভিত করিয়া—নিম্নে-নিম্নে—গভীরতর নিম্নে—দুইজনে একত্রে যাইব—যাইব—যাইব—যাইব যতক্ষণ না তাহার সহিত মিলিত হই—"

(এই পত্র অসম্পূর্ণ।)

এই শেষ পত্র—এই ভয়াবহ পত্র কয়েকখানি পাঠ করিয়া আমি প্রবোধের মুখের দিকে চাহিলাম, সেও আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি তাহার মুখে যে ভাব দেখিলাম, সে বোধ হয় আমার মুখে তাহাই দেখিল। অমি দেখিলাম, প্রবোধের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আমরা উভয়ে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে সাহস করিলাম না। উভয়েরই হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছিল।

সংসারে এই ভয়াবহ ব্যাপার যে ঘটিতে পারে, তাহা আমাদের বিশ্বাস ছিল না। আমাদের পথপ্রদর্শক থম্বিমেনা "শয়তান কা ঔরত" বলিয়া যে ভয়ে এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে, এখন বুঝিলাম, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে।

এতদিন ভুতপ্রেতের কথা বিশ্বাস হয় নাই। ভূতপ্রেত হউক বা না হউক, পত্রলেখক মন্মথ এই নিভৃত স্থানে বাস করিয়া ভূতের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া ভয়ঙ্কর উন্মত্ত হইয়া নিজেও মরিয়াছে। তাহার প্রমাণ এই সকল পত্র।

ভোর হইতে-না-হইতে আমরা সে স্থান হইতে পলাইলাম। রামোচন্দ্র! আর সেখানে এক মিনিট থাকে! বস্তিতে আসিয়া আমাদের দুই কুলি ও থম্বিমেনাকে পাইলাম। আমারা যে সেই গৃহে রাত্রিযাপন করিয়া এখনও জীবিত আছি, ইহা দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা দার্জিলিং পৌঁছিয়া পত্রগুলি সমস্ত কমিশনার সাহেবকে দিলাম। শুনিয়াছি, তাঁহার আজ্ঞায় এই ভয়াবহ কুটীরটা একদিন জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাড়ী, বুড়ো, বুট

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বাড়ীখানি ভারি ভালো লাগল। চারিধারে বাগান—যদিও ফুলগাছের চেয়ে বড় বড় গাছই বেশী। টেনিস-খেলার জমি, মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের বেদী, একটি ছোট বাহারী ফোয়ারা, এখানে ওখানে লাল কাঁকর-বিছানো পথ।

দোতালা বাড়ী—একেবারে হালফ্যাসানের না হ'লেও সেকেলে নয়। বাড়ীর জানালায় বা দেয়ালে প্রাচীনতার কোন চিহ্নই নেই। কোথাও ফাট ধরেনি, কোথাও অশথ্-বট এসে জোর ক'রে জুড়ে বসেনি।

কিন্তু তবু মনে হ'ল বাড়ীখানা যেন রহস্যময়। ভাবলুম বাড়ীর মাথা ছাড়িয়ে উঠে মস্ত মস্ত গাছগুলো নিজেদের জন্যে একটি ছায়ার জগৎ সৃষ্টি করেছে ব'লেই হয়তো এখানে এমন রহস্যের আবহ গ'ড়ে উঠেছে। আমার পক্ষে এও এক আকর্ষণ। আমি রহস্য ভালোবাসি। রহস্যের মধ্যে থাকে 'রোমান্সে'র গন্ধ।

সাঁওতাল পরগণার একটি জায়গা। স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েদের বায়ু-পরিবর্ত্তনের দরকার-ডাক্তারের মতে এ-জায়গাটি নাকি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে এখানে এসেছি, মনের মতন একটি বাড়ী খুঁজে নিতে। আজকের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরব।

খানিক ডাকাডাকির পর বাগানের ভিতর থেকে একটি লোক বেরিয়ে এল—তার চেহারা না মালী, না দ্বারবান, না ভদ্র বা ইতর লোকের মত। তার বয়স আশীও হ'তে পারে, একশোও হ'তে পারে! তার মাথায় ধবধবে সাদা, এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল। তার কোমর এমন ভাঙা যে, হাড়-জিরজিরে দেহের উপর-অংশ একেবারে দুমড়ে পড়েছে। কিন্তু হাতের লাঠি ঠক্-ঠকিয়ে সে এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যে, তার অসম্ভব ক্ষিপ্রতা দেখে বিস্মিত হলুম।

সে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনারা কী চান ?"

—"বাড়ীর ফটকের উপরে লেখা রয়েছে—'টু লেট'। আমরা এই বাড়ীখানা ভাড়া নিতে চাই।"

লোকটা হঠাৎ মুখ তুলে তাকালো। সে এতক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে ছিল ব'লে তার চোখ দেখতে পাইনি। এখনো দেখতে পেলুম না, কারণ তার চোখ এমনি অস্বাভাবিকভাবে কোটরগত যে, প্রথম দৃষ্টিতে তাদের আবিষ্কার করাই যায় না! মনে হয়, লোকটা বুঝি অন্ধ। কিন্তু তারপর লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, দুই কোটরের ভিতর দিকে কি যেন চক্-চক্ করছে—দুই অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যেন দুই দীপশিখার ইঙ্গিত!

লোকটা আবার মুখ নামিয়ে ফেলে থেমে থেমে বললে, "ভাড়া নিতে চান? এই বাড়ী ভাড়া নিতে চান? বেশ!"

—"বাড়ীখানা আমাদের পছন্দ হয়েছে! এ বাড়ীর মালিক কে?"

—"বাড়ীর এখনকার মালিক থাকেন বিলাতে। আগেকার মালিক কোথায় থাকেন, কেউ জানে না।"

—"তাহ'লে ভাড়া দেব কাকে?"

—"আমাকে।"

—"কত ভাড়া?"

—"সেটা ঠিক করবেন আপনারাই।"

রহস্যময় বাড়ী, রহস্যময় বৃদ্ধ এবং তার কথাগুলোও কম রহস্যময় নয়! মনে হ'ল, রহস্যের মাত্রা যেন ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এতটা ভালো নয়!

কী বলব ভাবছি, হঠাৎ গায়ে পড়ল এক ফোঁটা জল। চম্‌কে মুখ তুলে দেখি, ইতিমধ্যে আমাদের অজান্তেই আকাশে হয়েছে মেঘের সঞ্চার!

বুড়ো বললে, "বৃষ্টি আসছে। আপনারা একটু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াবেন চলুন।"

বুড়োর পিছনে পিছনে বাড়ীর নীচের তলার বারান্দার তলায় গিয়ে দাঁড়ালুম।

ঝম্-ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নামল।

প্রকাশ আমার দিকে ফিরে বললে, "বৃষ্টিতে এখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। চল, আগে বাড়ীর উপরকার ঘরগুলো একবার দেখে আসি।"

বুড়োর দিকে ফিরে দেখি, সে উর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে ডাকলুম, সে যেন শুনতেই পেল না। খানিক পরে হঠাৎ বললে, "ঘড়িতে কটা বেজেছে?"

হাত-ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললুম, "এখন সাড়ে পাঁচটা।"

বুড়ো যেন শীতার্ত্ত কণ্ঠে কাঁপতে কাঁপতে বললে, "আকাশে মেঘ আরো জমে উঠছে। অন্ধকারে সন্ধ্যা নামবে তাড়াতাড়ি। এ বৃষ্টি সন্ধ্যার পরেও পড়বে।"

—"না পড়তেও পারে।"

—"না না, এ বৃষ্টি এখন থামবে না, হয়তো আজ সারা রাত ধ'রেই পড়বে। আমি মেঘ দেখেই বুঝতে পারি।"

প্রকাশ বললে, "কী সর্ব্বনাশ, তাহলে আমরা স্টেশনে যাব কি ক'রে? আজই যে আমাদের কলকাতায় ফেরবার কথা!"

বুড়ো ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, "এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না—আজ আর থামবে না! পাহাড়ে নদী ফুলে উঠবে,মাঠ ভেসে যাবে, পথ ডুবে যাবে। পালাতে চান তো এখনি পালান!। সন্ধ্যার পর রাত আসবে, ঝড় উঠবে, বন কাঁদবে—এ বৃষ্টি আজ আর থামবে না! এখনো সময় আছে, এখনি পালিয়ে যান!"

বুড়োর কথাবার্ত্তার ধরন দেখে রাগ হ'ল। বিরক্ত কণ্ঠে বললুম, "ঠাট্টা রাখো, শোনো! এ বাড়ী আজ থেকেই আমি ভাড়া নিচ্ছি। বৃষ্টি না থামে, আজ আমরা এইখানেই রাত কাটাবো। কত টাকা দিতে হবে বল?"

বুড়ো আবার মুখ তুললে—আবার দেখলুম তার চক্ষুকোটরগত দুই দীপশিখার ঝিলিক! দন্তহীন মুখ ব্যাদান ক'রে নীরব হাসি হেসে সে বললে, "আজ রাতে এখানে থাকবেন? থাকতে পারবেন?"

—কেন পারব না?"

—বাড়ীর আগেকার মালিক আজ রাতে এখানে আসবেন। তিনি কোথায় থাকেন কেউ তা জানে না, কিন্তু বৃষ্টির রাতে ঠিক এখানে বেড়াতে আসেন। তাঁকে দেখলে মানুষ খুশি হয় না। দোতালার হল-ঘর তাঁর জন্যই খোলাই থাকে। এক বৃষ্টির-রাতে ও-ঘরে একটি কাণ্ড হয়েছিল!"

—"কি হয়েছিল?"

—"রক্তাক্ত কাণ্ড! সন্ধ্যার সময় মালিক ফিরে এলেন—তখন ঝুপঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। হাতে তাঁর বন্দুক, পরোনে তাঁর শিকারের পোষাক। তারপর—না. না, সে সব কথা আপনাদের আর শুনে কাজ নেই। কিন্তু সেইদিন থেকে এ বাড়ী কেউ ভাড়া নিতে চায় না!"

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললুম, "তুমি কি আমাদের ছেলেমানুষ পেয়েছ যে, যা তা ব'লে ভয় দেখাতে চাও?"

—"বেশ, তবে তোমরা থাকো, আমি চললুম। কিন্তু সাবধান, সাবধান, সাবধান!" বলতে বলতে বুড়ো লাঠি ঠক্‌ঠকিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রপদে আবার বাগানে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রকাশ বললে "পাগল!"

আমি বললুম, "পাগল নয়, পাজী। বুড়োর হয়তো ইচ্ছা নয়, আর কেউ এ-বাড়ী ভাড়া নেয়। সে একলাই এখানে রাজত্ব করতে চায়। কিন্তু বাইরে যখন ভাড়া-পত্র টাঙানো আছে, তখন আমাদের ভাবনা কি? চল, একবার দোতালার ঘরগুলো দেখে আসি।"

দোতলার বারান্দায় উঠে দাঁড়ালুম। সেখান থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

আরো পুরু, আরো কালো হয়ে উঠেছে আকাশের মেঘ। আরো জোরে, আরো ঘন-ধারায় পড়ছে বৃষ্টি.....ঝম্‌ঝম্-ঝম্‌ঝম্। সন্ধ্যার আগেই দ্রুত নেমে আসছে সন্ধ্যার অন্ধকার। দূরের ছোট ছোট পাহাড়গুলো ক্রমেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। দুই-কূল-ভাসানো নদীর ছবি আঁকা, জল-থই-থই-করা প্রান্তরের মাঝে মাঝে বড় বড় গাছগুলো মাতাল হয়ে টল্‌মল্ করছে ঝোড়ো-বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে।

প্রকাশ বিষণ্ণ স্বরে বললে. বুড়োর একটা কথা কিন্তু ঠিক। আজ এইখানেই বন্দী হ'তে হবে।"

—"উপায় নেই।"

—"কিন্তু খাবে কি?"

—"আকাশের জল।"

—"শোবে কোথায়?"

—"পিছন ফিরে ঐ হল-ঘরটা দেখ। ওর তিনটে দরজাই খোলা। এখনো যেটুকু আলো আছে তাইতেই দেখা যাচ্ছে, ঘরের ভিতরে রয়েছে বড় বড় সোফা,

কৌচ আর। দেয়ালের গায়ে রয়েছে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো মস্ত মস্ত ছবি আর আয়না। মেঝের উপরে কার্পেট পাতা। আশ্চর্য্য এই, এমন সাজানো বাড়ী খালি প'ড়ে আছে!"

প্রকাশ সন্দেহ-ভরা কণ্ঠে বললে, "তবে কি বুড়োর কথা মিথ্যা নয়? এখানা কি—"

"ভূতের বাড়ী? ক্ষেপেছ? তা মানলে বলতে হয়, এ বাড়ীর আসল ভূত হচ্ছে ঐ বুড়োই!"

—"বিচিত্র কী! বুড়োর মতন চেহারা আমি কোন মানুষেরই দেখিনি!"

কানে এল অপূর্ব্ব এক সঙ্গীত! হার্মোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে যেন কোন মেয়ে! রবীন্দ্রনাথের গান। গায়িকার গলা চমৎকার।

সবিস্ময়ে দুজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে খানিক্ষণ ধ'রে সেই গান শুনলুম।

আকাশে বেড়ে উঠল বিদ্যুতের জীবন্ত অগ্নিচিত্র ও উন্মত্ত বজ্রের চীৎকার! ঘরে-বাইরে কোথাও আর চোখ চলে না?"

আমি বললুম, "এ গান আসছে কোথা থেকে?"

প্রকাশ বললে, "ঐ হল-ঘরের ভিতর থেকে।"

বিদেশে আসছি ব'লে সঙ্গে 'টর্চ' আনতে। 'টর্চ'টা জ্বেলে দুজনেই হল-ঘরের ভিতরে ঢুকলুম। সব আসন খালি। ঘরের ভিতরে একটি 'অর্গ্যান' রয়েছে, তার সামনেই কেউ নেই।

প্রকাশ তবু জোর ক'রেই বললে, "যে গাইছে সে এই ঘরেই আছে।"

আমি বললুম "অসম্ভব। অন্য কোন ঘরে কেউ গান গাইছে।"

প্রকাশ অস্বস্তি-ভরা স্বরে বললে, "না, না, গান হচ্ছে এইখানেই! যে গাইছে তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু আমি তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছি! আমার মনে হচ্ছে, এ ঘরটা যেন হিমালয়ের বরফ দিয়ে গড়া! উঃ, কী ঠাণ্ডা! এ মানুষের ঘর নয় বন্ধু, এ হচ্ছে মড়ার ঘর!"

আমরা তাড়াতাড়ি আবার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রকাশের কথা মিথ্যা নয়। ঘরের চেয়ে বাহিরটা বেশ গরম—অথচ ঝোড়ো হাওয়ার তোড়ে সেখানে এসে পড়ছিল শীতল বৃষ্টি ধারা!

অবাক হয়ে এর কারণ বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময় কানে এল আর একটা নতুন শব্দ

গট্ গট্ ক'রে কার ভারি জুতোর আওয়াজ হচ্ছে।

প্রকাশ বিস্মিত স্বরে বললে, "সিঁড়ি দিয়ে কে উপরে উঠছে। এ বুড়োর পায়ের শব্দ নয়!"

আমি বললুম, "বুড়ো মিছে কথা বলেছে। এ বাড়ী নিশ্চয়ই খালি নয়। কে গান গায়? কে উপরে ওঠে?" সিঁড়ির দিকে 'টর্চে'র আলো ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সিঁড়ির ধাপগুলো শব্দিত ক'রে উপরের বারান্দায় এসে স্থির হয়ে রইল একজোড়া শিকারী-বুট—যা পরলে লোকের হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা পড়ে।

নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলুম না—মানুষ নেই অথচ একজোড়া শিকারী-বুট উপরে এসে উঠল জ্যান্ত বীরের মত!

মন বললে, ঐ দৃশ্যমান বুট প'রে আছে কোন অদৃশ্য দেহ এবং বারান্দায় হঠাৎ আজ দুই অনাহূত অতিথি দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সবিস্ময়ে!

প্রকাশ অস্ফুট স্বরে বললে, "শিকারী-বুট! বুড়োও ব'লেছিল, বৃষ্টির রাতে বাড়ীর মালিক এসেছিল শিকারীর পোষাক প'রে!"

আমি উত্তর দেবার আগেই বুট-জুতোজোড়া যেন বেজায় ভারী দেহের চাপ নিয়ে আবার গট্‌গট্ শব্দে মাটি কাঁপিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগল আমাদের দিকেই!

আমরা মহা আতঙ্কে পিছু হট্‌তে লাগলুম পায়ে পায়ে। আমাদের দৃষ্টি স্তম্ভিত, হৃৎপিণ্ড করছে ধড়্‌ফড়্।

হল-ঘরের তৃতীয় দরজার কাছে এসে বুট-জুতোজোড়া আবার থেমে পড়ল—ক্ষণিকের জন্যে। কিন্তু তারপরেই সবেগে প্রবেশ করল ঘরের ভিতরে! গানের স্বর থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম্ গুড়ুম্ ক'রে বন্দুকের শব্দ ও তীব্র এক আর্ত্তনাদ!

আমরা পাগলের মত দৌড়ে এক এক লাফে সিঁড়ির তিন-চারটে ক'রে ধাপ পেরিয়ে নীচে নেমেই দেখি, সেখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই অদ্ভুত বুড়োর ভাঙা দুম্‌ড়ে-পড়া মুর্ত্তি! সে একবার মুখ তুলে আমাদের পানে তাকালে—'টর্চ্চে'র আলোতে তার চক্ষু-কোটরের খুব ভিতরে জ্বলে উঠল দুটো আগুনের কণা!

খিল্-খিল্ ক'রে হেসে বুড়ো খন্‌খনে গলায় বলে উঠল, "মালিকের সঙ্গে দেখা হ'ল? মালিক কী বললে? বাড়ী ভাড়া নেবে নাকি? হি হি হি হি হি!"

দৌড়তে দৌড়তে বাগান পার হ'য়ে যখন বাইরে এসে পড়লুম, তখনও সেই ভয়াবহ বুড়োর অপার্থিব হাসির শব্দ থামেনি!

বিলুকাকুর চিঠি

স্বপনকুমার মান্না

আমাদের বাড়ির সামনে রিক্সার হর্ন শুনে মা বললেন—দেখতো পলু, কে এল।

মা রান্নাঘরে ব্যস্ত। আমি ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতা তৈরী নিয়ে। লাল, নীল, কালো, সবুজ রঙ দিয়ে আলপনা আঁকছি খাতার কভারে। আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এক্সটারনাল একজামিনারকে তাক লাগিয়ে দেব। প্রতিবারেই আমাদের বিদ্যালয়ের ছেলেদের কম নম্বর দিয়ে যান। এবার নির্ঘাৎ মাষ্টার মশাইয়ের হাতের সব নম্বর ছিনিয়ে নেব।

মায়ের ডাকে মনোযোগ ছিন্ন হল আমার। বললাম-'যাই।' মনে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বাইরে এলাম। দেখলাম বেশ পরিপাটি করে ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক ভদ্রলোক। বয়স অনুমানে পঞ্চাশের উপর হলেও বেশ শক্ত সামর্থ্য। কাঁধে একটা লম্বা ঝোলানো কালো রঙের সাইড ব্যাগ। চোখে গোল চশমা। ব্যাগের মধ্যে রোল করা কয়েকটা কাগজও চোখে পড়লো।

আমাকে দেখে লোকটা বললো,—এটা কি দেবেন সর্দারের বাড়ি?

বললাম—হ্যাঁ

—উনি বাড়ি আছেন কি?

ভদ্রলোকটির এমন প্রশ্নে রিক্সওলা রতন বেরা খিক খিকিয়ে হেসে

উঠলো। আমি কোন কথা বলিনি। এমন পরিস্থিতিতে ভদ্রলোক বেশ রূঢ় স্বরে বললো—তা হঠাৎ হাসার কি দেখলে?

রতন বেরা কাঁধের গামছাটা কোমরে একপ্যাঁচ জড়িয়ে বললো—বাড়িওলাকে এখন আর কোথায় পাবেন? উনি অনেকদিন স্বর্গে গেছেন। এখন এই ছেলেটাই এতবড় বাড়ির মালিক।

একথা শুনে ভদ্রলোক বিড়বিড় করে বললো, দেবেন সর্দার মারা গেছে! কই একবারওতো দেখা হল না!

রতন বেরা বুঝলো লোকটা নিশচয়ই পাগল। নইলে মরা মানুষের সাথে দেখা হওয়ার কথা বলে। তাছাড়া এখন সন্ধ্যের মুখ। শিবানীপুর হাটে প্রচুর লোক সমাগম। এইবেলা না গেলে আর কোন ভাড়া পাবে না। তাই বললো—রিক্সা ভাড়াটা দিন।

—আমার কাছে তো কোন পয়সা নেই—, লোকটা বললো। রতন বেরা আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারলো না। বলে,— আপনি কেমন ধরনের মানুষ? পয়সা নেই রিক্সায় উঠেছেন?

রতন বেরার এই কথা শুনে লোকটা খলখল করে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বলে,—এই পৃথিবীর কোন জিনিসের উপর আমার মায়া নেই। তাই পয়সাও কাছে রাখার প্রয়োজনে মনে করি না।

যেমন ভেবেছিলাম তেমন একটা কিছু ঘটলো না। লোকটা কাঁধের ঝোলাব্যাগে হাত চালিয়ে কি যেন একটা বের করে রিক্সাঅলা রতন বেরার হাতে দিল। অন্ধকারে তেমন কিছু আমার চোখে পড়লো না। এবং তাতেই রতন বেরা রিক্সা ঘুরিয়ে পঁক্ পঁক্ আওয়াজ করতে করতে পিছু হটলো।

আমি আর ব্যাপাটাতে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে রঙ তুলি নিয়ে আঁকায় মন দিলাম। ছাদের ওপরের ঘরেও আমার কিছু কিছু আঁকার সরঞ্জাম থাকে।

খানিক বাদে বেশ অবাক হয়ে গেলাম। দেখি সেই হাফ বুড়ো লোকটা পায়ে পায়ে ছাদের ঘরে এসে হাজির। প্রশ্ন করলাম—তুমি এখানে কিভাবে?

—সম্মান দিয়ে কথা বলো, পলাশ। বলে লোকটা কাঁধের ব্যাগটা আমার পাশে মাদুরের ওপর রাখলো। তারপর বেশ অস্বস্তি প্রকাশ করে বললো—জানি, ছাদের এই ঘর দুটো কিছুদিন হল করেছ। তাই ফ্যান—ট্যান লাগাওনি । যাও চটপট নিচে থেকে একটা তালপাখা নিয়ে এসো তো।

আমি লোকটায় কথায় কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললাম—আপনিতো মশায় আচ্ছা লোক। খানিক আগে রিক্সাওলা রতন বেরাকে পয়সাই দিলেন না। আপনি কেমন সম্মানী লোক সেতো বুঝতেই পারছি। আবার সম্মানের বুলি আওড়াচ্ছেন।

আমার এই কথার লোকটা কিছুই মনে করলো না। হাত ঘুরিয়ে পাঞ্জাবীটা খুলে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখলো তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো—তোমার তো কাঁচা বয়েস। তাই গেঞ্জি জামা পরে থাকতে পারো। আমার বয়েস হয়ে গেছে তাই লজ্জাও অনেক কম।

এর উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছি অমনি নিচে থেকে মা বললেন—পলাশ কার সাথে কথা বলছো? কে এসেছে?

আমি আর দেরি না করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে শুরু করেছি। লোকটার আচারণ সম্পর্কে এই মুহূর্তে মাকে সব জানানো দরকার।

নিচে নেমে মায়ের মুখোমুখি হতেই বা বললো—কিরে পলু, অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

আমার উত্তরের মাঝে বাইরে থেকে কথা ভেসে এলো—বৌদি ও বৌদি। আমি বিলাস। দরজা খোল।

মা ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। মায়ের মাথায় ঘোমটা ছিল না। টেনে দিলেনও না। বুঝলাম লোকটা মায়ের বেশ পরিচিত। লোকটা মার উদ্দেশ্যে বললো—তখন থেকে ঠায় চেঁচাচ্ছি একবারও যদি কানে আওয়াজ যায়।

—ও বিলু ঠাকুরপো, আয় আয় ভেতরে আয়। তারপর মা বেশ আমদের মাথা সুরে বললেন—হ্যাঁরে তোর চেহারার কি হাল হয়েছে! একেবারে চেনাই যায় না।

মা আর মায়ের বিলু ঠাকুরপো বারান্দার আলোয় কাছাকাছি আসতেই আমি অবাক। বললাম—তুমি!

লোকটা বললো—আমি তো সব জায়গায় রে। আজ এখানে, কাল ওখানে। তারপর মার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো—কি বল বৌদি।

আমি লক্ষ্য করলাম কে এই উটকো বিলু ঠাকুরপো আসায় মায়ের মুখটা বেশ হাসিখুশি। কিন্তু আমি কেমন ধন্দের মধ্যে পড়ে গেলাম। খানিক আগে এই লোকটাই তো আমার ছাদের ঘরে এসে মাদুরের উপর কাঁধের

ঝোলা ব্যাগটা রাখলো, গরমের জন্য তালপাখা আনতে বললো, গায়ে চাপানো পাঞ্জাবিটা খুলে দেওয়ালে রাখলো — আমি একছুটে উপরে উঠলাম। দেখি মাদুরের উপর ঝোলা ব্যাগ, দেওয়ালে পাঞ্জাবী নেই। একটা হিমেল পরশ সারা শরীরে বয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোডশেডিং। মনে সাহস সঞ্চার করে হাতড়ে হাতড়ে নিচে নেমে, মায়ের মুখোমুখি হয়ে বললাম—সত্যি করে বল তুমি কে?

এমন অবস্থায় আমাকে ঝাঁকানি দিয়ে মা বললেন—পলু তুই অমন করছিস কেন? কি হয়েছে বল?

আমি তখন নিজের মধ্যে নেই। মুখ দিয়ে ক্রমাগত একই কথা বেরিয়ে আসছে—তুমি কে? বল তুমি কে?

আমার এ প্রশ্নের উত্তরে ধমক দিয়ে মা বললেন—থামতো বাড়িতে আসা অতিথির সঙ্গে কেউ ওভাবে কথা বলে না। তারপর মা বিলু ঠাকুপোকে ঘরের ভেতর এনে খাটের উপর বসালেন। আমার হাতে একশ টাকা আর একটা ব্যাগ ধরিয়ে মা বললেন—শিবানীপুর হাট থেকে একটা ইলিশ মাছ নিয়ে আয়। সঙ্গে এক খুরি দই। বিলু ঠাকুরপো দই-ইলিশ খেতে খুব ভালবাসে।

অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন মায়ের রান্নাঘরের কাজ মিটতে প্রায় দশটা বেজে গেল। মাঝে মাঝে রান্নার কাজে মাকে সাহায্য করতে হয়েছে। তাই সন্ধ্যের পর থেকে ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতাটা নিয়ে একদম বসা হয়নি। ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছি। খাতার কাজ এখনো অনেক বাকি। তিনটে ফুল গাছের ছবি, দু'জন মহাপুরুষের ছবি, চারটে ব্যায়ামের ছবি আঁকতে হবে। পেন্সিল স্কেচ পর্যন্ত করা হয়নি। অথচ আজ রাতটা শেষ হলেই ওয়ার্ক এডুকেশনের ফাইন্যাল পরীক্ষা।

একসঙ্গে খেতে বসেছি। বিলু কাকু আর আমি। বাড়িতে ইলেকট্রিক থাকার ফলে কেরোসিন বাতির ঝামেলা। অনেকক্ষণ থেকেই লোডশেডিং চলছে। কোনক্রমে একটা লম্ফ ম্যানেজ করে মা কষ্ট করে সবকিছু করছেন।

খেতে খেতে বিলু কাকুর দিকে তাকাতেই আমার চক্ষুস্থির। দেখি বিলু কাকুর ডান হাতটা অনেক লম্বা হয়ে উপরে উঠে গেছে। বাড়িতে বিড়ালের উপদ্রব বেশি বলে মা অনেক সময় ভাজা মাছ তেকাটায় ঝুলিয়ে রাখেন।

আজ সস্তায় ইলিশ পেয়ে কিলো দেড়েক এনেছিলাম। তারই কিছু অংশ মা তেকাটায় রেখেছেন। বিলু কাকু কেমন হাতটাকে অনেক বড় করে দিয়ে বসে বসেই তেকাটা থেকে মাছ ভাজা নিয়ে খাচ্ছেন। মা মুখ ঘুরিয়ে নিজের জন্য ভাত বাড়ছিলেন তাই মায়ের চোখে পড়েনি।

আমি একেবারে হতবাক। বিলু কাকু ম্যাজিক জানে নাকি! কিন্তু সেই মুহূর্তে বিলু কাকুর সারা কঙ্কালসার দেহটা চোখে পড়লো। আমি কিছু মুখ দিয়ে না বলতে পেরে ভাতের থালায় মুখ থুবড়ে পড়লুম।

জ্ঞান ফিরতে দেখি আমি খাটের উপর শুয়ে আছি। আমায় মাথার দিকে মা বসে আছেন আর পায়ের দিকে বিলু কাকু। বিলু কাকু তার একটা হাত আমার পায়ের উপর রাখতেই আমি 'আঃ' করে চিৎকার করে উঠলাম। ভয়ে চোখ বুজিয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলাম নিস্তেজ হয়ে।

কোনরকম নড়বার শক্তি নেই। কিন্তু মা আর বিলু কাকুর কথাগুলো স্পষ্ট কানে আসছে।

—বৌদি, পলুর কি মাঝে মাঝেই এটা হয়?

—কই তেমন কিছু দেখিনিতো। আজ একটু খাটাখাটুনি বেশি হয়েছে। ওয়ার্কএডুকেশনের খাতা তৈরি, তারপর তুই আসার পর বাজারে পাঠিয়েছি। তাছাড় পলু এমনিতেই আটটার সময় শুয়ে পড়ে। আজ তো খাওয়া-দাওয়া সারতেই অনেক রাত হয়ে গেল।

—অত্যধিক টেনশান থেকেই পলুর এ অবস্থা হয়েছে। তারপর মাকে আশ্বত্ব করতে বিলু কাকু বললো—বৌদি, তুমি শুয়ে পড়ো। রাত জাগলে তোমার শরীরের ক্ষতি হবে। সকালে উঠে তো আবার তোমাকেই বাকি কাজ সারতে হবে। তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি রাতটা বিলুর কাছেই থাকছি। আর তুমি তো পাশের ঘরেই থাকছো। কোনরকম অসুবিধে হলে তোমাকে ডেকে নেব।

আমার কপালে একটা চুম্বন দিয়ে মা পাশের ঘরে যাওয়ায় উদ্যোগ করতেই আমি মায়ের শাড়ির প্রান্ত টেনে ধরলাম। মা বললেন—ভয় কি। তোর বিলু কাকু রইলো, অসুবিধে হলে বলিস।

মা চলে যেতেই বিলু কাকু দরজায় খিল আটকে দিলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন আমার পাশে। অসম্ভব ঠাণ্ডা হাত লাগিয়ে আমার গায়ে মাথায়

হাত বুলোলেন কিছুক্ষণ। আমি ভয়ে কিছু সাড়া করতে না পেরে মনে মনে 'রামনাম' জপছি । 'ভূত আমায় পূত। পেত্নী আমার ঝি। রামলক্ষ্মণ সাথে আছে করবে আমায় কি!'

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে দেখি বিলু আমার পাশে শুয়ে নেই। মেঝেয় বসে আমায় ওয়ার্ক এডুকেশনের খাতায় বাকি ছবিগুলোর পেন্সিল স্কেচ করছে বিলু কাকু। বেশ খুশিতে মনটা ভরে উঠলো আমার। বিলু কাকুর স্বভাবটা একটু খারাপ ঠিকই কিন্তু বেশ কর্তব্যপরায়ন।

কোন রকম শব্দ না করে আড়মোড়া ভেঙে শুয়ে শুয়ে দেখছি বিলু কাকুর কেরামতি। কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। একি দেখছি! গায়ে মাংস বলে কিছু নেই। দুটো কাঠি কাঠি সাদা হাড় আমার ওয়ার্কএডুকেশনের খাতায় কি করছে।

এমতাবস্থায় চিৎকার করে পাশের ঘরে মাকে ডাকব সে সাহস ও বোল দুটোই হারিয়ে ফেলেছি। চোখ দুটো বন্ধ করে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছি বিছানায়।

মায়ের ধাক্কাধাক্কিতে আমি দরজা খুলে বাইরে এলাম। গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্য তখন অনেকটা উপরে উঠে গেছে। আজকেই আমার ওয়ার্কএডুকেশনের ফাইন্যাল পরীক্ষা। এখনই মুখ হাত ধুয়ে খাতাটা নিয়ে বসতে হবে।

ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে মা বললেন—তোর বিলু কাকু কোথায় রে?

এতক্ষণ আমার এদিকটা খেয়াল ছিলনা। ওয়ার্কএডুকেশনের খাতার কথাই শুধু ভাবছিলাম। মায়ের কোথায় অবাক হয়ে ঘরের মধ্যে দেখি তাইতো বিলু কাকু কোথায়! নেই তো।

মা বললেন—চিন্তা করিস না, বিলু হয়তো মর্নিং ওয়ার্ক করতে বেরিয়েছে । এখুনি এসে চা চেয়ে বসবে।

মা নিচে চলে গেলেন। আমি ভাবছি তাইবা কি করে হয়। বিলু কাকু সত্যিই যদি মর্নিং ওয়ার্ক করতে বেরোয় তাহলে ঘরের খিল তো খোলা থাকার কথা। মেঝেয় পড়ে থাকা ওয়ার্কএডুকেশনের খাতার পাতাগুলো ওলটাতেই আমি অবাক। কি সুন্দর নিখুঁত করে আঁকা ছবিগুলো। তিনটে ফুল গাছের, দু'জন মহাপুরুষের আর চারটে ব্যায়ামের ছবি। ভাবলাম বিলুকাকু ভূত—টূত কিছু নয়। নিশ্চয়ই কোন ম্যাজিক জানে।

পরক্ষণেই নিচে মা আর কাজের মেয়ে সরলা মাসির কথা কানে এল। মা বেশ গলা চড়িয়ে ডাকলেন-পলু, ঝপ করে একবার নিচে আয়তো।

আমি তড়িঘড়ি নিচে নেমে এলাম। দেখি মায়ের হাতে একটা লম্বা ভাঁজ করা কাগজ। কাগজটা আমার হাতে দিয়ে মা বললেন—পড়তো।

আমার জিজ্ঞাসা—কাগজটা কোথায় পেলে?

মাকে উত্তরটা দিতে না দিয়ে সরলা মাসি বললো—ঠাকুর দালানের কোণের দিকে ওটা পড়ে ছিল।

কৌতুহল আর না চাপতে পেরে কাগজটা খুলে পড়তে শুরু করলাম—

পূজনীয় বৌদি,

পত্রপাঠ আমার প্রণাম নিও এবং বিলুকে আমার ভালবাসা জানিও। তিনকুলে আমার কেউ নেই। আর নেই বলেই আমি একটু বাউন্ডুলে প্রকৃতির। ছোটবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালবাসতাম। তাই সময় অসময়ে রঙ, তুলি, কাগজ নিয়ে যেখানে খুশি ছবি আঁকতে চলে যেতাম। এগুলো সবই তুমি জানো। কিন্তু গতকাল গোবরঝুরি পোলের একটু পরে রাস্তার ধারে বসে বৈকালিক দৃশ্য আঁকছি, একমনে। হঠাৎই কোথা থেকে এক মালবাহী ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এসে পড়লো আমার উপর। ব্যস্, ভবলীলা শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এতে ও আমার দুঃখ নেই। দুঃখ হল মরার আগে আমার প্রতিশ্রুতিমতো তোমার ছবিটা এঁকে দিয়ে যেতে পারলাম না। তাই বিকালেই এস ডি ওয়ান বাই বি বাসে চেপে শিবানীপুরে তোমাদের বাড়ি চলে এলাম। রাত্রিরে তোমার ছবিটা তৈরী করে তোমার ঘরে টাঙিয়ে দিয়েছি। আর এতদিন করে দিতে পারিনি বলে ফাউ হিসাবে বিলুর ওয়ার্কএডুকেশনের খাতাটাও তৈরি করে দিলাম। আর সেই সাথে আমার আঁকায় সরঞ্জামগুলো আমার কালো ব্যাগের মধ্যে রেখে গেলাম। ভালো থেকো। বিলুকে বোলো ও যেন না ভয় পায়। ইতি—বিলু ঠাকুপো!

চিঠি পড়া শেষ হতেই মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমি একছুটে আমার দোতলার ঘরে এলাম। দেখি মেঝেয় পাতা মাদুরের এক কোণে একটা কালো রঙের ব্যাগ রাখা আছে। যে ব্যাগটা গতকাল বিলুকাকুর কাঁধে লক্ষ্য করেছিলাম। অলক্ষ্যে আমারও দু'চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল ঝরে পড়লো বিলু কাকুর জন্যে।

হাতে-নাতে পাকড়ানো

শিবরাম চক্রবর্তী

অনিরুদ্ধ সেন মলঙ্গা লেনের একটা একতলা ফ্ল্যাটে একটি মাত্র চাকর নিয়ে একলাটি থাকে। মোড়ের রেস্তোরাঁর কোণে বসে করঞ্জাক্ষ খবরের কাগজটা নিয়ে—পড়ছিলেন বলা যায় না ঠিক—কাগজখানাকে নিয়ে পড়েছিলেন। কাগজের ফাঁক দিয়ে খবর নিচ্ছিলেন বুঝি কারো।

তাঁর নজর ছিলো কাগজে নয়, অনিরুদ্ধর বাড়ির আওতায়।

খানিক পরে চাকরটা থলে হাতে বেরিয়ে গেলো, তিনি দেখলেন। বাজারেই যাক্ বা রেশন আনতেই রেস্তারাঁ থেকে উঠে তখন করঞ্জাক্ষ পাশের ডাক্তারখানা থেকে কাকে যেন ফোন করে। তারপরে অনিরুদ্ধর দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লেন। অনিরুদ্ধকেই এসে দরজা খুলে দিতে হলো।

অনিরুদ্ধবাবু?— প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই করঞ্জাক্ষ পরিচয় দিলেন নিজের—আমার নাম করঞ্জাক্ষ বোস। আমি একজন ডিটেক্‌টিভ্। অতুল দত্তের বিষয়ে জানতে এসেছি। অতুল—যে আপনার শ্বশুরকে খুন করার অভিযোগে ধরা পড়েছে—তাকে তো আপনি জানেন?

সদর দরজা বন্ধ করে অনিরুদ্ধ করঞ্জাক্ষকে বসবার ঘরে নিয়ে এলো—আপনাকে আর নতুন কি বলবো, তা জানিনে! আমার যা বলার ছিলো, তার সবই তো আমি পুলিশের কাছে বলেছি। বসুন।

করঞ্জাক্ষ একটি চেয়ার টেনে বসলেন। তাঁর হাতের পার্শেলটা রাখলেন পাশের টি-পয়ে।

অনিরুদ্ধ একটি চুরুট দিতে গেলো ওঁকে।

না, ধন্যবাদ। চুরুট আমি খাইনে।

ও! বলে অনিরুদ্ধ নিজেই চুরুটটা ধরালো।

যদি কিছু না মনে করেন, তাহলে আমার এই পার্শেলটা খুলি—করঞ্জাক্ষ বলেন মোড়কের ভাঁজ খুলতে খুলতে।

খুলতে পারেন। আশা করি, এর ভেতর কোনো বোমা টোমা নেই নিশ্চয়?

করঞ্জাক্ষ আস্তে আস্তে মোড়ক খুললেন। খুলতেই বেরুলো কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স। তার ভেতর থেকে সাদা একটি কাস্‌কেট তিনি বার করলেন। আর একটি কি যেন তার ভেতরে থেকে গেল, কিন্তু সেটাকে তিন নাড়লেন না, শুধু সেই কাস্‌কেটটিকে বার করে রাখলেন টেবিলের ওপরে—দু'জনের মধ্যিখানে। হাতির দাঁতের কারুকার্যখচিত দামী কাস্‌কেট। কিন্তু তার অনিন্দ্য শুভ্রতার গায়ে কে একটা বিচ্ছিরি কালো দাগ কেটে দিয়েছে। তার সৌন্দর্যকে লাঞ্ছিত করেছে যেন দাগটা। দাগটা রক্তের।

কাস্‌কেটটা দেখে অনিরুদ্ধর ভ্রূ কুঞ্চিত হলে—ঐ জিনিসটা! ওটা আবার কেন এখানে এনেছেন?

চিনতে পেরেছেন, দেখছি। আপনার শ্বশুরমশায়ের পড়ার ঘরে থাকতো এটা। তাঁর ডেস্‌কের ওপরেই? তাই না?

হ্যাঁ, সেখানেই তো। গত বছর জামাইষষ্ঠীর পর, তাঁর কন্যাকে নিয়ে যখন চলে আসি, তখনো এটা সেখানেই দেখেছিলাম।

আর যাননি তারপর?—তখন এটা কোথায় দেখেছিলেন?

মনে নেই। স্বল্পচ্ছরে শ্বশুরালয়ে সেই একদিনই যা আমার যাওয়া। তার পরের কথা তো আপনাকে আমি বলতে পারবো না। তারপরে যে এটা উনি কোথায় রেখেছিলেন—

সেইখানেই। সেই ডেস্‌কেই বরাবর ছিলো। জানালেন করঞ্জাক্ষ বোস—তাহলেও এটা আপনি কবে শেষ দেখেছিলেন, বললেন?

বললুম তো, জামাইষষ্ঠীর দিনে গত বছরের জষ্টি মাসে। কিন্তু এটাকে নিয়ে কথা বাড়াচ্ছেন কেন? এটার ওপর আমার আঙুলের ছাপ নিয়ে কেস্ সাজিয়ে এই হাঙ্গামায় আমাকেও জড়িয়ে ফেলতে চান, বুঝি? কিন্তু মাফ

করবেন গোয়েন্দামশাই, আপনাকে আমি খুশি করতে পারবো না। ওটা আমি ভুলেও ছুঁতে যাচ্ছিনে।

আপনি ভুল করছেন। সে-রকম কোনো দুরভিসন্ধি আমার নেই। আসল কথায় আসা যাক তাহলে।.....

আপনার শ্বশুরমশাই গত পরশু তাঁর পড়ার ঘরে খুন হয়েছেন। তখন তিনি নিজের ডেস্‌কে বসেছিলেন....এই কাস্‌কেটটার সামনে। সেই সময় তাঁর নিজের পিস্তল দিয়ে কেউ তাঁকে গুলি করে।...পিস্তলটা থাকতো তাঁর ডেস্‌কের ডান দিকের ড্রয়ারে। তাই না?

তা আমি ঠিক বলতে পারবোনা। বললে অনিরুদ্ধ, তাঁর পিস্তল নিয়ে আমি তো কখনো নাড়াচাড়া, মানে, তাঁকে নাড়াচাড়া করতে দেখিনি। তিনি কখনো আমাদের সামনে তাঁর পিস্তল বার করতেন না।

এমন কোনো ব্যক্তি তাঁকে গুলি করেছিলো—যাকে ভয় করার কোনো কারণ ছিলো না তাঁর। আপনার শ্বশুরমশায়ের যখন অন্য দিকে নজর ছিলো তখন সে পিস্তলটা বের করে নেয়। পাশ থেকে গুলি ছোঁড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়েই তিনি হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েন—ডেস্‌কের ওপরেই। সেই জন্যেই এই রক্তের ছিটে এই কাস্‌কেটে। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান।

তাই হবে। বললে অনিরুদ্ধঃ কিন্তু এ-সবই তো পুলিশের মুখে শুনেছি। নতুন করে আবার এ-কথা কেন? আর, এ-সবের সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি?

একেবারেই কি কোনো সম্পর্ক নেই, অনিরুদ্ধবাবু? আচ্ছা, আরেকটু তাহলে খোলসা করা যাক্। এই খুনের ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ দু'জনকে। এক হচ্ছে অতুল দত্ত, আপনার শ্বশুরমশায়ের ভাইপো। তার যাতায়াত ছিলো সে-বাড়িতে। তিনি তাকে স্নেহও করতেন । কিছু টাকাও নাকি দিয়ে যাবেন তাকে নিজের উইলে—এমন নাকি ইচ্ছে ছিলো তাঁর। অন্ততঃ, গুজব এইরকম। আর এধারে আর যাকে আমাদের সন্দেহ, সে হচ্ছেন আপনি।

আমি? অনিরুদ্ধ চম্‌কে ওঠে।

শ্বশুর মারা গেলে—যদি উইল করে অপর কাউকে কিছু না দিয়ে যেতে পারেন তাহলে তাঁর যথাসর্বস্বই মেয়ে জামাইয়ের। আপনারই হবে বলতে গেলে, কেননা.....

কিন্তু আরও খবর আছে এর পরেও। করঞ্জাক্ষ বলে যান অবাধেঃ গত

পরশু আড়াইটার সময় পাবলিক্ বুথ্ থেকে কে একজন টেলিফোন করেছিলো অতুলকে। তার গলাটা হুবহু আপনার মতোই নাকি। সে তাকে সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় তার কাকার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলো।

অতুল ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ছ'টায় সেখানে হাজির হয়। গিয়ে দেখে যে, তার কাকা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে ডেস্কের ওপরে। ততক্ষণে খতম্। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আপনার শ্বশুরমশাই অতুলের আসবার আগেই নিজের হত্যাকারীকে অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন—নিজেই। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টার ঢের আগেই।

আধপোড়া একটা চুরুট পড়ে থাকতে দেখা গেছে ঘরের কোণে। মনে হয়, আপনার শ্বশুরমশাই বিকেলের স্নান সারতে বাথরুমে গেলে সেই ফাঁকে লোকটা চুরুট ধরিয়েছিলো—তিনি আসতেই ব্যস্ত হয়ে সেটা সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

সেই দগ্ধাবশেষ চুরটটি হচ্ছে এই চুরুটেরই সগোত্র—আমরা আঙুলের ছাপ পেয়েছি।

মিথ্যে কথা। প্রতিবাদ করে অনিরুদ্ধ—এ পর্যন্ত তিন তিনটে ডাহা মিথ্যে আপনি চালিয়েছেন আমার কাছে। তার বেশিও হতে পারে। তবে তিনটে আমি ধরতে পেরেছি।

গুণে দেখা যাক তো! বলেন করঞ্জাক্ষবাবু—দেখি, আমি ঠিক ঠিক বলতে পারি কি না। মিলিয়ে নিন আপনি।

প্রথমঃ পাবলিক টেলিফোন থেকে পরশু কেউ ডাক দেয়নি অতুলকে! কেমন? এইতো আপনি বলছেন?

হ্যাঁ, এটা এক নম্বর মিথ্যে। অনিরুদ্ধ সায় দেয়।

দু'নম্বর মিথ্যেঃ ঘরের কোণে চুরুটের কোনো টুকরো পাওয়া যায়নি —, নিশ্চয়ই?

তিন নম্বরঃ পিস্তলে কোনো আঙুলের ছাপ ছিলো না!

একদম্ না।

ঠিকই বলছেন অনিরুদ্ধবাবু, আপনার কথাই ঠিক বটে। কিন্তু এগুলো যে মিথ্যে, সেকথা আপনি জানলেন কি করে?

তার জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নাকি? অনিরুদ্ধ শুধোয়।

না করুন, তার জবাব কিন্তু আমি পেয়ে গেছি—। কিন্তু সেজন্যে নয়,

কি করে এই কাণ্ড আপনি করলেন—অবশ্যি, অতুল সম্পত্তির লোভে মানুষ কি না করে! এখানে আপনার শ্বশুর অতুলকে যে সম্পত্তি দিয়ে যেতেন, তার লোভও আপনাকে পেয়ে বসেছিলো। কিন্তু সেজন্যেও নয়, পিস্তলে আঙুলের ছাপ না বসিয়ে কি করে গুলি বসাতে পারলেন, তাই ভেবে আমি অবাক্ হচ্ছি। তাক লাগছে আমার, এরকম কাজ পৃথিবীতে কেউ কখনো করতে পারেনি। তারিফ করতে হয় আপনার বাহাদুরির।

সাধুবাদে বিচলিত হয়ে অনিরুদ্ধ আর নিরুদ্ধ রাখতে পারলো না-তা হলে খুলেই বলি, আপনাকে বলতে আর কি! আপনি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি যখন কেউ নেই এখানে। এ-কথার তো কোনো সাক্ষী থাকবে না আর।

ঘায়ের অজুহাতে আমার ডান হাতের আঙুলে রুমাল জড়ানো ছিলো, সেই জন্যেই পিস্তলে কোনো দাগ লাগেনি। তাই আপনারা হাতেপেয়েও এই দাগী আসামীটিকে ধরলেও, আদালতে নিয়ে গিয়ে খাড়া করতে পারছেন না তাকে—সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবেই—

কিন্তু আপনার এই স্বীকারোক্তির দ্বারাই—, করঞ্জাক্ষ বলতে যান।

স্বীকারোক্তি? কিসের স্বীকারোক্তি? বলেছি যে তার প্রমাণ কি?

প্রমাণ? তার প্রমাণ এই মোড়কের মধ্যেই। যা যা আপনি বলেছেন আর আমি বলেছি তার সমস্তই—আমাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে রেকর্ড হয়ে গেছে, এর মধ্যেকার রেকর্ডিং যন্ত্রে। এই টেপ রেকর্ডারটিই আমাদের সাক্ষী। আর, এখানে আসবার আগেই আমি ফোন করে এসেছি লালবাজারে। এখুনি পুলিশের গাড়ি আপনাকে নিতে আসছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে পুলিশ-ভ্যানের হর্ন বেজে উঠলো।

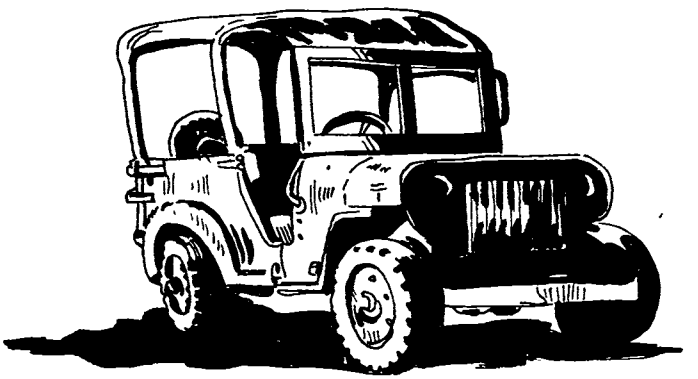

রহস্যের সন্ধানে

আশাপুর্ণা দেবী

বাবার নতুন কেনা এই পুরনো বাড়ীটায় এসে বাসুর ভারী স্ফুর্তি। এটা মোটেই তাদের রেলকোয়ার্টারের বাড়ীর মতো ঝাড়াঝাপটা হালকা-পাতলা নয়। বেশ কেমন ভারীভুরি, আর আলো-অন্ধকারে মেশানো। জায়গায় জায়গায় কেমন লুকোচুরি খেলার মত হঠাৎ একটা সরু প্যাসেজ, হঠাৎ তার গা দিয়ে ছোট্ট একটা কোনাচে ঘর, সিঁড়ির চাতাল দিয়ে বেরিয়ে পড়ে আচমকা একটা বারান্দা, আর সব থেকে মজা-ঘরে দালান এখানে—সেখানে এক একটা দেওয়াল আলমারি। ছোট বড় নানান মাপের।

পুরনো পুরনো সেই আলমারিগুলো খুললেই কেমন একটা চাপা চাপা ভ্যাপসা ভ্যাপসা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, বাসুর দারুণ ভালো লাগে। যেন এর মধ্যে কি একটা রহস্য লুকিয়ে ছিল, আগের মালিকরা সেটা নিয়ে চলে গেছে। ভিতরের দেওয়াল গুলো তাই বোবা মুখ করে ক্ষুন্ন হয়ে বসে আছে।

একটা আলমারির তাকের মধ্যে খানিকটা কালির ছিটে, কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। তার মানে এটায় ওরা সব কিছু রাখত। দালানের তাকগুলোয় যে বই রাখতো সেটা তার মেঝের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ভাঁড়ার ঘরের দেয়ালের কুলুঙ্গিতে নির্ঘাৎ কোনো ঠাকুরের মূর্তি থাকতো। তা নইলে কুলুঙ্গির মাথায় ধূপের ধোঁয়ার দাগ কেন?

বাসু এই সব ঘুরে ঘুরে দেখে আর বলে, বাসুর দিদি হাসে। আর কিনা মাকে ডেকে ডেকে বলে, 'মা, তোমার পুত্তুরটি ভবিষ্যতে ডিটেকটিভ্ হবে যা অবজারভেশান! আর যা অনুমানশক্তি।'

বাসু অবশ্য তাতে দমে না, চিরদিনই তো বাসুকে 'ডাউন' করাই দিদির জীবনের মুল লক্ষ্য। তাই দিদির কথায় কান না দিয়ে বাসু অভিযান চালিয়ে যায়। সেকেলে পুরনো বাড়ি, দু'দিকে দেয়াল দেওয়া সিঁড়ি, তাই সিঁড়ির তলাটা অন্ধকার ঘুটঘুটে। মা বলেন, 'আগের দিনে লোকে এই ঘরটাকে চোরা-কুঠরি বলত।'

বাসু বলল, 'আগের দিনে যদি বলতো .....তা'হলে এখন বললেই বা দোষ কি?'

মা হেসে ফেলে বললেন, 'চোরা-কুঠরি, চিলেকোঠা. কথাগুলো যেন বড্ড সেকেলে। আমার ঠাকুমা-দিদিমারা বলতেন।'

বাসু গম্ভীরভাবে বলল, 'তোমার ঠাকুমার ঠাকুমা তাঁর ঠাকুমা তাঁরও ঠাকুমা তো ভাতকে ভাত বলতেন, তুমিও তাই বল কেন?

কিছুই হাসির কথা বলেনি বাসু, তবু বাসুর কথা নিয়ে বাড়ি সুদ্ধ সকলের সে কী হাসির ধুম। 'ওরে বাবা ছেলের কি লজিকের জ্ঞান।..... ওঃ বাসু কালে উকিল হবে।' এই সব বাজে বাজে কথা থাক, কথাকে বাসু কেয়ার করে না। তার বাংলার মাস্টার মশাই বলেন, 'কারো সমালোচনায় লজ্জা পেয়ে কোনো কাজে পিছিয়ে যাওয়া ভীরুর লক্ষণ। লোকের কথায় ভয় পেলে মহৎকাজ হয় না।'

কাজেই বাসু ওই সব ঠাট্টা ফাট্টায় লজ্জা না পেয়ে এই বাড়িটার রহস্য আবিষ্কারের মহৎ ব্রত নিয়ে খেটে যাচ্ছে। বাসু 'ছোটদের গোয়েন্দা গোকুল সেন' বইটা পড়েছে। একটা ভীষণ পুরনো জমিদার বাড়ী ভাঙা হতে দেখা গেল, তার কড়িকাঠের খাঁজে খাঁজে চোরা কুলুঙ্গি, আর তার মধ্যে রাশি রাশি সোনা।

এই বাড়িটার কড়িকাঠগুলোও ভারী ভারী আর যেন ঝুলে পড়া ঝুলে পড়া। কে বলতে পারে ওর অন্তরালে তেমন চোরা কুলুঙ্গি আছে কি না। ঘাড় উঁচু করে হাঁ করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে বাসু, কোনোখানে সন্দেহজনক কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা।—কিন্তু দেখা গেলেই বা কি? বাসু নিজে তো আর মইয়ে উঠে পরীক্ষা করে দেখতে পারবে না। আর বড়দের বললে? তারা তো হাসির

তোড়েই বাসুকে উড়িয়ে দেবেন।....

কিন্তু এখন?

এখন কি হলো?

এখন সকলের মুখ হাঁ, চোখ ছানাবড়া, আর নাক রসপুলির মত হয়ে গেল কি না?

সিঁড়ির তলার ওই চোরা-কুঠুরির দেওয়ালে একটা চোরা আলমারি আবিষ্কার করে ফেলেনি বাসু?

এখানে যে আগের লোকেরা ডাঁই করে কয়লা ঢেলে রাখতো তার স্মৃতিচিহ্ন এখনো জ্বলজ্বলাট, এমন কি কয়লার চাঁইও কিছু কিছু ছিল। কিন্তু বাসুর মত অবজারভেশন শক্তি না থাকলে কি কেউ ধরতে পারত ওই কয়লা-মাখা ময়লা দেয়ালের গায়ে একটা ছোট্ট কাটা খাঁজ আছে। আর তার মধ্যে একটা ক্যাশবাক্স বসানো আছে। কয়লা ঢালা জায়গায় এমনিতে কারোর চোখই পড়ত না, বাসু কয়লার চাঁইগুলো সরিয়ে দেখেছিল বলেই না—হঠাৎ বাক্স দেখেই বাসুর হাত-পা ঠাণ্ডা।

অথচ উল্লাসও আছে।

তাই কাঁপা কাঁপা গলায় চেঁচিয়ে সেই দিদিকেই ডেকে ওঠে- যে দিদির জীবনের লক্ষ্য বাসুকে ডাউন করা।.....কিন্তু উপায় কি? দিদি ছাড়া বাসুর সুখ দুঃখের ভাগীদের হতে আসছে কে?

বাসুর 'দিদি' ডাক শুনেই দিদি দুদ্দাড়িয়ে নেমে আসতে-আসতে বললো 'হলোটো কি? বিছে কামড়েছে নিশ্চয়। কামড়াবেই তো। খেলবার আর জায়গা পায়নি।

কিন্তু দিদি এসে থমকে দাঁড়ালো। বাসু দিব্যি জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে, তবে বাসুর চোখ দুটো গোল আলুর মত। আর মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো।

দিদি আসতেই বাসু নীরবে শুধু আঙুল বাড়িয়ে দেখালো।

"কি ও?'

'দেখ্ না।'

বাক্স!

'হুঁ!'

'কিসের বাক্স?'

'ভগবান জানেন।'

'এই জায়গায় বাক্স কেন?'

দিদি ভয় ভয় গলায় বলে, 'টাকাকড়ি লুকানো নেই তো? যারা ছিল, যাবার সময় হয়তো ভুলে গেছে।

বাসু গম্ভীর ভাবে বলে, 'টাকাকড়ি কেউ ভুলে যায়? হয়তো বাড়িতে আগুন লেগেছিল, তাই তাড়াতাড়ি—'

'দুর, আগুন লাগলে তো পরে আবার ফিরে আসবে। তাছাড়া কই, কোথায় আগুন লেগেছিল, বাড়িতে তো দাগ নেই।'

'দিদি, তাহলে বোধ হয় ভূমিকম্প!'

'মোটেই না, 'তাতেও পরে চলে আসবে লোকে।'

'তবে বোধ হয় ডাকাত পড়েছিল দিদি। ওরা ভয়ে পালিয়ে গেছে। আর কখনো আসেনি।'

দিদি বলে, 'তা হতে পারে। কিন্তু ডাকাতরা কি তন্ন তন্ন করে না দেখে ছাড়তো? ওরা তো শুনেছি বালিশ ছিঁড়ে তুলো বার করে দেখে—'

'দিদি ঠিক হয়েছে। যে রেখেছিল, সে বোধ হয় হঠাৎ মরে গেছে কাউকে বলে যেতে পারেনি।'

দিদি মহোল্লাসে বলে, 'ঠিক, ঠিক বলেছিলে তার বুদ্ধি হ্যাজ।'

এই প্রথম দিদি বাসুর বুদ্ধির তারিফ করলো।

কিন্তু বাক্সটা টানা যায় কি করে?

খাঁজের মধ্যে যা আঁটা। বাসুর অসাধ্য।

'দিদি, তুই পারবি'? 'উহুঁ আমার বাবা ভয় করছে যদি পিছনে সাপ টাপ থাকে'। 'তবে? তবে কি বৃন্দাবনকে ডেকে আনবো? ওর গায়ে তো খুব জোর।'

দিদি আস্তে বলে—'এই, চুপ। চেচাঁস না। যদি অনেক সোনা টোনা থাকে, বৃন্দাবন সবাইকে বলে বেড়াবে—তাহলে মাকে ডাকি?' বললো বাসু।

দিদি হেসে ওঠে, 'আহা রে মার গায়ে কী জোর।'

'তাহলে ছোটকা ছাড়া কোন গতি নেই।'

ছোটকা। ছোটকা মানেই তো সব চাঁটি খাওয়া, তবু উপায় কি?

বাক্সটাকে তো টেনে বার করতে হবে।

ছুটির দুপুরে বাবা নিদ্রামগ্ন, কাকা বইমগ্ন, বাসু গিয়ে বলে,—'ছোটকা, আবিষ্কার'।

'আবিষ্কার তো'

ছোটকা হেসে উঠে বলে, 'কি? সব বাজে কথা।'

'আঃ কেবল বাজে কথা, দেখাব চলো চোরা কুঠুরিতে বাক্স আছে।'

'বাক্স? কার বাক্স?'

'বাড়িটা যাদের ছিল তাদের নিশ্চই'।

'কিসের বাক্স।'

'আঃ! তুমি চলোই না' কাকার হাত ধরে টান মারে বাসু।

অগত্যাই যেতে হয় কাকাকে।

গিয়েই কাকার মুখ গম্ভীর। 'খবরদার কেউ হাত দিও না। বাবাকে ডাকো।' দিদি ভয় পেয়ে ছুটে যায় বাবাকে ডাকতে। কিরে বাবা, ভৌতিক বাক্স? না কি সাপ খোপ আছে?

বাবা আসেন, মা আসেন এবং তারা বিজবিজ করে যা বলাবলি করতে থাকেন। তার থেকে এইটুকু বুঝতে পারে বাসু এই বাক্সয় কারো হাত দেওয়া হবে না, পুলিশকে খবর দিতে হবে। তারা নিয়ে গিয়ে থানায় জমা দেবে।

শুনে বাসু প্রায় ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেলে। এত কষ্ট হয় বাসুর, পুলিশ এসে নিয়ে যাবে, থানায় জমা দেবে? বাসুরা নিজে মজা করে খুলে দেখতে পাবে না? 'কেন?' আমরা কি চোর?

কাকা বলল, 'এখন চোর নই, কিন্তু ওই পরের বাক্সর মালটি নিতে গেলেই চোর হয়ে যাবো, আইন হচ্ছে এ রকম—গুপ্তধন-টন পেলে তা পুলিশের হাতে তুলে দিতে হয়।'

আর কী করা।

বাবা থানায় ফোন করেন। পুলিশ আসে জনা তিনেক। তারা অন্ধকারে হেঁট হয়ে টর্চ জ্বেলে ব্যাপারটা দেখে নেয়, তারপর জেরা করতে থাকে। 'কবে কেনা হয়েছে এ বাড়ী? কার কাছ থেকে? তারা কোথায় থাকে' ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবে বাসু পুরানো বাড়ীওয়ালা মাদ্রাজে চলে গেছে শুনে নাক কুঁচকে হ্যাঁচ করে এক টান মেরে বাক্সটাকে বার করে আলোয় নিয়ে এল। টানের চোটে দেয়ালের বাসি চাপড়া খসে পড়ল খানিকটা।

দিদি ফিসফিস করে বলল, 'এই বাসু, বাবাকে বলনা—ওরা নিয়ে যাবার আগে একবার অন্ততঃ আমাদের দেখিয়ে যাক।'

বাসু বেজার মুখ করে বলল, 'দেখিয়ে আর কি হবে! যা আছে তা তো

নিয়েই চলে যাবে। আশ্চর্য! ছোটকার এই নিষ্ঠুরতার কোনো মানে হয়?'

তা' বাসুকে আর বলতে হল না, দেখা যায় ওরা খোলবারই চেষ্টা করছে।....এমনি খুলতে না পেরে বলে, 'চাবি আছে?'

'চাবি? আমরা চাবি কোথায় পাবো?'

ছোটকা বেশ রাগের গলায় বলে, 'বাক্সের হিষ্ট্রি জানায়নি আপনাদের? হুঁ, তা একটা ইয়ে টিয়ে কিছু দিন, চাড় দিয়ে খুলে ফেলার মতো—'

শুনে সকলেই উত্তেজিত। এতক্ষণে যেন একটা ঘোরালো রহস্যের সুচনা দেখা দিয়েছে। সকলেই চঞ্চল হয়ে 'ইয়ে-টিয়ে' খুঁজতে ছোটে।

...মা নিয়ে আসেন একখানা লম্বা খুন্তি, ছোটদা একখানা ক্ষুদে বাটালি, দিদি একটা পেন্সিল কাটা ছুরি আর বাসু একখানা পুরানো ব্লেড।

পুলিশ ইনস্পেটর ওগুলোর দিকে একটু অবহেলার দৃষ্টিতে তাকিয়ে এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করে নিজেই সংগ্রহ করে নেন একখানা কয়লা ভাঙা হাতুড়ি। ঠাঁই করে বসিয়ে দেন ডালার ওপরে। চমকে ওঠে সবাই।

মা বলেন, 'ঠিক জানিনা বাবা, ভেতরে ঠাকুর টাকুর নেই তো।' বাবা বললেন, 'মাথা খারাপ ওইখানে লোকে ঠাকুর রাখতে আসে? চোরাই মাল বলেই মনে হচ্ছে। বোধ হয় বাড়ির কোনো চাকর-টাকর নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল, তারপর আর সরাতে সুবিধে পায় নি।' দিদি বলে, 'আমার মনে হচ্ছে কোনো গুপ্তধনের ব্যাপারে ম্যাপট্যাপ আছে। সেই যে গল্পটা মা একদিন বলেছিল, মনে আছে? একটা ছোট্ট ছড়ার মধ্যে গুপ্তধনের ঠিকানা। এ-মা মনে নেই? সেই যে—

পায়ে ধরে সাধা
রা পাহি দেয় রাধা
শেষে দিল রা
পাগোল ছাড়ো পা।

তার মানে ওর মধ্যে রয়েছে। 'ধারাগোল! এও হয়তো তেমনি কোনো—'

আর বলতে হলো না, আবার হাতুড়ির প্রচণ্ড ঘা পড়লো ঠাঁই ঠাঁই.....সঙ্গে সঙ্গে বাক্সের ডালা ছিটকে উঠে পড়লো।

আর তারপর?

তারপর পুলিশ সাহেব নিজেই লাফিয়ে ছিটকে উঠলেন।.....

অতঃ পরে আর সবাই লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছিটকে একেবারে কে কার ঘাড়ে পড়ে?

সকলের মুখে একই কথা 'এই এই এইরে বাবা! আরে আরে কি সর্ব্বনাশ' লম্ফঝম্পর ব্যাপার শুরু হয়ে যায়।

বাক্স খোলামাত্র ডজন ডজন নেংটি ইঁদুর বেরিয়ে পড়ে ঝুটোপুটি লাগিয়ে দিয়েছে, এর পায়ের ওপর দিয়ে ওর পায়ের ওপর দিয়ে।

কে জানে কতকাল ধরে পুত্রপৌত্রাদি সমেত রাজ্য বিস্তার করে ভোগ দখল করে আসছে। কিন্তু খাচ্ছিল কি? না খেয়ে তো বাঁচতে পারে না। আর বংশের এতো বাড়বাড়ন্ত হতে পারে না। তাছাড়া হাওয়া বাতাসেরও দরকার।.....তা দেখা গেল সে ব্যবস্থা ওরা নিজেরাই করে নিয়েছে। ইঁদুর হলেও ওরা মানুষের থেকে কম বুদ্ধিমান নয়। ওদের মধ্যেও ছুতোর আছে, মিস্ত্রী আছে, ইঞ্জিনীয়ার আছে, বাক্সের দেওয়ালে দিব্যি দোর, জানালা বানিয়ে নিয়েছে।

আর খাওয়া? দেখা গেল বাক্সের মালিক এদের সাতপুরুষের 'বসে খাওয়ার' ব্যবস্থা করে গেছেন।.....এতোকাল ধরে খেয়ে দেয়েও এখনো যা রয়েছে তা কম নয়,.....কে জানে ওই কুচি কাগজের রাশি কোনো উইলের অথবা দলিলের না কি কোনো গুপ্তধন আবিষ্কারের নকশা,.....পুলিশ যদি নিয়ে গিয়ে ফোরেনসিক ল্যাবরেটরিতে দিয়ে দিতো, তা হলে, রহস্য উদ্‌ঘাটন হতো.....কিন্তু পুলিশ প্রভুরা সে দিক দিয়ে গেলেন না। বেজায় বিরক্ত মুখে সকলের দিকে একটু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে গট্‌গট্ করে বেরিয়ে গেলেন।

নেপুর নবীকরণ

লীলা মজুমদার

বুড়ো ঠাকুমা বড়ই খিটখিটে। ক্রমে বাড়ি সুদ্ধ সকলে অতিষ্ঠ হয়ে, তাঁকে কোথাও রপ্তানি করার কথা ভাবতে শুরু করেছিল। কোথায় পাঠানো হবে? কেন, কোন-নগরে গঙ্গার ওপর অমন সুন্দর চোদ্দ পুরুষের বসতবাটি থাকতে, আবার ভাবনা কিসের? এই প্রস্তাবটা শুনে পুরুষরা যতটা উৎফুল্ল হয়ে উঠল, মহিলারা কিন্তু ততটা নয়। বুড়োঠাকুমার ছেলে বড়দাদুর কিন্তু মাকে চালান করতে সব চাইতে বেশি উৎসাহ। তাঁর হুঁকো লুকিয়ে রাখে বুড়ি! কি? না তামাক ধরলে লেখাপড়া হয় না। আরে, একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন! তিনি যত লেখাপড়া শিখে গেছেন, আজকালকার উপাচার্যরাও তার অর্ধেক শিখে উঠতে পারেনি! তাছাড়া সিগারেট খারাপ হতে পারে, কিন্তু তামাকের ধোঁয়া জলের মধ্যে দিয়ে আসে, তাতে কোন দোষ হয় না।

এ কথা শুনে বাগ মানা দূরের কথা, বুড়ো ঠাকুমা আগুন হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, জলের মধ্যে দিয়ে ধোঁয়া যায় বললেই হল। রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এই আশী বছর বয়স হল, এখন উনি আমাকে শেখাতে এলেন! এই আমিও বলে রাখলাম, এখানে আর আমার পোষাবে না। আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোননগরে পাঠিয়ে দে আর আমার সমস্ত বাসনপত্র দিতে ভুলিস্‌নে যেন।' ব্যস্ হয়ে গেল। বেশ বুদ্ধি করে ম্যানেজ করা গেল। কিন্তু মুশ্‌কিল

হল, যাঁর সবচেয়ে খুশি হওয়া উচিত ছিল, অর্থাৎ ঠাকুমা, তিনিই সবচেয়ে গাঁইগুঁই করতে লাগলেন। দাদুকে বললেন, 'হ্যাঁগো, তোমরা কি পাষাণ? বল দিকিনি, তিন বছর আগে সেখানে চড়িভাতি করতে গিয়ে দেখে আসনি যে দক্ষিণ দিকের ঘরের চাল ফুঁড়ে বিশাল এক বটগাছ গজিয়েছে? সেই শ্মশানপুরীতে কি বলে নিজের বুড়িমাকে পাঠাতে চাইছ? তাহলে আমিও সঙ্গে যাব।' ফিক্ করে হেসে দাদু বললেন, 'তুমি গেলে আমিও যাব। আমি গেলে আমার হুঁকোও যাবে।'

'তাছাড়া গত বছর বাড়ির দক্ষিণের তিনটে ঘর ধ্বসে গিয়ে, জলের কিনারায় খাসা এক বাঁধের মতো তৈরি হয়েছে। ঠেকো পেয়ে বটগাছটার খান ত্রিশেক ঝুরি নলনলিয়ে নেবে এসেছে। উত্তরের ঘরগুলোই এখন দক্ষিণের ঘর হয়ে রোদে ভরে থাকে। ঝিরঝির করে তার ভেতর দিয়ে দিনে বাতাস বয়। তোমাদের ছড়িয়ে ফেলে আসা গন্ধরাজ নেবুর বিচিগুলো থেকে দিব্যি সুন্দর তিনটে গাছ গজিয়েছে। নেবুফুলের গন্ধে চারদিক মো-মো করছে। ওখানকার গোপাল কনট্র্যাক্টর সব সারিয়ে সুরিয়ে দিয়েছেন। তক্‌তক্ করছে সমস্তটা, গিয়ে উঠলেই হল। খালি ঐ বটতলাটা—' এই বলে দাদু চুপ করলেন। তাঁর ছেলে বড়জ্যাঠা বললেন, 'আহা, বটতলা তো আর উঠে ঘরে আসছে না।'

বুড়োঠাকুর কখন এসে কতখানি শুনেছেন বোঝা গেল না। এবার তিনি বললেন, 'তাহলে আমরা দেরি কচ্ছি কেন? রবিবার ভালো দিন, পাঁজি দেখলাম। তোদের সব ছুটি, দু-একজন আমাদের সেখানে পৌঁছে দিয়ে চলে এলেই হল। এখানে আর এক দণ্ড টিকতে পারছিনে। বাড়িতে তোরা অষ্টপ্রহর অশান্তি করিস আর বাইরে তো যদ্দুর বুঝছি অমন দেবতুল্য মানুষ বটকেষ্ট পালের পাষণ্ড বর্বর ছেলে দুটো মানুষের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তোদের জন্যেই যা দুঃখ হয়।'

সবাই অবাক হয়ে এ-ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকে। দাদু বলেন, 'কাদের কথা বলছ, মা?'

'আহা, ন্যাকা সাজিস্ না। ঐ যে চব্বিশ ঘন্টা দুটোর নাম যে জপিস্, ঐ যে পিঞ্চি পাল আর মুন্সি পাল। আমার মতে দুটোই সমান রাস্‌কেল।' এর ওপর কোনো কথা নেই। ঠামু বললেন, 'রোববার তো আর কোনো বাধা নেই, খালি সঙ্গে কে থাকবে মা? কে দেখাশুনো করবে?' অমনি

অপ্রত্যাশিত ভাবে বড়জ্যাঠার ছোট ছেলে নেপু, যার জন্ম থেকে পা দুটো দুর্বল আর চামড়ার ওপর শাদা শাদা দাগ বলে লজ্জায় সে স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে মাস্টারের কাছে পড়ে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে, সংস্কৃতে বি-এ পড়ছে, সেই নেপু বলল, 'বুড়োঠাম্মুর সঙ্গে তো সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি আর নগেনজ্যাঠা যাব।' নগেনজ্যাঠা ওর মাস্টার মশাই। তাছাড়া আন্নামাসিও যাবে। সে রাঁধবে। আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এখানেও ঐ আন্নাবামনিই বুড়োঠাকুমার দেখাশুনো রাঁধাবাড়া করে। সেখানে সপরিবারে রঘু দারোয়ান আবহমান কাল থেকে আছে। বুড়িঠাকুমার স্বামী তাঁর কোনো অভাব রেখে যাননি। নিজের খরচায় স্বাধীনভাবে থাকবেন ভেবে তাঁর আহ্লাদ দেখে কে! দাদু আর বড়জ্যাঠা তাঁদের সকাল সকাল পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন। সত্যি কথা বলতে কি বুড়োঠাকুমাই তাঁদের ভাগালেন।

সকালবেলা। রঘুর বৌ রান্নাঘর ধুয়ে মুছে, তোলা উনুনে আঁচ দিয়ে রেখেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আন্নামাসি নিজের মাথায় ক-ফোঁটা গঙ্গাজল ছিটিয়ে, কাজে লেগে গেল। কলকাতা থেকেই হাটবাজার হয়ে, ঝুড়িবন্দী হয়ে এসেছিল। সব দরজা জানলা খোলা, শীতের রোদে বাড়ি ভরে আছে। বুড়োঠাকুমা একটা বেতের গোল চেয়ারে, রান্নাঘরের বড় চাতালে বসে পা মেলে দিয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন। নেপুর সঙ্গে মাস্টারমশাই চারদিক ঘুরেঘারে দেখছেন। চাতালটা নতুন। আগে এখানে অনেকগুলো ছোট বড় ঘর ছিল। সেগুলো গঙ্গায় ধ্বসে পড়ে তার উপর ঘাস আর যুঁই চামেলীর ঝোপ হয়েছে আর বটগাছটার বাহার বেড়েছে। ওখান দিয়ে জমিটা ঠিক যেন গড়িয়ে জলের কিনারা অবধি নেমেছে। তার উপর ঝুরি নেমে খাসা এক লুকোচুরি খেলার জায়গাও হয়েছে। কতকালের পুরনো শহর কোননগর; তার গঙ্গার ধারের বাড়িগুলো এ ওর গায়ে ঢলে পড়েছে। মাঝে মাঝে ঘাটে যাবার সরু গলি। এ বাড়িটারি অনেকখানি ভেঙ্গে পড়াতে চারদিক খোলামেলা।

দুপুরে গাওয়া-ঘি দিয়ে ভাতে ভাত আর আমসত্ত্বর অম্বল আর নবদ্বীপের বিখ্যাত দোকানের দরবেশ খেয়ে, দোতলার ঘরে বিশ্রাম। বুড়োঠাকুমা যখন যা বলছেন, সবাই ছুটে তাই করছে। মাস্টারমশাই একতলার দক্ষিণের ঘরটা নিয়েছেন। তার পাশেই নেপুর পড়ার ঘর। নেপু শোবে দোতলায়, বুড়োঠাকুমার পাশের ঘরে। আন্নামাসি বুড়োঠাকুমার ঘরে নেয়ারের খাটে ঘুমোবে। সব জানলায় দাদু মিহি জাল লাগিয়ে দিয়েছেন, মশা মাছি ঢোকার উপায় নেই।

বুড়োঠাকুমা হাল্কা এক চিলতে মানুষ, খুরখুর করে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করেন। দাদু একবার একতলার ঘরে শোবার কথা বলতেই বলেছিলেন, 'আমি কেন? 'তুই বুড়ো হয়েছিস, তুই একতলায় শুতে পারিস।' দোতলায় নতুন একটা ছাদওয়ালা চওড়া ঝোলা বারান্দা করা হয়েছিল। দুপুরে সেখানে একটা গল্পের বই নিয়ে বসে নেপু দেখল বটতলার ঝোপেঝাড়ে এমন করে আলো ছায়া পড়ছে যে মনে হচ্ছে এক পাল ছেলেমেয়ে বুঝি খেলা করছে।

রাতে লুচি, ছক্কা, রসমুণ্ডির পায়েস খেয়ে সকাল সকাল সবাই শুতে গেল। বুড়োঠাকুমা একবার নেপুকে বললেন, 'একা শুতে ভয় করবে না তো? নয়তো আমাকে ডাকিস্।' হাসি চেপে নেপু তাঁকে আদর করে বলেছিল, 'নিশ্চয় ডাকব। তুমি ডাকাতদের তাড়িয়ে দিও, মামণি।' ওরা সবাই তাঁকে মামণি বলেই ডাকত। আশ্চর্যের কথা, এখানে এসে অবধি তাঁর খিটখিটে মেজাজ কোথায় উবে গেল। সকালে নিজের জপটপ সেরে, এক গেলাস গরম চা খেয়ে, রান্না-ঘরে গিয়ে রোজ দুটো একটা রান্না করা ধরলেন। আন্নামাসিকে বলতেন ঘাটে গিয়ে জেলেদের কাছ থেকে ভালো মাছ কিনে ভালো করে রেঁধে দিতে। তাঁর বিশ্বাস নেপুর পা দুটো কমজুরি হওয়ার আর তাতে শাদা দাগ থাকার একমাত্র কারণ তাকে কখনো ভালো করে কেউ মাছ খাওয়ায়নি। এ ব্যবস্থায় নেপুরো কোনো আপত্তি ছিল না। তবু কেবলি মনে হত বটতলায় কারা আনন্দ করে। কতবার গিয়ে দেখেছে কেউ নেই।

কয়েক দিন মহানন্দে কেটেছিল, তারপর একদিন হঠাৎ নেপুর নাস্তিক মাস্টারমশাই বলে বসলেন এখানে তাঁর শরীর ভালো থাকছে না, উনি যাদবপুরে একটা চাকরি নিয়ে চলে যাবেন। তবে নেপুর কোনো ক্ষতি হবে না, এখানকার কলেজের সংস্কৃতের পণ্ডিত নবীন ভট্টাচায্যি তাঁর ছোটবেলার বন্ধু, তিনি দুবেলা এসে দুঘন্টা করে পড়িয়ে যাবেন। ভালো ইংরেজিও জানেন। নবীন পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে, মাস্টার মশাই সে দিনই চলে গেলেন। তাঁকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে এসে নবীন পণ্ডিত বললেন, 'আসলে ভয় পেয়েছে; ঐ মুখেই নাস্তিক! আরে ঐ বটতলাটা তো এ অঞ্চলে বিখ্যাত। ওরা কারো কোনো অনিষ্ট করে না। নিজেদের বটতলায় খেলা করে তো তোর কি?' এই বলে বই খুললেন। নেপু দেখল চমৎকার পড়ান। মামণিকে কিছু না বললেই হবে। বড় সুখে আছেন এখানে। বলেন 'দেখ্ কেমন কাজেকর্মে মনের সুখে আছি। ওখানে ওরা আমাকে খরচের খাতায় লিখে রেখে দিয়েছে।

কারো কোনো কাজেও আসি না, অকাজেও আসি না। সত্যি খিট্ খিট্ করতাম নাকি?' নেপু বলল, 'খুব।' মামণি হাসতে হাসতে দুধপুলি করতে চললেন।

তার পর দিন আন্নামাসি বলল পাশের বাড়ির প্রীতিদিদিরা কালীঘাট দেখতে যাচ্ছেন, ওরই পাশের গলিতে ওর বড় ননদ থাকেন, তাঁর এখন যায় তখন যায় অবস্থা দেখে এসেছিল। সকাল থেকে মন বলছে তিনি বোধহয় নেই। মোট কথা প্রীতিদিদির সঙ্গে সে কালীঘাট যাবে।

মামণি তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তা যাবি তো যা না। আমি কি তোকে বেঁধে রেখেছি? নেপু ওর টাকাকড়ি কি পাওনা আছে, দিয়ে দে।' ব্যাস, টিনের স্যুটকেস গুছিয়ে আন্নামাসিও রওনা দিল। রঘু এসে বলল, 'বড়মা, আমি আপনাদের জিনিসপত্র নিচের ঘরে নিয়ে আসছি। তার ওধারেই তো আমাদের ঘর। আমার বিধবা বোনটা আপনার সব কাজ করে দেবে, রান্নার জোগাড় দেবে। আপনিও চলে যাবেন না। আপনারা আসাতে আমরা বড় সুখে আছি। রুকি রাতে আপনার ঘরে শোবে।'

বুড়োঠাকুমা হেসে বললেন, 'নিজেদের বাড়ি ছেড়ে আমি কোথাও যাচ্ছি নে।' নেপু বলল, 'আমিও না।'

বুড়োঠাকুমা বললেন, 'আমি না হয় আগে তোর মাছটা রেঁধে, তাপ্পর চান সেরে, বাকিটা রাঁধব।' নেপু বলল, 'মোটেই না। বটতলার নিচে দিয়ে পথ আছে দেখেছি, একেবারে মাঝিদের ঘাট অবধি। নিজের পছন্দ মতো মাছ কিনে আনব। তুমি বলে দেবে, আমি রাঁধব। আমারো শেখা হবে। ভালোই হবে।' রঘু শুনে খুশি হয়ে বলল, 'অত কষ্ট করতে হবে না, দাদা, ভোলামাঝিকে বলে দেব। সে রোজ মাছ এনে কেটেকুটে দিয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু আমাকেও মাছ খেতে বলেছেন, তা বৌ তো ছোঁবে না। তুমি রাঁধলে, আমাকেও একটু দিও, কেমন?' নেপু বলল, 'সে আর বলতে!' পরে মামণি বললেন, 'তুই যে বড় ভয় পাস্‌নি?'

নেপু বলল, 'আমি বটতলায় গিয়ে কাউকে দেখি নি, মামণি। খালি আলো-ছায়া খেলা করে, তাই মনে হয় কারা ঘুরছে ফিরছে। আর থাকেই যদি, থাক না।'

সেই ব্যবস্থাই হল। কলকাতায় কেউ কিছু জানল না। হপ্তায় দুটো পোস্টকার্ডে কুশল সংবাদ দেয় নেপু। এখানকার এই সব ব্যাপার চেপে যায়। এত ভালো মাস্টারমশাই সে কখনো পায় নি। তিনি বলেন এখান থেকেই

এম্-এ পড়া যায়, আরো চায় তো আরো পড়া যায়। লাইব্রেরির মেম্বার হয়েছে নেপু আর মাছ রান্নায় ওস্তাদ কারিগর। মামণির পেটে যে এত বিদ্যে ছিল কে জানত! মামণির এক মাত্র দুশ্চিন্তা কলকাতা থেকে কেউ এসে আবার না অশান্তি করে। বললেন, 'বড় খিট্‌খিটে ওরা, বুঝলি। দেখতিস্ না ভবানীপুরের বাড়িতে সবাই মিলে কি অশান্তিটাই না করত?' অনেক কষ্টে হাসি চেপে নেপু বলল, 'যা বলেছ।' মামণি তবু বললেন, 'তোর শরীরও এখানে ঢের ভালো থাকছে। পায়ে একটু জোর পাচ্ছিস্ না?' নেপু বলল, 'পাচ্ছি।'

মামণি বললেন, 'পৌষ এসে গেল। আজ থেকে রোজ একটা করে পিঠে অভ্যাস করব, কি বলিস্? তার আগে সন্ধ্যে করে নেব। তা হলে গরম গরম খাওয়া যাবে, কি বলিস্?' নেপু বলল, 'পিঠে ইজ্ পিঠে, তা গরমই হোক কি ঠাণ্ডাই হোক।' এ নিয়মটা সত্যি খুব ভালো। মামণি সন্ধ্যে করতে বসেন, নেপুও পড়তে বসে। চাতালের ওপর দিয়ে গরম পিঠের গন্ধ ভেসে আসে, নেপুর মন আনচান করে। বারেবারে উঠে দেখে আসে, মামণি মোড়ায় বসে একা একা পুলি ভাজছেন। তবু মনে হয় আশেপাশে আরো লোক দাঁড়িয়ে পিঠেভাজা দেখছে। মামণিও একেকবার মুখ তুলে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছেন। মুখখানি একটু হাসি-হাসি দেখায়। দেখতে লাগে যেন ঠাকুর-দেবতার মতো। দু তিন দিন দেখল এই রকম নেপু। তারপর জিগ্যেস করল, 'কি দেখ রোজ রোজ, মামণি?' 'জানলা দিয়ে কারা আমাকে দেখে, কিন্তু আমি তাদের দেখতে পাই না।' বলে দরজার বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

নেপুও দরজার কাছ থেকে মজা করে ডেকে বলল, 'এ্যাই! লুকিয়ে লুকিয়ে আমার মামণির পিঠে ভাজা দেখ কেন তোমরা? লজ্জা করে না? সামনে বেরিয়ে এসো না যদি সাহস থাকে।' বলবামাত্র একটা শিরশির সরসর শব্দ হল আর পাঁচটা কালো মেয়ের সঙ্গে এক কালো বুড়ো অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে বুড়ো-ঠাকুমার পায়ের কাছে মাটির ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, 'ক্ষমা দেন, মা। পিঠে ভাজার গন্ধে মেয়েগুলোর মন আনচান করে, তাই বলনু— যা তো শিখে আয়। তাই জানলা দিয়ে পিঠে ভাজা শেখে ওরা।'

মামণি বললেন, 'ওরে ওঠ ওঠ, ভালোই তো করেছে। পিঠের মতো কিবা আছে! ভালো করে শেখা হয়েছে তো মা তোদের?' ওরা উঠে পড়ে মাথা নিচু করে বলে 'হুঁ' 'তাহলে হাত পাত।' ওরা পাঁচজন পাঁচটা কালো হাত পাতল, মামণি প্রত্যেকের হাতে একটা পাটিসাপটা ফেলে দিলেন।

বুড়ো বলল, 'আমি তোমাকে কি দেব মা? তোমার কিসের দরকার আছে বল।' বুড়োঠাকুমা প্রথমটা খুব হাসলেন, তারপর গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার তো কিছুর দরকার নেই, বাছা, খালি কেউ যদি আমার এই পুতিটার পা দুটোকে সারিয়ে দিত, তাহলে আমি বড় খুশি হতাম।'

নেপু ততক্ষণে চাতালের বাঁধানো কিনারায় বসে পড়েছিল। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারত না সে। বুড়ো হঠাৎ ওর দিকে ফিরে বলল, 'দেখি ঠ্যাং দুটা।' বলে দু-হাতে দুটো ঠ্যাং ধরে এমনি হ্যাঁচ্‌কা টান দিল যে খট করে একটা শব্দ হল আর নেপুর মনে হল ঠ্যাং বুঝি ছিঁড়ে এল! তারপরেই চমকে উঠে দেখে কেউ কোথাও নেই, খালি মামণি ওর পায়ের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন আর ওর ঠ্যাং তুলে নাচতে ইচ্ছা করছে। শাদা দাগফাগও কোথায় মিলিয়ে গেছে।

নেপুরা এখনো ওখানেই আছে; মামণির পঁচাশী বছর বয়েস হয়েছে, রাঙা টকটক করছে স্বাস্থ্য, খুরখুর করে বাড়িময় ঘুরে বেড়ান। নেপু ডক্টরেট পেয়েছে, কলেজে প্রফেসরি করে আর আখড়ায় কুস্তী অভ্যাস করে। মামণি বটতলায় ভুঁই চাঁপার গাছ লাগিয়েছেন, সারা বছর তার সুগন্ধে চারদিক মো-মো করে আর শীতকালে যখন ফুল পাতা শুকিয়ে যায়, মামণি পিঠেভাজার গন্ধ পান।

আলোক ভাষা

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি জীবনে প্রথম সমুদ্র দেখেছিলাম ওয়ালটেয়ারে। যে-বাড়িতে উঠেছিলাম, সেটিকে বাড়ি না বলে অট্টালিকা বলাই বোধহয় ভালো। ওয়ালটেয়ার রেলস্টেশনে নেমে ঘোড়ায় টানা যে গাড়িতে উঠেছিলাম, সে গাড়ির গাড়োয়ান আমার কাছ থেকে 'কোথায় যাবো' সেই ঠিকানা শুনে এ-রাস্তা সে-রাস্তা করে এই অট্টালিকারই পিছনের উঠোনে এনে নামিয়ে বললো, এই সেই বাড়ি।

আমি নতুন এসেছি, কাগজে লেখা ঠিকানাটা আবার দেখে নিয়ে বললাম। এই যে রাস্তায় এসে পড়লাম, এটাই কি বিচ্ রোড?

সে তার ভাষায় যা বললে তার বাংলা হলো, না বাবু, এটা বিচ্ রোড নয়, সেটা গেছে বাড়ির সামনে দিয়ে। সেদিকে যেতে গেলে একটু ঘুর হতো বলে এই রাস্তায় এলাম, এটাই সংক্ষিপ্ত পথ।

আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ওয়ালটেয়ার নামটা শুধু জানা ছিল, এ সম্বন্ধে আর কিছু ধারনায় ছিল না। তাই ওর ভাড়া মিটিয়ে আমার সুটকেস-বেডিং হাতে নিয়ে একটু এগিয়েই আমার চেনা লোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার এখানে এসে এঁরই সঙ্গে দেখা করার কথা। ইনিই আমার কোম্পানীর মালিকদের একজন। আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন, এসেছো? এসো। এই গলি দিয়ে সামনে চলে যাও। সামনের দিকেই আমাদের

ঘর। বাক্স-বেডিং-নামাও. ওসব রামলু নেবে খন।

পরে জেনেছিলাম রামলু হচ্ছে চাকরের নাম। ওঁর হাঁক ডাকে সে এসে গেল। ছোকরা চাকর, বয়স ষোলো-সতেরোর বেশি নয়। সে আমাকে পথ দেখিয়ে সামনের দিকে নিয়ে চললো। মালিকদের যিনি একজন, তিনি বললেন, তুমি যাও, আমি মিনিট দশেক পরে আসছি একটা দরকারী কাজ সেরে।

উনি চলে গেলেন।

আমি যে পথটি ধরলাম। সেটি 'পথ' নয়, সাড়ে তিন ফিট চওড়া ভিতরের বারান্দা, তার ডানদিকে সারি সারি ঘরের দরজা, যেখানে অন্য ভাড়াটেরা থাকে। রামলুর পিছন পিছন পা ফেলতে গিয়ে বুঝলাম, সামনে একটু এগোলেই আমাদের ঘরে পৌঁছে যাবো। ডানদিকে পড়লো অন্য দুটি ঘরের দুটি দরজা, তাদের সামনে পর্দা টাঙানো আর বাঁদিকে নিরেট দেওয়াল, ওটা নিশ্চয়ই কোনো ঘর তার দরজা সামনের দিকে। রামলুকে দেখলাম সামনের ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। বুঝলাম ওটাই আমাদের ঘর। সরু বারান্দাটা শেষ হয়েছে ঐ ঘরের দরজা ছাড়িয়ে দু-পা ফেলবার পর। এখানে একটা রেলিং, রেলিং-এর বাঁ দিক দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে। সেটা ভালো করে দেখবার জন্য রেলিং-এর কাছে এগিয়ে যেতেই সামনে যে দৃশ্য পড়লো, তা দেখে চমকে গেলাম।

সেই আমার প্রথম সমুদ্র-দর্শন। রেলিং-এর বাঁদিকে যে সিঁড়ির কথা বলেছিলাম। সেই সিঁড়ি দিয়ে আট-দশটা ধাপ নামলেই সবুজ ঘাসে-মোড়া চমৎকার 'লন' একটি, তার বাঁ-পাশ দিয়ে পাথরে-গাঁথা অট্টালিকাটির প্রশস্ত সিঁড়ি নেমে গেছে একটা পিচ্-ঢালা রাস্তার ওপর চওড়ায় যেটা ষোলো ফিটের বেশি হবে না। পরে জেনেছিলাম, এরই নাম 'বিচ্ রোড।' এই বিচ্ রোডটি পার হলেই সমুদ্রের অপরিসর বালুবেলা তারপরেই সমগ্র দিগন্ত জুড়ে সমুদ্রের বিস্তার হয়েছে। বালুবেলার ওপর ঢেউ এসে পড়ছে সাদা-সাদা ফেনা নিয়ে, অদূরে বিশাল সমুদ্রের ঢেউ ভাঙছে যাকে বলে 'ব্রেকার', আর ভাঙার পরেই শব্দ হচ্ছে, যেন কোনো ক্রুদ্ধ সিংহ গর্জন করছে! সমুদ্র জুড়ে রঙই বা কী! আকাশটা ফিকে নীল। দিগন্তের কাছে সমুদ্র যেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে, সেখানটা একটু কালো। যেন দিগন্ত জুড়ে কেউ একটা কালো সরলরেখা টেনে দিয়েছে। তার ওপরে আকাশে শোভা পাচ্ছে সাদা-সাদা মেঘ তারা যেন দলবেঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেছে।

সমুদ্রের রঙ ঘোর নীল, কিন্তু তীরের দিকে যেখানে ঢেউ ভাঙছে, সেখানকার রঙ সবুজ -সবুজ আর ঢেউয়ের মুখে সাদা ফেনা। সেই সাদা রঙ তার সঙ্গে মিশে সবুজ, নীল ঘোর নীল, আর দিগন্তে কালোর আভাষ-সব মিলিয়ে রঙের যে সমাবেশ ঘটিয়েছে, তা দেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

এই পরিবেশে আমি সাত বছর কাটিয়েছিলাম। মাঝে কিছু কালের সমুদ্র-ভ্রমণ বাদ দিলে ঐ অট্টালিকার ডানপাশের সামনের দিককার ঘরখানায় আমার কেটেছিল সমস্তটা সময়। অট্টালিকার ডান পাশের বর্ণনা দিয়েছি, বাঁ-পাশেও ঠিক ঐরকম ঘর রয়েছে , রয়েছে ঐরকম সবুজ ঘাসে মোড়া লন। ডাইনে-বাঁয়ে সামনের ঘর গুলিকে রেখে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলা পর্যন্ত। বাড়িটা দোতলা। বিচরোডে বা সমুদ্রের অপরিসর বালুবেলায় দাঁড়ালে বাড়ি টাকে চমৎকার দেখা যায়। সামনে, মাঝখানে মূল সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে মূল বাড়িটিতে ঢুকলে একটা বাঁধানো চাতাল পড়বে, তার দু-পাশে অর্থাৎ ডাইনে-বাঁয়ে দুটি বিশাল দরজা, সামনে সিঁড়ি, একটু ঘুরে একটা ল্যাণ্ডিং বা পাঠাতন তৈরি করে দোতলায় উঠে গেছে। দোতলায় ওঠবার আগে যে চাতালটির কথা বললাম, তার ডাইনে-বাঁয়ের যে কোনো দরজা দিয়ে ঢুকলেই পড়বে চওড়া বারান্দা, তার একপাশে পড়বে একটা করে বেশ বড়ো ঘর, তার সামনেও আর একটা ঘর, সমুদ্রের দিক থেকে তাকালে বাঁ দিকে পড়বে আমাদের সেই শোবার ঘরখানা। আর আমাদের দিকে চওড়া বারান্দার ধারের যে ঘরটার কথা বললাম, সেটা ছিল আমাদের অফিস ঘর। শোভা পাচ্ছে চওড়া একটা টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন, ইত্যাদি। তার মানে আমাদের শোবার ঘর থেকে বেরুলেই সামনে চওড়া বারান্দা, তার বাঁদিকে আমাদের অফিস-ঘর। ডানদিকে রেলিং, ওখানে পরে একটা ইজিচেয়ার পেতে রেখেছিলাম বসে বসে সমুদ্র দেখার জন্য। এই বারান্দার পরেই দরজা, যেটা খুলে চাতালে পা দিয়ে ডানদিকে ঘুরে চওড়া পাথরের সিঁড়ি ভেঙে বিচরোডে নেমে যাওয়া যায়। আবার আমাদের শোবার ঘরের ডানদিকেও একটা অপরিসর সিঁড়ি আছে রেলিং-দেওয়া, অনায়াসে সিঁড়ি দিয়ে আমাদের দিককার সবুজ 'লনে' নেমে যাওয়া যায়, যার কথা আমি সবার আগেই বলেছি।

এর থেকে বোঝা যায়, আমাদের শোবার ঘর আর অফিস-ঘর খুব কাছাকছি। অফিস ঘরের কথা আমাদের এ-কাহিনীতে অনাবশ্যক, কিন্তু

শোবার ঘরটার কথা একটু বলতে হবে। এ-ঘরটার সামনের দিকটা একটু গোলাকার, তাতে বড়ো বড়ো তিনটি জানলা বসানো। সমুদ্র দেখা যায় শুয়ে শুয়ে। ছুটির দিনে দুপুরে একটু ঘুমোবার পর যখন চোখ মেলেছি, তাকিয়ে দেখি, সমুদ্রশিয়রী জানালগুলিতে যেন নীল পর্দা ঝুলছে! ঝড়-বাদলের দিনে আরও চমৎকার। ঢেউগুলি আরও উঁচু উঁচু হয়ে এসে ভেঙে পড়েছে। তার জলের কণা এসে লেগেছে আমার বিছানায়, আমার শরীরে।

এই ঘরে আমার একা কেটেছিল পুরো একটি বছর। দ্বিতীয় বছরেই আমার বাড়ির লোকজন এসে ঘর ভরিয়ে ফেলল, হৈ-চৈ-চিৎকার! এটা আসেনি, ওটা নিয়ে এসো, এঃ! এ আবার কী মাছ! এ আবার খাওয়া যায় নাকি! দে ফেলে দে, নিয়ে আয় নতুন মাছ! কিংবা এ আবার কী রকম দেশ বাবা। এখানে পটল পাওয়া যায় না—ইত্যাদি। সবই খাওয়া পরার গল্প, দেওয়া-নেওয়ার হিসেব।

কিন্তু যখন আমি একা ছিলাম? আমার মালিকদের একজন যিনি ছিলেন, তিনি আমাকে কাজটাজ বুঝিয়ে দিয়েই চলে গেলেন। কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। অফিস-ঘরে চলছে অফিসের কাজ। অফিস-ঘরের পিছনেই ছিল বিরাট রান্নাঘর, তার এক পাশে খাবার টেবিল। তার পিছনের বারান্দার অংশটা আমি কাঠের তক্তা দিয়ে ঘিরে স্নানের ঘর-টর করিয়ে নিয়েছিলাম। ফলে, আমার শোবার ঘরের লাগোয়া যে ঘরখানা স্নানের ঘরের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেটা আর একটি শোবার ঘরে পরিণত হলো। সেখানেও বড়ো একখানা খাট পাতা বাড়তি বিছানা বিছানো, অন্য কেউ এলে ওখানে থাকতে পারে।

আমার শোবার আসল ঘরখানাও আমি মনের মতো সাজিয়ে নিয়েছিলাম। এখানেও ছিল বড়ো খাট বা পালঙ্ক ছিল বই-রাখার আলমারী, ছিল আমার লেখবার টেবিল ও চেয়ার। চেয়ারে বসে একটু লিখি আর একটু তাকাই জানালা দিয়ে নীল সমুদ্রের দিকে। দিনের বেলা অফিসের লোকজন আসে, আসে আমার রান্নার লোক আর কাজের লোক। রাত আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই তাদের কাজকর্ম সেরে চলে যায়, তারপরে আমি একেবারে একা। ছুটির দিনে যদি সিনেমা দেখতে যাই, তাহলেও নটার পরে ফিরে আসি। বাকি রাতটাও আমার কাটে একা। আমি, আর জানলার বাইরে আমার সমুদ্র।

সমুদ্রকে দিনেও যেমন দেখি, রাতেও তেমনি দেখি। চাঁদ যখন ওঠে, সমুদ্র জুড়ে যখন অবারিত জ্যোৎস্না ঝিকমিক করতে থাকে, তখন এক দৃশ্য। আবার

অন্ধকার রাত্রে তারায় ভরা আকাশের নিচে সমুদ্রের আর এক দৃশ্য। ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলানো সবুজ আলো যখন ঝিলিক দেয়, তখন সব দেখেটেখে অভিভূত হয়ে যেতে হয়।

কখনো কখনো আমার ঘুম ভেঙে যেতো রাত তিনটে নাগাদ। কোণের দিকের একটা জানালাই ছিল আমার সব থেকে পছন্দের। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতাম। জ্যোৎস্নারাতে মনে হতো সমুদ্র আর আকাশের মাঝখানটা যেন আলোয় আলোয় ভরে গেছে। একধরনের চাপা স্নিগ্ধ আলো। জ্যোৎস্নার আলো। মেঘের কোলে আকাশে সাঁতার দিচ্ছে চাঁদ। আর তার স্নিগ্ধ নরম আলো যেন পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে সারা সমুদ্রের বুক জুড়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

এরকমই একটি দিনে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। অন্তত আমার কাছে-অদ্ভুত। সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল না। কালো আকাশ জুড়ে তারার মেলা। রাত তিনটে হবে, ঘুম ভেঙে উঠে সেই আমার প্রিয় কোণের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, একটা ব্যাপার দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আকাশের এক প্রান্তে একটা একটু বড়ো তারা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে, তার থেকে একটা আলোর রেখা ঠিক্‌রে পড়েছে সমুদ্রের বুকে, আর সেখান থেকে সেই আলোর রেখা এসে সমুদ্র পার হয়ে ঠিক যেন এসে ছুঁয়েছে আমাকে।

এরকম হয়ত আগেও হয়েছে এই এক বছরের মধ্যে, কিন্তু আমার লক্ষ্য পড়লো সেদিন সেই প্রথম। স্নিগ্ধ তারাটির দিকে অপলক তাকিয়ে আছি। এক সময় মনে হলো সে যেন আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তার আলোর সংকেত পাঠাচ্ছে আমার কাছে। আলোর সেই সরলরেখা সমুদ্র স্পর্শ করে সমুদ্রকে সাক্ষী রেখে আমার অন্তরে এসে প্রবেশ করছে। আজও সে-কথা ভাবতে অবাক লাগে, সেদিন সেই আলোর ভাষায় আমি যেন অনেক কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম। যেন অনেকে মিলে একসঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কেউ তারা থেকে আমার সঙ্গে কথা বলছে না। আমার নিজেরই মনের মধ্যে কথাগুলি যেন সরব হয়ে উঠছে। চারদিক নিস্তব্ধ, সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, শুধু আমারই কানে বাজছে একসঙ্গে অনেক কণ্ঠের কাকলি। কিন্তু কথা গুলো যে কী তা বুঝতে পারছি না।

একসময় বিরক্ত হয়ে নিজেই বলে উঠলাম আঃ!

বলতে বলতে হাত দিয়ে কান দুটো চেপেও ধরলাম।

মুহূর্তে সব চুপ হয়ে গেল কানের ওপর থেকে হাত সরালাম। সমুদ্রের

সঙ্গীত শুধু শোনা যায়। শুনতে শুনতে মনে হলো, এ সঙ্গীতেও একটা ছন্দ আছে। যেন তালে তালে বাজছে সমুদ্রের এই সঙ্গীত! দিনের বেলা যাকে গর্জন বলে ধারণা হয়, নিশুতি রাত্রে কান পেতে শুনছি বলে তাকেই এখন সঙ্গীত বলে মনে হচ্ছে। কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীত, তবলা অথবা পাখোয়াজের তাল সমৃদ্ধ বোলের মতো। তালটাকেও মনে হচ্ছে 'যৎ' তাল। যেন সে অশ্রুত মহান সঙ্গীতের সঙ্গে সমুদ্র তাল রেখে যাচ্ছে।

এই সব ভাবছি আর সঙ্গীত শোনবার চেষ্টা করছি, এমন সময় মনে হলো, সেই আলোর ভাষা যেন আবার মুখর হয়ে উঠেছে। এবার অনেকের কণ্ঠস্বর নয়, একটিমাত্র কণ্ঠ। যেন আমার ছেলেবেলাকার ডাকনাম ধরে কে যেন বহুদূর থেকে হঠাৎ ডেকে উঠলো।

চমকে উঠলাম। এ যে অত্যন্ত চেনা গলা ওয়ালটেয়ারের যে সময়কার কথা বলছি, তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। আর যার কণ্ঠস্বর শুনলাম, তার কণ্ঠস্বর শেষ শুনেছি আমি দশ বছর বয়সে! যখন আমার দশ বছর বয়স, তখনি তো আমার দিদি মারা গিয়েছিল।

আবার দিদি ডেকে উঠলো আমার নাম ধরে। এবার গলা আরও স্পষ্ট, তবু আমার সন্দেহ গেল না। নিজের মনেই প্রশ্ন করলাম, কে তুমি? সত্যি বলো।

সে বললে, আমি স্মৃতি।

তুমি আমার দিদি নও?

হ্যাঁ, দিদি। তবে, স্মৃতি। বলতে পারো, তোমার দিদির স্মৃতি।

আমাকে ডাকছো কেন?

সে বললো, এখানে কী করতে এসেছিস?

চাকরি।

হ্যাঁ রে, আমার সেই হারমনিয়ামটা আছে না?

হ্যাঁ আছে। কলকাতার বাড়িতে।

কেউ বাজায়?

না।

বাজাবেই বা কী করে? সময় কোথায়?

বলে, দিদির স্মৃতি আবার সরব হলো, গান গাইতে কতো ভালোবাসতুম। রেকর্ড শুনে রেডিও শুনে গান তুলতুম। মাষ্টার রেখে গান শেখবার পয়সা

কোথায় বাবার? অতি কষ্টে আমার আবদার রাখতে গিয়ে বাবা একটা হারমনিয়াম কিনে দিয়েছিল। যখন তখন সেই হারমনিয়াম নিয়ে বসতুম বলে মা কতো বকতো।

সঙ্গে সঙ্গে সব আমার মনে পড়ে গেল। বাবা হচ্ছেন সামান্য স্কুল মাষ্টার। ক'টা টাকাই বা তখন মাষ্টারদের মাইনে ছিল? আমরা সব ছোট ছোট, বাবার একার আয়েই সংসার চলে। পাঁচ-পাঁচটি ভাইবোন আমরা। দিদি সবার বড়ো, তারপরে আমি। দিদি আর আমার মধ্যে ছিল ছয় বছরের ব্যবধান, আমাদের দুজনের মধ্যে আরও দুটি ভাই ছিল, তারা জন্মেই মারা গিয়েছিল। তাদের বাদ দিয়েই আমাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ। আমাদের সংসারে দেওয়া-নেওয়ারই হিসেব ছিল বেশি। বাবা স্কুলে পড়ানো ছাড়াও টুইশানি করতেন। কিন্তু তাতেও কুলোতো না। এটা চাই ওটা চাই শুনে শুনে বাবা অতিষ্ট হয়ে উঠতেন। তার ওপরে ছিল আমাদের আবদার। দিদির অবশ্য কোনো চাহিদা ছিল না। সে যখন হারমনিয়াম পেয়ে গেল, তখন যেন হাতে একেবারে স্বর্গ পেল। আর তার কিছু চায় না। সত্যি, আমার দিদিটা ছিল একেবারে অন্যরকম। বিভোর হয়ে গান গাইতো। কখনো মীরার ভজন, কখনো রবীন্দ্রনাথ, এক এক করে কম গান গলায় তোলেনি আমার দিদি। স্কুলে যেতো, বইও পড়তো, কিন্তু সময় ও সুযোগ পেলে গানই ছিল তার চর্চার বিষয়। কিন্তু কতটুকু সময় সে দিতে পারতো? হয়তো তন্ময় হয়ে গাইছে, 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে,'-অমনি রান্নাঘর থেকে ভেসে এলো মায়ের দাবড়ানি, রাখ এখন তোর পাগলামী, আগে এসে কচিটাকে ধর, ককিয়ে সারা হচ্ছে।

গান থামিয়ে দিদিকে ছুটতে হতো আমার সব থেকে ছোট ভাইটাকে ধরতে, শান্ত করতে। কিছুক্ষণ পরে ভাই শান্ত হলে দিদি হয়ত হারমনিয়াম ছেড়ে খালি গলাতেই গুন গুন করছে, 'মৈনে চাকর রাখো জী',—মার বকুনি শুরু হলো আবার, ওসব ছেড়ে রান্না ঘরে একটু এসো না! এদিকে যে হিমসিম খেয়ে গেলুম! দাওনা রুটি কখানা একটু বেলে!

আমার সন্দেহ হতো, মা কি দিদিকে দেখতে পারে না? উঠতে বসতে দিদিকে বকতো মা। অথচ দিদি কখনো টু শব্দটি করতো না। আমি যখন আরও একটু বড়ো হলাম, তখন বড়ো মায়া হতে লাগলো দিদির ওপর। ওকে বাবাও বকে পড়া ঠিক মতো না করলে, মা-ও বকে মার হাতে হাতে কাজে সাহায্য না করলে। তবু ওরই মধ্যে ওর গুনগুনানি শেষ হতো না।

কতদিন দিদির কাজ আমি গিয়ে করে দিতাম। ঝি আসেনি, দিদি বাসন মাজছে। আমি গিয়ে হাত লাগাতাম। দিদি আঁতকে উঠতো, বলতো, পড়া ছেড়ে তুই উঠে এলি? মা কি বাবা দেখতে পেলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না।

তা হোক, তুই সর তো, আমি ঠিক মেজে দেবো।

কথা হতো আমাদের দুই ভাই বোনে রাত্রিবেলায়। মা-বাবা আর ভাইবোনরা ঘুমিয়ে পড়লে মাঝে মাঝে আমরা পা টিপেটিপে সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠতাম। আমাদের বাড়িটা ছিল ছোট, আর একতলা। আমার ছোটবেলায় ধারনা ছিল বাড়িটা বুঝি আমাদের। কিন্তু বড়ো হয়ে জানলাম, তা নয়। বাড়িটা ভাড়াবাড়িই বটে। কিন্তু সে যাক। সে সব রাত্তিরে হয়ত ছিল এমনি তারায় ভরা কালো আকাশ। আজ ঠিক মনে করতে পারছি না। দিদি আর আমি এক কোণে বসেছি, দিদি চাপা গলায় গুনগুন করে গাইতো, 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই!'

আমি ওর গান শুনতে শুনতে এক-একদিন বলতাম, হ্যাঁ দিদি, তুই সবসময় এত দুঃখের গান গাস কেন?

দুঃখের গান বুঝি। দিদি বলতো, অতশত জানিনা, এসব গাইতেই আমার ভালো লাগে। ওসব চটুল গান আমার একটুও পছন্দ নয়। জানিস, আমাদের ক্লাসের কবিতা? কবিতা কর? সে একটা গান শিখেছে। কী সুন্দর সে গান! আমি সবটা এখনো তুলতে পারি নি। সুরটা শুনবি? 'আবার যদি ইচ্ছা করো আবার আসি ফিরে। দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে!'

সেই আমার দিদি-আমার গান-পাগল দিদি হঠাৎ চলে গেল মাত্র ষোলো বছর বয়সে আমাদের সবাইকে ছেড়ে। খুব জ্বর হলো, তারপরে বলতো, মাথা ব্যথা-মাথা ব্যথা! ডাক্তার এসে ওষুধ দিলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে। তারা বললো, এখন এনেছেন? অনেক দেরি হয়ে গেছে!

এখনকার দিন হলে হয়ত বাঁচানো যেতো, কিন্তু তখনকারদিনে সন্ন্যাস রোগের তেমন কোনো চিকিৎসা ছিল না। গোড়ায় ধরা পড়লে হয়ত বাঁচানো যেতো, কিন্তু যখন হাসপাতালে দেওয়া হলো, তখন আর করবার কিছু ছিলনা। হাসপাতালের ডাক্তাররা খুবই চেষ্টা করেছিল, কিন্তু কিছুতেই আর শেষ রক্ষা হলো না। দিদি যখন গেল, তখন আমার বয়স মাত্র দশ বছর। কতটুকুই বা বুঝতাম সংসারকে?

যাই হোক, দিদির স্মৃতি মনে পড়ার জন্যই হোক আর তার আলোর ভাষায় তার কণ্ঠস্বর শুনেই হোক, ভিতরটা যেন মুচড়ে উঠলো! নিজেকে সামলাতে একটু দেরি হলো।

কী ভাবছিস?—আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

বললাম, ভাবছি? তোর সব কথাই। দিদি, তুই হঠাৎ চলে গেলি কেন রে? ও রোগটা তোর হলো কেন? ঐ বয়সে?

দিদি বললো, রোগটা কেন হলো জানি না। কিন্তু চলে আসতে হলো কেন, সেটা জানি।

বল না শুনি?

দিদি বললো, আমার গান ছিল আমার প্রাণের জিনিস। সেটা কেউ বুঝলো না, সেটার কেউ কদর করলো না, তাই আমাকে চলে আসতে হলো।

বললাম, দিদি, তোর একটা গান এখন খুবই মনে পড়ছে। সেই যে গাইতিস না? আবার যদি ইচ্ছা করে আবার আসি ফিরে। সত্যি বল, ফিরতে তোর ইচ্ছা করে না?

দিদির কণ্ঠস্বর বললে, আমি তো ফিরেছিলুম। কিন্তু—

দিদি 'কিন্তু' বলেই চুপ করে গেল, আর কথা বললো না।

আমি বললাম, 'কিন্তু' কী? বল্? এই দিদি?

দিদি উত্তরে সে-কথা এড়িয়ে গেল,বললে, হ্যাঁ রে, আমাদের বাড়ির পশ্চিম দেওয়ালের পিছনে যে কদম্ব গাছটা ছিল, তাতে আজও ফুল ফোটে, তাই না? আহা, বাদলার কালে যখন ফুল ফুটতো, সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য হতো বটে! একটু হাওয়া বাড়লে আমাদের সারা বাড়ি জুড়ে কদমফুলের কেশর ছড়িয়ে পড়তো।

বললাম, একবার হলো কী জানিস? ফুলে ফুলে গাছটা একেবারে ভরে গেল। অতফুল কোনবার হয় না। সেবার হলো। ছাদে উঠে দেখি, গাছটা যেন সর্বাঙ্গ দুলিয়ে নিঃশব্দে হাসছে। ফুলে ফুলে ছড়িয়ে পড়েছে সে হাসির রেশ! সেদিনই মনে হয়েছিল, গাছটা বুঝি জীবন্ত, তার মুখে কথা ফোটে না, কিন্তু সে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে—সারা ডালপালা জুড়ে ফুল ফুটিয়ে সে তার ভাব প্রকাশ করতে জানে। ছাদে আমাকে দেখামাত্রই যেন আমাকে বললো, দেখো তুমি। কত ফুল এবার ফুটিয়েছি।

কিন্তু সে-ই শেষবার। এরপরেই যাদের গাছ তারা গাছটাকে কুড়ুল দিয়ে

কুপিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললো। কোথায় গেল তার হাসি, কোথায় গেল তার অমন খুশি-হওয়ার বহিঃপ্রকাশ।

দিদি শুনে বললে, ইস্।

তারপরে কিছুক্ষণ কাটলো নীরবতার মধ্যে, তারপরে আবার শোনা গেল তার কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ রে, আমাদের দক্ষিণের দেওয়াল ঘেঁষে যে বাতাবী লেবুর গাছটা উঠেছিল, সেটা কাটা পড়েনি তো?

না। সে এখন ফল দিচ্ছে, জানিস দিদি?

দিদির কণ্ঠস্বরে খুশির আবেশ লাগলো, আহা, তাই বুঝি? হ্যাঁ রে, লেবু গাছের গা জড়িয়ে একটা তেলাকুচো উঠেছিল, সেটার কী খবর? কী সুন্দর সাদা সাদা ফুল ফোটাতো সে। তাই না?

আজও ফোটায় দিদি। হাওয়ায় হাওয়ায় সে ফুলগুলি যখন দোলে, তখন মনে হয় নীরব কোনো সঙ্গীতের সঙ্গে তারা যেন তাল রাখছে।

হ্যাঁ, ঐ তাল। ছন্দ। সমস্ত জগৎ জুড়েই এই ছন্দের দোলা। ছন্দহীনতা এই জগতের নিয়ম নয়। হ্যাঁরে, সেই পেয়ারা গাছটা আছে? আজও ফল দেয়?

বললাম, হ্যাঁ দিদি। আজও দেয়। তুই কত ভালোবাসতিস ঐ পেয়ারা খেতে।

দিদি বললো, কত পাখি আসতো, না রে?

পাখি? বললাম, কদম গাছে কত পাখিই না আসতো! দুর্গা-টুনটুনি, দোয়েল, শ্যামা, এ-ছাড়া শালিকের দল তো ছিলই। তাছাড়া, নাম না জানা কত পাখি আসতো। একটা পাখির বুক ছিল টকটকে লাল। পাখি এখনো কিছু কিছু আসে, লেবু গাছটায় গিয়ে বসে, কিম্বা পেয়ারা গাছটায়। কিন্তু তেমন সমারোহ আর নেই।

দিদি বললো, একটা বুলবুল পাখি আসতো মনে আছে? মাথার ঝুঁটি? ভোরবেলায় কদম গাছে বসে বসে গান গাইতো। কী তার সুরেলা গলা! তোদের ঘুম ভাঙাতে রোজ সে আসতো, তোর মনে পড়ে?

হ্যাঁ, তা পড়ে বই কী!

দিদি বললো, কদম্ব গাছে সে এসে বসতো, গান গাইতো, তবু তোদের ঘুম ভাঙতো না বলে সে চলে আসতো তোদের জানালার কাছে লেবু-গাছটায়, কখনো বা পেয়ারা-গাছটায়। প্রাণ ঢেলে সে গান গাইতো। আরও তো বাড়ি

ছিল ও অঞ্চলে, আরও তো কত গাছ ছিল। সে-সব জায়গায় সে যেতো না, যেতো শুধু তোদের বাড়িতেই। তোদেরকেই গান শোনাতে সে ভালোবাসতো। তার গান যদি তোরা মন দিয়ে শুনতিস। তো বুঝতে পারতিস, অনেক গানই ওর গানের ছন্দের সঙ্গে মিলে যায়! তুই যদি গাইতিস, 'মৈনে চাকর রাখো জী', দেখতিস মিলে যেতো। যদি গাইতিস, 'শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ পথে পথে', দেখতিস সে-ও মিলে যেতো। এমনকি 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই', কিম্বা 'আবার যদি ইচ্ছা করে আবার আসি ফিরে' গাইলে তা-ও মিলে যেতো।

সত্যি দিদি!

একেবারে সত্যি। যদি ধৈর্য ধরে কান পেতে শুনতিস, তাহলে ওর ছন্দটাকে ধরতে পারতিস। দেখতিস ঐসব গানগুলিই মিলে যাচ্ছে।

তখন যে ছোট ছিলাম, ছটফটে ছিলাম। বুঝতাম না কিছুই। খেলায় মত্ত হতাম, কখনো ড্যাংগুলি খেলছি, কখনো গুল্‌তি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

দিদি বললে, আমি চলে যাবার পর দুটি বছর কেটে গিয়েছিল। তখন তোর বারো বছর বয়স, বুঝলি? যখন বুলবুলি পাখিটা তোদের কাছে আসতো, তখন তোর বারো বছর বয়স। তখন একটু বুঝে চলবার বুদ্ধি তোর হয়েছিল। ওর গান শুনতে শুনতে আমার কথা যদি একটু ভাবতিস, তাহলে ঐ গানগুলি তোর ঠিক মনে পড়তো। আর যদি মনে পড়তো, তাহলে তুই যা করেছিলি, তা কি করতে পারতিস?

কী করেছিলাম দিদি!

ভুলে গেলি! —দিদির কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, কদম্ব গাছটার ডালে বসে ভোরবেলা সে বিভোর হয়ে গান গাইছে, অন্য কোনো দিকে তার দৃষ্টি ছিলনা। সে যদি বুঝতো গুল্‌তি নিয়ে তুই তাকে তাক করছিস, তাহলে সে ঠিক উড়ে পালাতো। তোর কি মনে আছে? তুই তাকে গুল্‌তি দিয়ে গুলি ছুঁড়লি, লাগলো গিয়ে ঠিক তার মুখে। যে ঠোঁটে সে গান গাইছিল, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত, সে টপ করে মাথা ঘুরে রক্তবমি করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। তুই তোর এক বন্ধুর সঙ্গে দেওয়াল টপ্‌কে কদম্ব গাছটার তলায় এসে ওকে তুলে নিলি দুই হাতে। তখনো ওর প্রাণটা যায়নি, বুকের কাছটা ধুকপুক করছে, তোর নাম ধরে ডাকবার চেষ্টা করছে, বলছে, তুই! তুই আমাকে

মারলি! আমাকে! যে আমি তোকে ভালোবাসি বলে তোকেই ভোরবেলা গান শোনাতে আসতাম!

কী বলছো তুমি, দিদি!

দিদি বললো, আমিই আবার ঐ বুলবুল হয়ে জন্মেছিলাম। বিশেষ করে তোর মায়া কাটাতে পারিনি বলে তোর কাছে গিয়ে প্রাণমন ঢেলে তোকে গান শোনাতাম। কে যে কীভাবে তোদের আশেপাশে আসে, তা তোরা জানবার চেষ্টা করিস না, বুঝবার চেষ্টা করিস না। ঐ কদম্ব গাছটারও প্রাণ ছিল, সেও এক জন্মে আমাদের আত্মীয় ছিল। ঐ পেয়ারা গাছ, ঐ লেবু গাছ, ওরাও আমাদের পরমাত্মীয়। শুধু আমরা চিনতে পারি না। তাই ভুল করি। কেন ভুল করিস ভাই? যখন তোদের 'দিদি' হয়ে ছিলাম, আমাকে গান গাইতে দেওয়া হলো না, মর্মে মর্মে দুঃখ অনুভব করেছিলাম বলে চলে এলাম তোদের ছেড়ে। কিন্তু মায়া যাই কোথা? পাখি হয়ে আবার গেলাম তোদের গান শোনাতে। কোনো ক্ষতি তো করিনি? তবু আমাকে অমন করে হঠাৎ মেরে ফেললি কেন ভাই, এক অসৎ বন্ধুর প্ররোচনায়?

আমি ওর কথা শুনে ডুক্‌রে উঠলাম, দিদি!

চমকে চোখ তুলে দেখি কখন ভোর হয়ে গেছে! বিচরোডে বেড়াতে বেরিয়েছেন একটি মানুষ, তিনি হঠাৎ আমার ঐ কান্নাভরা চিৎকার শুনে থমকে দাঁড়িয়েছেন, মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছেন, ভাবতে চেষ্টা করছেন। কী হলো ব্যাপারটা?

আমি চট্‌করে জানালা থেকে সরে এলাম। ওঁকে মুখ দেখাতে পারলাম না।

একটি ভৌতিক রেল ট্রলি

বিমল কর

জগদীশের বাড়িতে প্রায় শনিবার সন্ধেবেলায় আমাদের এক আড্ডা বসে। আমরা এর নাম দিয়েছি 'শনিচক্র'। তিন-চারজন বন্ধু জমায়েত হই সন্ধেবেলায়, চা, মুড়ি, তেলেভাজা খাই আর নিছক গল্প করি। সেসব গল্পের কোন ঠিক ঠিকানা থাকে না; সেদিন যাতে মেতে উঠি তাই নিয়েই গল্প চলতে থাকে। হাসির গল্প হলে রাখহরি মাতিয়ে রাখে, খুনোখুনি ডিটেকটিভ ধরনের গল্প শুরু হলে পল্লব আমাদের হাঁ করিয়ে রাখতে পারে। আর ভবিষ্যতের মানুষের চেহারা কেমন হবে, তার কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কিভাবে বদলাবে—এইসব গল্প জুড়লে অনীশ একেবারে আতঙ্ক ধরিয়ে দেয় আমাদের।

তা সেদিন বিজন দত্ত হঠাৎ আত্মা আছে কি নেই—তার গল্প জুড়ে দিল। তার হাতে একটা বই ছিল। ইংরাজি বই। তাতে নাকি মরণের পর কোনও-কোনও মানুষের কী গতি হয়েছে তার সম্পর্কে কয়েকটি কাহিনী ছিল।

আত্মা থেকে প্রেতাত্মার কথা উঠল। আমরা প্রচন্ড উৎসাহ পেলাম গল্পে, নানারকম হাসি-তামাশা চলতে লাগল।

এমন সময় ছদ্মবেশী বাবু এসে হাজির। ভদ্রলোকের নাম পরিতোষ। আমরা তাঁকে ছদ্মবেশীবাবু বলি। বলি, কেননা ভদ্রলোকের বয়েস ষাট হয়ে গেছে, কিন্তু চেহারাটা পঞ্চাশের তলায় ধরে রেখেছেন। চমৎকার স্বাস্থ্য, দেখতেও সুপুরুষ, মানুষটিও চমৎকার। পয়লা নম্বরের গল্পবাজ।

পরিতোষবাবু আসতেই আমরা তাঁকে খাতির করে বসিয়ে বললাম, আজকের আসরে আমরা আত্মা, প্রেতাত্মা, ভূত নামিয়েছি। এ সম্পর্কে তিনি কী বলেন?

একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। পরিতোষবাবু বা আমাদের পরিতোষদা নানা ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। জীবনে তিনি কত কী করেছেন, কত জায়গায় ঘুরেছেন তার ইয়ত্তা নেই। প্রচুর অভিজ্ঞতা! এমনকি, মিলিটারি জীবনেরও।

পরিতোষদা আমাদের চোখমুখ দেখলেন কয়েক পলক। তারপর বললেন, "আত্মা, প্রেতাত্মা, ভূত! তোমরা তো দেখছি ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু, ক্লাস থ্রি করে সব সাজিয়ে ফেলেছ! তা যদি ভূতের কথা শুনতে চাও, আমি কিছু বলতে পারব না। তবে যদি অদ্ভুত কোনও ঘটনার কথা শুনতে চাও একটা ঘটনার কথা বলতে পারি। সেদিনও আমি বুঝিনি, ঘটনাটা কেমন করে ঘটল; পরে অনেক ভেবেও তার কারণ জানতে পারিনি; আজও পারি না।"

আমরা বললুম, "আপনি সেই ঘটনার কথাই বলুন।"

পরিতোষদা তাঁর চুরুট ধরালেন ধীরেসুস্থে। তারপর গল্প বলা শুরু করলেন।

"ঘটনাটা ঘটেছিল বছর ত্রিশ আগে। আমি তখন 'কারবো গ্রিয়ারস্'-এর রিপ্রেজেনটেটিভ। আমাদের কোম্পানি সেসময় বেবি বয়লার আর কোল-ফায়ার্ড বয়লারের কাজ করে। নামী কোম্পানি। তা আমাকে অফিস থেকে এক জায়গায় পাঠাচ্ছিল, নাগপুর থেকে সোয়া দুশো মাইল হবে। একটা কারখানা চালু হবে। তাদের কোল ফায়ার্ড বয়লার দরকার। কাগজ-পত্র, ড্রয়িং আমাদের কাছে যা মজুত আছে তার ক্যাটালগ, দামের ফিরিস্তি ইত্যাদি নিয়ে আমার যাওয়ার কথা। গোছগাছ করে বেরিয়ে যাব, এমন সময় ছোটসাহেব ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখা করতেই দু-দশটা কাজের কথার পর হঠাৎ বললেন, 'মুখার্জি, তুমি যদি বাড়তি কাজ সেরে এসো ভাল হয়।' বললাম, 'কি কাজ?' সাহেব বললেন, 'তুমি যেখানে যাচ্ছ তার কাছাকাছি হাতারাস বলে একটা জায়গা আছে। লাস্ট ওয়ারের সময় ওখানে ব্রিটিশদের একটা লুকনো এয়ার-বেস ছিল। আমি শুনেছি, বেসটায় এখনও অনেক স্ক্র্যাপ পড়ে আছে। ডিসপোজাল সামান্যই বিক্রি হয়েছিল। এখন জায়গাটা জঙ্গল। এই স্ক্র্যাপ আমরা কিনতে পারি খুবই সস্তায়। তুমি একবার খোঁজ নিয়ে আসবে।'

"আদার ব্যাপারি, জাহাজের খোঁজ নিয়ে কী লাভ! বললাম, 'আমি চেষ্টা

করব, সার।' যদিও বুঝলাম না, প্লেনের স্ক্র্যাপ মেটিরিয়াল আমাদের কোন কাজে লাগতে পারে!

"তা একদিন, কোম্পানির কাজ সেরে প্রচন্ড গরমের মধ্যে এক স্টেশনে এসে নামলুম। স্টেশনটা খুবই ছোট। আমাদের রোড সাইড স্টেশন যেমন হয়, তেমনই। অবাক ব্যাপার, ওই স্টেশনই আবার জংশন। দেখলাম, ওই স্টেশন থেকে ন্যারো গেজ, মানে ছোট লাইনের গাড়ি ধরতে হবে হাতারাস যাওয়ার জন্য। তোমরা যদি ঘোরাফেরা শুরু করো, দেখবে—এইরকম জংশন স্টেশন আমাদের দেশে গন্ডায় গন্ডায় রয়েছে।

যে স্টেশনে আমি নেমেছিলুম তার নাম, চিচৌকি। চিচৌকি জংশন। নেমেছিলাম সন্ধে নাগাদ। তখন মে মাস। প্রচন্ড গরম চলছে। রেলগাড়িতে আমি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছি অর্ধেক। গা যত পুড়েছে পুড়ুক, কিন্তু দেখি গরমে এবং স্নানের অভাবে আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে মাঝে মাঝে। চোখ জবাফুল।

"শুনলুম ছোট লাইনের গাড়ি ছাড়বে কাল সকালে। তার মানে এই স্টেশনেই আমায় রাত কাটাতে হবে। কাছেপিঠে ওঠার মতন জায়গা তো নেইই, এমনকী, একটা ধর্মশালাও নয়।

"স্টেশনে ওয়েটিংরুম বলে কিছু নেই। একটা খুপরি ঘর রয়েছে। সেটাই মুসাফিরখানা। ওই ঘরে একটি মাত্র বেঞ্চি আর পা-ভাঙা এক চেয়ার পড়ে আছে। দেড় হাতের এক কলঘর। তাতে না জল, না বালতি।

"স্টেশনমাস্টার বললেন, সামনেই একটা ইঁদারা আছে। জল ভাল। ওখানে গিয়েই স্নান করে নিন। আর ওই দোকানে যান—পুরি, ভাজি পেয়ে যাবেন।' বলে একটা আটচালা দেখিয়ে দিলেন। আটচালা থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে একটা টিনের শেড। সেখানে শেডের তলায় খেলনা গাড়ির মতো দু-তিনটে কামরা দাঁড়িয়ে। একটা এঞ্জিন, ছোট বহরের।

"জায়গাটা পাহাড়ি। জঙ্গলে ঘেরা। সারাদিনের তাপ সন্ধের পর থেকেই কমতে শুরু করল ধীরে ধীরে। কুয়োতলায় গিয়ে স্নান করলাম। জল সত্যিই ভাল। স্নান করে শরীর জুড়োল। তারপর দোকানে গিয়ে পুরি আর আলুর ঘ্যাঁট খেলাম। ম্যায় লাড্ডু। এক গ্লাস চা।

"একটু রাত হল। স্টেশনের মুসাফিরখানার বাইরে বসে রইলাম চুপ করে। একটা ভাঙা ওজনযন্ত্র পড়ে ছিল তার ওপরে।

"ধীরে ধীরে রাত হয়ে আসতে লাগল। গরমটাও পালাল। তার বদলে

জঙ্গলের ঠান্ডা বাতাসে আর পাহাড়ি জায়গায় ঠান্ডায় ক্রমেই কেমন ঘুম পেতে লাগল। নিজের জিনিসপত্র আগলে বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়েও পড়েছিলাম।

"যখন ঘুম ভাঙল, তখন কত রাত তা আমি খেয়াল করিনি প্রথমটায়। মনে হল, মাঝরাত। এবার বেশ শীত করছিল। বাতাস ঠান্ডা। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। স্টেশনমাস্টারের ঘরেও কেউ আছে কিনা কে জানে!

"আমার ঘুম ভেঙেছিল শব্দ শুনে। মুসাফিরখানার সেই ছোট্ট ঘরে কেমন একটা শব্দ হচ্ছিল। কিসের শব্দ! আমি যতদূর জানি, ওই ঘরে কেউ নেই, থাকার কথাও নয়। কেননা ওখানে থাকা যায় না। আলো নেই, পাখা নেই; একটা জানলা আছে, সেটাও খোলে না। শুধু দরজাটাই যা কোনওরকমে খোলা-বন্ধ করা যায়। তাছাড়া ওই ঘরের লাগোয়া দেড়-দু'হাতের কলঘরের যা গন্ধ—তাতে কোনও মানুষ কাছাকাছি থাকতে পারে না। তা হলে?

"কান পেতে শব্দটা শুনলাম। কুকুর নয়তো? স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একজোড়া কুকুর দেখেছি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মটাই তাদের যেন থাকার জায়গা। হতে পারে কুকুর ঢুকে বসে আছে।

"এদিকে আমার শীত শীত করছিল। শিরশির করা যাকে বলে। মাথাটাও কেমন ধরা ধরা লাগলো। ট্রেনের ধকোল, ওই চামড়া ঝলসানো গরম, তারপর সন্ধেবেলায় কুয়োর জলে স্নান, এসবের জন্য হতে পারে। তা ছাড়া এখন যেরকম ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে বনজঙ্গলের, তাতে একটু শীত ধরতেই পারে। নতুন জলে স্নানের জন্য মাথা ভার হওয়াও অসম্ভব নয়।

"মুসাফিরখানার ছোট্ট ঘর থেকে নানারকম শব্দ আসতে লাগল। মনে হল, কে যেন চেয়ার উলটে ফেলে দিল, বেঞ্চি সরাল, কলঘরে বালতি, মগ টানাটানি করতে লাগল।

"বড় অদ্ভুত ব্যাপার তো! কলঘরে বালতি বা মগ কিছুই ছিল না। জলও নয়। তা হলে বালতি, মগ এল কোথা থেকে, আর কেই-বা সেগুলো টানাটানি করবে!

"শব্দ হতে হতে একসময় সব থেমে গেল। একেবারে চুপচাপ। মনে হল, কোনও কুকুরই ঢুকে পড়েছিল, বেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোন দিক দিয়ে গেল? আমার তো চোখে পড়ল না!

"ঘুমভাঙা লোকের যেমন হয়, আমার লম্বা লম্বা হাই উঠেছিল। ছলছল করছিল চোখ। একটা সিগারেট ধরালাম। তখন আমি চুরুটের অভ্যেস করিনি;

সিগারেটেই খেতাম। ঘড়ি দেখলাম হাতের, সাড়ে তিনটে। মানে আর দু'ঘন্টা কাটাতে পারলেই ভোর, গ্রীষ্মের সকাল।

'সিগারেট ধরিয়ে আড়মোড়া ভাঙছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, সামান্য তফাতে ছোট লাইনের ওপর এক ট্রলি দাঁড়িয়ে। তোমরা নিশ্চয় ট্রলি দেখেছ। রেললাইনের তদারকির কাজে লাগে। বড় লাইনের ট্রলি বড়। ছোট লাইনের ট্রলি এত ছোট যে বোঝান মুশকিল। ধরো, দু'জনে বসার বাসের সিট যতটুকু চওড়া হয়, প্রায় ততটাই।

''ট্রলি দেখছিলাম, চোখে পড়ল এক সাহেব। পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে হাফশার্ট, জুতো-মোজা, মাথায় শোলার হ্যাট। বড় অবাক লাগল। এই রাত সাড়ে তিনটের সময় মাথায় টুপি পরে কোন পাগল ট্রলির কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

''আমার কী মনে হল, উঠে পড়ে গজ পঞ্চাশ এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ছোট লাইনের নিচু প্ল্যাটফর্মে ট্রলি আর এক সাহেব দাঁড়িয়ে আছে।

''সাহেব আমাকে দেখল। আমি তাকে।

''মামুলি চেহারা সাহেবের। মাথায় বেঁটে। গলায় রুমাল বাঁধা বলে থুতনি দেখা যাচ্ছিল না। আর টুপির জন্য কপাল ঢাকা পড়েছে।

''আমি কিছু বলার আগে সাহেব হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাব আমি? ...আমি বললাম, হাতারাস। গাড়ির জন্য বসে আছি।'

''সাহেব বলল, গাড়ি হয়তো সারাদিনই পাব না। লাইন ভেঙে গিয়েছে সামনে। খবর পেয়ে দেখতে বেরিয়েছে সাহেব। বলে নিজেই বলল আবার, 'তুমি যদি আমার সঙ্গে ট্রলিতে আসতে চাও, আমি তোমাকে খানিকটা পৌঁছে দিতে পারব। সেখান থেমে ট্রেকার পাবে। হাতারাস যাওয়ার।'

''রাজি হব কি হব না করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলাম। ছোট লাইনের গাড়ি যদি নাই পাই তাহলে অকারণ এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থেকে কী লাভ! তার চেয়ে এমন কোন জায়গায় যদি যেতে পারি যেখান থেকে ট্রেকার, টেম্পো পাওয়া যায় হাতারাস যাওয়ার—আমার পক্ষে তো সেটাই ভাল।

''সুটকেস আর ছোট হোল্ডঅলটা টেনে এনে ট্রলিতে রাখলাম। সাহেবকে বললাম, 'তোমার পোর্টার কই, ট্রলি-কুলি, কারা ট্রলি ঠেলবে?'... সাহেব আমাকে একটা জিনিস দেখাল। মোটর ছোট ট্রলির এক পাশে লাগানো আছে। বুঝলাম, এই ট্রলিটা মোটরে চলে, কুলির দরকার পড়ে না। আগে পায় কুলিরা

ট্রলি ঠেলত, এখন অনেক ভটভটি ট্রলি হয়ে গেছে। এঞ্জিনে চলে।

" সাহেব আর আমি পাশাপাশি বসে। ঠেসাঠেসি করেই। পায়ের কাছে আমার হোল্ডঅল আর সুটকেশ।

" সাহেব স্টার্ট দিল এঞ্জিনে। ভটভট শব্দ হতে লাগল। ট্রলির মুখের সামনে আলো ছিল, মোটর গাড়ির লাইটের মতন। তবে একটা মাত্র আলোই জ্বলল দেখলাম। পেছনে একরত্তি লাল আলো।

"ট্রলি চলতে শুরু করল। আমার হাতঘড়িতে তখন চারটে বাজে। ঘন্টাখানেক এই অন্ধকার থাকবে। তারপর ধীরে ধীরে আধাঁর কাটতে শুরু করবে। গরমের দিন। ফরসা হতে হতে বড়জোর সোয়া পাঁচ।

"ট্রলি চলতে শুরু করার পর আমি সাহেবের সঙ্গে গল্প জমাবার চেষ্টা করছিলাম। সাহেব কথাই বলছিল না। দু-চারবার হুঁ-হাঁর পর সাহেব আমাকে লাইনের দিকে দেখিয়ে দিল। মানে বলল, কথা বোলো না, আমি এখন লাইন দেখছি।

"রাত্রে যে কেমন করে লাইন দেখা যায়—আমি বুঝলাম না। খানিক পরে মনে হল, চোখের চেয়েও কানটাই যেন আসল। সাহেব লাইনের শব্দ শুনেই যেন অনুমান করার চেষ্টা করছে কোথাও গোলমাল আছে কি না!

"বাধ্য হয়েই আমি চুপ করে থাকলাম। ছোই লাইনের ওপর দিয়ে ট্রলি চলতে লাগল। লাইনের শব্দের সঙ্গে মোটরের ফটফট ভটভট শব্দ হচ্ছিল।

"ধীরে-ধীরে ট্রলি জোর হচ্ছিল। শব্দ বাড়ছিল। আশপাশের জঙ্গলও বুঝি ঘন হয়ে আসছিল, কখনও পাতলা হয়ে যাচ্ছিল। মাঠের পর মাঠ, গাছের পর গাছ অন্ধকার, কোথাও জোনাকি উড়ছে, কোনও মাঠে আলেয়ার আলো, কোথাও বা ছোট ছোট পাহাড়।

"শেষরাতে বাতাস বাড়তে লাগল। দেখতে দেখতে ঝড়ের মতন হল। আকাশভরা তারা। হু হু বাতাসের সঙ্গে শীতও যেন ছুটে আসছিল। আমার কাঁপুনি লাগছিল।

"সাহেব চুপচাপ। ট্রলির চাকার শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল, যতটা সম্ভব জোরে ট্রলি ছুটছে। চাকাগুলো যেন লাইনের ওপর থরথর করে কাঁপছে। কাঁদছেও বুঝি। আর আমাদের চারপাশ থেকে মাঠ, গাছপালা, জঙ্গল, সরু শুকনো নদী—যা আছে চতুর্দিকে, সবই ছুটে-ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে।

"আমার ভয় করতে শুরু করেছিল। এ আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে

সাহেব, বুঝতে পারছিলাম না। অদ্ভুত লোক তো, মুখে একটাও কথা নেই, সামনে তাকিয়ে বসে আছে, ভয়ডর বলে কিছু কি নেই মানুষটার? সাহেবের বাঁ হাতের দিকে একটা লোহার লম্বা হাতল, মানে লিভার; ওটাই গাড়ি-থামার যন্ত্র, ব্রেক। আমি সাহেবের ডান-পাশে বসে। আমার পক্ষে ওই হাতল ধরা সম্ভব নয়।

"শেষ পর্যন্ত আর আমার সহ্য হল না। ভয়ে চিৎকার করে বললুম, 'গাড়ি থামান। দয়া করে থামান গাড়ি। এখনই একটা অ্যাকসিডেন্ট হবে। প্লিজ, গাড়ি থামান।'

"সেই ঝোড়ো বাতাসে আমার গলার স্বর যেন ফুটল না। সাহেবও শুনতে পেল কিনা কে জানে! ট্রলি বুঝি আরও জোর হল। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু অন্ধকার, আর রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রলি ভেসে যাওয়ার ভীষণ শব্দ কানে আসছিল।

"পাগলের মতন, কিছু না বুঝেই আমি সাহেবের গায়ের ওপর দিয়ে ব্রেকের হাতলটা ধরতে গেলাম। পারলাম না। তারপর দেখি, সাহেবের মাথার টুপি কখন হাওয়ায় উড়ে গিয়েছে। একমাথা সাদা চুল। অন্ধকারেও সেটা বোঝা যাচ্ছিল। সাহেবের মুখও সাদা। যেন হাড়ের মতন সাদা।

"ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করব কি, আমার যেন গলার স্বর ফুটল না। বুকের মধ্যে কেমন যেন করছিল। মনে হল, আমার হৃদপিন্ড বন্ধ হয়ে যাবে। আর ওই অবস্থায় দেখলাম সাহেবের মাথা মুখ কিছুই আর নজরে পড়ছে না। গায়ের পোশাকগুলোও যেন কোথায় উড়ে গিয়েছে। মানুষটাই আর নেই। শুধু আমি একলা; আর সেই ছুটন্ত, ট্রলি অন্ধকার, মাঠঘাট, জঙ্গল।

"নিজেকে বাঁচাবার জন্য ট্রলির সেই হাতল ধরে প্রাণপণে টানলাম। তখন আমার খেয়াল হয়নি অত জোরে যে ট্রলি ছুটছে—সেটা থামাতে হলে ধীরে ধীরে থামাতে হবে। ব্রেক ধরানো চাই আস্তে আস্তে। আচমকা থামাতে গেলেই গাড়ি ছিটকে যাবে, উলটে যাবে—কোথায় গিয়ে পড়বে কেউ জানে না।

"হলও তাই। ট্রলি কোথায় গেল জানি না, আমিও ছিটকে গিয়ে কোথায় পড়লাম কে জানে!

"যখন আমার জ্ঞান এল—দেখি হাত, পা, কপালে ব্যান্ডেজ জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে আছি রেলের হাসপাতালে। দিন তিনেক পরে আমার জ্ঞান ফিরে এসেছিল শুনেছি।

" তা মাথাটা সে যাত্রায় বেঁচে গেল। হাত, পা, কোমরে চোট পেয়েছিলাম। আমার বাঁ-হাত ভাঙা, ডান পায়ের হাঁটু অকেজো, আর কোমর-পিঠ কোনওরকমে জখমটা সামলে নিয়েছে।

"হ্যাঁ, একটা কথা বলা দরকার। পরে আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, আমার যখন দুর্ঘটনা ঘটে তার ঘন্টা দুই পরে ছোটলাইনের এক ট্রলি সাহেব—ভোরবেলায় লাইন দেখতে বেরিয়ে ছিলেন। তিনিই আমাকে পড়ে থাকতে দেখতে পান। নিজেই তুলে আনেন আমাকে। ....তোমরা হয়ত জিজ্ঞেস করবে, আগের ট্রলি গেল কোথায়? সেই প্রথম সাহেবই বা কোথায় গেল? সত্যি বলতে কি, আমি নিজেই এই ব্যাপার নিয়ে অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, মাথা ঘামিয়েছি। কোনও সদুত্তর পাইনি। শুধু জানতে পেরেছিলাম—ছোট লাইনে একটা ট্রলি আগে থেকেই দাঁড় করানো ছিল। সেটাকে আর লাইনে পাওয়া যায়নি।

"ঠিক যে কি হয়েছিল, আমি বলতে পারব না। কেউ আমায় হাতছানি দিয়ে ডেকে ওই ট্রলির ওপর তুলে নিয়েছিল, না কি আমি বেহুঁশ হয়ে নিজেই ট্রলিতে গিয়ে বসেছিলাম, জানি না।

"আর যদি বসেও থাকি, ট্রলি চালাতে আমি জানতাম না। কেমন করে সেটা চলল, কে চালাল তার কোনও জবাব আমার জানা নেই। তবে বিশ্বাস করো, সাহেবের চেহারাটা আমার এখনো খুব আবছাভাবে মনে পড়ে।"

পরিতোষদার গল্প শেষ হওয়ার পর অনীশ বলল, "আমি হলে ট্রলি থামাতাম না, দেখতাম সেটা নিজে-নিজেই থামে কি না! হয়তো থামত।"

রাখহরি বলল, "থামত না। আর থামলেও যেখানে গিয়ে থামত, সেখান থেকে পরিতোষদাকে ফিরিয়ে আনা যেত না।"

প্রেমলতার হাসি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রেমলতা হেসে উঠলেন।

হাসলে নাকি মানুষকে খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু কেউ যদি পাগলের মতন হাসে? হাসতে হাসতে কারও চোখের তারায় যদি আগুন জ্বলে ওঠে? ঠোঁট দুটি যদি বিদ্রুপে, ঘৃণায় বেঁকে যায়? তবু কি তাকে খুব সুন্দর দেখাবে?

প্রেমলতার চোখে আগুন জ্বলছিল। বিদ্রূপে, ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট দুটি টানা-টানা; নাকটি টিকোলো। সব চাইতে সুন্দর তাঁর ভুরু। দেখলে মনে হতে পারে, চোখের উপরে একটা ছোট্ট পাখি যেন ডানা মেলে দিয়েছে। সেটা অবশ্য ঈশ্বরের নয়, মেক-আপ ম্যানের কৃতিত্ব। কিন্তু মেক-আপ ম্যান তো কত মেয়েরই ভুরু এঁকে দেয়। কই, তাদের তো এত সুন্দর দেখায় না। প্রেমলতা সত্যিই সুন্দরী। ভুরুর উপরে তুলির ছোঁয়া না লাগলেও তাঁকে সুন্দর দেখাত।

প্রেমলতার বয়স কত হল? সিনেমা-থিয়েটারের কাগজগুলো বলে তিরিশ। তারা ঠিক কথা বলে না। আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে তিনি মঞ্চে নেমেছিলেন। তখনই তাঁর বয়স ছিল কুড়ি। সুতরাং অঙ্কের হিসেবে, তিনি চল্লিশে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু তাতে কী, যৌবন তাঁর শরীর থেকে আজও বিদায় নেয় নি। আজও যখন তিনি মঞ্চের উপরে গিয়ে দাঁড়ান, দর্শকের চোখে পলক পড়ে না।

তা না পড়ুক, এই মুহূর্তে, হোটেলের এই ঘরের মধ্যে তাঁকে ভীষণ বিচ্ছিরি লাগছিল। হাসলে নাকি সবাইকেই খুব সুন্দর দেখায়। প্রেমলতাকে দেখাচ্ছিল না। তিনি হাসছিলেন। কিন্তু ঘনশ্যাম দেখছিল যে, তাঁর চোখের তারায় আগুন জ্বলছে। বিদ্রূপে, ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট দুটি হঠাৎ বেঁকে গিয়েছে।

সিগারেটের কৌটোটাকে পকেট থেকে বার করে সেন্টার টেবিলের উপরে রাখল ঘনশ্যাম। কৌটো খুলে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

প্রেমলতা বললেন, 'আমাকে একটা দিন।'

'আমি জানতুম না আপনার চলে।' কৌটোটাকে প্রেমলতার দিকে এগিয়ে দিয়ে যেন প্রায় ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বলল ঘনশ্যাম।

'আপনি অনেক কিছুই জানেন না।'

ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে লাইটার বের করে সিগারেট ধরালেন প্রেমলতা। অভিজ্ঞ ধুমপায়ীর মতন ধোঁয়াটাকে অন্তত পাঁচ সেকেণ্ডের জন্যে মুখের মধ্যে ধরে রাখলেন। তারপর নাক দিয়ে সেই ধোঁয়াটাকে গলগল করে বার করে দিয়ে আবার আগের মতই হেসে উঠলেন তিনি। ঘনশ্যাম বুঝল না, প্রেমলতা তাকে ঠাট্টা করছেন কিনা। সে শুধু লক্ষ্য করল যে, হাসির দমকে তাঁর ঠোঁট দুটি আবার বেঁকে যাচ্ছে!

হাসলে সবাইকেই সুন্দর দেখায়। কিন্তু প্রেমলতাকে দেখায় না। অন্তত তখন দেখায় না,হাসতে হাসতে তাঁর চোখের তারায় যখন আগুন জ্বলে ওঠে, ঠোঁট দুটি হঠাৎ বিদ্রূপে, ঘৃণায় বেঁকে যায়।

কাকে ঘৃণা করেন প্রেমলতা? কামিনীকে? কেন? রতনলাল তাকে ভালবাসত, তাই? প্রেমলতা কি তাহলে রতনলালকে ভালবেসে ছিলেন? রতনলালকে কি তিনি বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন? আশ্চর্য। প্রেমলতাকে তো কেউ কখনও বেঁধে রাখতে পারে নি। তিনি তাহলে রতনলালকে বাঁধতে চেয়েছিলেন কেন?

'অনেক রাত হল ঘনশ্যামবাবু। আপনি এবারে বাড়ি যান।'

প্রেমলতার কথায় চমক ভাঙল ঘনশ্যামের। কিন্তু চেয়ার থেকে সে উঠল না। সেন্টার টেবিলে তার সিগারেটের কৌটোটা খোলাই ছিল। রুপোর কাজ-করা মস্ত বড় কৌটো। সিগারেট রাখবার জন্যে এত বড় কৌটো কেউ সাধারণত ব্যবহার করে না। ঘনশ্যাম করে। সে এমন অনেক-কিছুই ব্যবহার করে, অন্য অনেকের যা পছন্দ নয়। কৌটো থেকে সে আর একটা সিগারেট

তুলে নিল। পুরোন সিগারেটটাকে অ্যাসট্রের উপরে পিষে দিয়ে নতুন সিগারেটটাকে ধরিয়ে নিল। তারপর বলল, 'বাড়ি তো যেতেই হবে, কিন্তু তার আগে আমার প্রশ্নের একটা জবাব পাওয়া দরকার। আপনি এখনও জবাব দেন নি।'

'জবাব আমি পুলিশকে অন্তত পঁচিশবার দিয়েছি।' লঘু তরল গলায় প্রেমলতা বললেন, 'শুধু পুলিশ কেন, প্রত্যেকেই জানে যে, গত সোমবার রাত সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে কোনও সময়েই আমি রতনলালের হোটেলে যাই নি। সে-হোটেলের ধারে-কাছেও আমি তখন ছিলাম না।'

'কোথায় ছিলেন আপনি?'

'নটরাজ থিয়েটারে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

আবার হেসে উঠলেন প্রেমলতা। বললেন, 'আপনি না-করতে পারেন কিন্তু আদালত করবে। নটরাজ থিয়েটারের ম্যানেজার থেকে শুরু করে প্রম্টার পর্যন্ত সবাই সাক্ষ্য দেবে যে, সেদিন সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত আমি নটরাজ থিয়েটারেই ছিলাম।'

'তারা আপনার নিজের লোক।'

'আর দর্শকরা? তারাও কি আমার নিজের লোক নাকি? ঘনশ্যামবাবু, সে-রাতে যারা নটরাজ থিয়েটারে আমার অভিনয় দেখেছে, তাদের কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন? তারা জানে, সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই আমি মঞ্চে উপস্থিত ছিলাম। মাঝখানে অবশ্য মিনিট দশেকের বিরতি ছিল। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই নটরাজ থিয়েটার থেকে তিন মাইল দূরের একটা হোটেলে গিয়ে কাউকে খুন করে আবার থিয়েটারে ফিরে আসা যায় না। ঘনশ্যামবাবু, রতনলালকে আমি খুন করি না, এবং আদালতকে সে-কথা বিশ্বাস করানো আমার পক্ষে খুবই সহজ হবে।'

'আমাকে বিশ্বাস করানো খুব সহজ হবে না।' ঘনশ্যাম খুব শান্ত গলায় বলল।

'কেন?'

'রতনলালের ঘরে একটা রুমাল পাওয়া গেছে। তার কোণ লেখা আছে 'K'।

'তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? 'K' তো আমার নামের আদ্যক্ষর নয়। আমার নাম তো প্রেমলতা!'

'সেটা আপনার থিয়েটারী নাম। আপনার আসল নাম তো কৃষ্ণা। তাই না?'

আবার হেসে উঠলেন প্রেমলতা। বললেন, 'এ খবর আপনি কোত্থেকে পেলেন?'

'যেখানেই পাই, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে, কথাটা সত্যি কিনা।'

'সত্যি। কিন্তু রুমালটা তাই বলে আমার নয়। খুব সম্ভব কামিনীর। ভুলে যাবেন না যে তারও নামের আদ্যক্ষর 'K'। আর তাছাড়া....,

কি যেন বলতে গিয়ে বললেন না প্রেমলতা। চুপ করে রইলেন। ঘনশ্যাম বলল, 'থামলেন কেন? বলুন। আর তা ছাড়া কী?'

'আমার উকিল আমাকে জানিয়েছেন যে, রুমালটা যদি কামিনীর নাও হয়, তবু আমার উপরে কারও সন্দেহ পড়তে পারে না। পড়া উচিত নয়।

'নয় কেন?'

'এই জন্যে যে, আমার অ্যালিবাইটা পাকা।' ঘনশ্যামের কৌটো থেকে নিজেই আর একটা সিগারেট তুলে নিলেন প্রেমলতা। তারপর বললেন, 'সকলেই আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবে। সকলেই বলবে যে, সেদিন রাত সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত আমি নটরাজ থিয়েটারে ছিলাম। ম্যানেজার বলবে, অন্যান্য অ্যাক্টররা বলবে, প্রম্টার বলবে। সেদিন যারা আমার অভিনয় দেখেছে, সেই দর্শকরাও বলবে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। তবু কেন সন্দেহ যাচ্ছে না ঘনশ্যামের? আজ সকালেই সে পুলিশ ইন্সপেক্টর আয়েঙ্গারের সঙ্গে দেখা করেছিল। আয়েঙ্গারাও ঠিক এই বলেছেন। ঘনশ্যামকে তিনি জানিয়েছেন যে, প্রেমলতার অ্যালিবাইকে ধসিয়ে দেওয়া অসম্ভব। তবে? তবে কেন প্রেমলতাকে সন্দেহ করছে ঘনশ্যাম?

সে কি এই জন্যে যে, সে নিজেও সেদিন নটরাজ থিয়েটারে গিয়েছিল, এবং নায়িকার ভূমিকায় প্রেমলতার অভিনয় দেখে হতাশ হয়েছিল? একা ঘনশ্যাম কেন, আরও অনেকে সেদিন হতাশ হয়েছে। প্রেমলতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাঁর কণ্ঠ। সেই কণ্ঠ সেদিন অত ভাঙা ভাঙা শোনাচ্ছিল কেন? ঘনশ্যামের পাশের সীটে যিনি বসেছিলেন, তিনি বললেন, 'নিশ্চয় ঠাণ্ডা লেগেছে মশাই।'

হয়তো তাই। কিন্তু ঠাণ্ডা লাগা সত্ত্বেও প্রেমলতা মঞ্চে নামলেন কেন? জনপ্রিয়তা নষ্ট হবার ভয়ে নামকরা অভিনেত্রীরা এসব ক্ষেত্রে মঞ্চে নামেন না; আণ্ডারস্টাডি দিয়েই কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। প্রেমলতা কি তা জানেন না? নিশ্চয় জানেন। জেনেও তিনি ভাঙা গলায় মঞ্চে নেমেছিলেন কেন? এই নিয়ে যদি ঘনশ্যামের চিত্তে একটু অস্বস্তি দেখা দিয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

পরদিন সকালে সেই অস্বস্তিই হঠাৎ সন্দেহে রূপান্তরিত হল, কাগজ খুলে ঘনশ্যাম যখন জানতে পারল যে, সেঞ্চুরি থিয়েটারের মালিক রতনলাল তার হোটেলের কামরায় খুন হয়েছে। প্রেমলতা, মাত্র কয়েক মাস আগেও, ছিলেন সেঞ্চুরি থিয়েটারের হিরোইন। শুধুই থিয়েটারের নয়, তার মালিকেরও। পরে, কামিনীকে যখন সেঞ্চুরির হিরোইন করা হয়, প্রেমলতা কি তাঁর অপমান ভুলতে পেরেছিলেন? প্রেমলতাকে সরিয়ে দিয়ে কামিনীকে হিরোইন করেছিল রতনলাল; এই অপরাধ কি তিনি ক্ষমা করতে পেরেছিলেন?

যদি না-পেরে থাকেন? না, ঘনশ্যামের সন্দেহ একেবারে অকারণ নয়। সন্দেহ আরও প্রবল হয়েছে ওই রুমালের কথা শুনে। রুমালের কোণে লেখা রয়েছে 'K'। আর তারই সূত্র ধরে পুলিশ গিয়ে কামিনীকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কামিনী কেন খুন করবে রতনলালকে? সাইডপার্টের অমর্যাদা থেকে তুলে এনে রতনলাল তাকে, প্রায় রাতারাতি, হিরোইন বানিয়ে দিয়েছিল। সেই রতনলালকে কেন খুন করবে কামিনী? কোন মোটিভই তো তার নেই। তাহলে? না,

'K' অক্ষরটার অর্থ নিশ্চয়ই 'কামিনী' নয়। অর্থ হয়তো 'কৃষ্ণা'। এবং প্রেমলতার নাম যে আসলে কৃষ্ণা, সে-কথা আর কেউ না জানুক, ঘনশ্যাম জানে।

প্রেমলতাই কি খুন করেছেন রতনলালকে? মোটিভটা খুবই পরিষ্কার, কিন্তু.....

কিন্তু মুশকিল বাঁধিয়েছে ওই অ্যালিবাই। এবং অ্যালিবাইটা যে দুর্ভেদ্য, ঘনশ্যামেরও তা স্বীকার না করে উপায় নেই। ডাক্তার বলছেন, রতনলাল খুন হয়েছে রাত সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে; খুব সম্ভব আটটা নাগাদ। এদিকে

অন্তত দশজন লোক হলফ করে বলতে রাজী আছে যে, সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে প্রেমলতা ছিলেন নটরাজ থিয়েটারে। ঘনশ্যাম নিজেও তার সাক্ষী। তবে?

দুটো উত্তর আছে এই প্রশ্নের, প্রেমলতার সামনে বসে নতুন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘনশ্যাম ভাবল। এক, প্রেমলতা রতনলালকে খুন করেন নি। দুই, নটরাজ থিয়েটারের ভাঙা ভাঙা গলায় যিনি সেদিন অভিনয় করেছিলেন, তাঁর চেহারা ঠিক প্রেমলতারই মতন, কিন্তু আসলে তিনি প্রেমলতা নন।

কোন্‌টা যে ঠিক উত্তর, কোনদিনই তা জানা যাবে না। হয়তো দ্বিতীয় উত্তরটাই ঠিক। কিন্তু নটরাজ থিয়েটারের ম্যানেজার তা স্বীকার করবে না। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীরাও না। তার কারণ, সেঞ্চুরি থিয়েটার তাদের শত্রু। তার মালিক রতনলালও তাদের বন্ধু ছিলেন না। সুতরাং সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হলফ করে তারা বলবে যে, সোমবার রাত্রি সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে প্রেমলতা সারাক্ষণ নটরাজ থিয়েটারেই ছিলেন। কথাটা হয়তো সত্য নয়। সেক্ষেত্রে তারা মিথ্যে সাক্ষ্য দেবে। প্রেমলতার অ্যালিবাইকে তারা ভাঙতে দেবে না।

অনেক রাত হয়েছে। আর এখানে বসে থাকা ঠিক নয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঘনশ্যাম। বলল, 'চলি।'

আর ঠিক তখনই আবার হেসে উঠলেন প্রেমলতা। হাসলে নাকি সবাইকেই খুব সুন্দর দেখায়। প্রেমলতাকে দেখালনা। ঘনশ্যাম দেখল, তাঁর চোখের তারায় আগুন জ্বলছে; বিদ্রূপে, ঘৃণায় তাঁর ঠোঁট দুটি বেঁকে গিয়েছে।

প্রেমলতা বললেন, 'বসুন ঘনশ্যামবাবু। সত্যি কথাটা তাহলে শুনেই যান।'

'বলুন।'

'রুমালটা আমারই।'

চমকে উঠে ঘনশ্যাম বলল, 'অর্থাৎ?'

'রতনলালকে আমিই খুন করেছি।'

'নটরাজ থিয়েটারে তাহলে কে সেদিন অভিনয় করল?'

'হেমলতা। আমার বোন।'

হো হো করে আবার হেসে উঠলেন প্রেমলতা। বললেন, 'আপনাকে সব খুলে বললাম। তার কারণ, আপনাদের সবাইকে যে আমি বোকা বানাতে পেরেছি, এই কথাটা আপনাদের না জানিয়ে আমি শান্তি পাচ্ছিলাম না। আর

তাছাড়া, সব জেনেও তো আমাকে ধরা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমার অ্যালিবাই কি আপনি ভাঙতে পারবেন? পারবেন না। আপনি যদি বলেন যে, নটরাজ থিয়েটারে সেদিন আমি অভিনয় করি নি, আমার বোন হেমলতা করেছে, তো সবাই আপনাকে পাগল বলবে। কী জানেন, অ্যালিবাই শুধু যে আমার আছে, তা নয়; হেমলতারও আছে। আমার হয়ে সবাই বলবে যে, আমিই সেদিন নটরাজ থিয়েটারে অভিনয় করেছিলাম। আর হেমলতার হয়ে অন্তত তিনজন লোক সাক্ষ্য দেবে যে, সেদিন রাত্রি সাতটা থেকে ন'টার মধ্যে সে জীবন কিশোরের বাড়িতে বসেছিল। জীবনকিশোরকে চেনেন তো? মুনলাইট স্টুডিয়োর মালিক। হেমলতার জন্যে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে তার আটকাবে না। শুধু জীবনকিশোর কেন, তার ড্রাইভার আর দরোয়ানও ওই একই সাক্ষ্য দেবে।'

বলতে বলতে আবার হো হো করে হেসে উঠলেন প্রেমলতা। তাঁর চোখের তারায় আগুন জ্বলতে লাগল; তাঁর ঠোঁট দুটি আবার ঘৃণায়, বিদ্রুপে বেঁকে

গেল। তিনি বললেন, 'রতনলাল আমাকে অপমান করেছিল; তাকে খুন করে সেই অপমানের আমি শোধ নিয়েছি। কিন্তু তা আপনারা প্রমাণ করতে পারবেন না, ঘনশ্যামবাবু; আমার অ্যালিবাই আপনারা ভাঙতে পারবেন না।'

চুপ করে সব শুনে যাচ্ছিল ঘনশ্যাম। প্রেমলতার কথা শেষ হবার পরে সেন্টার টেবিলের উপর থেকে সে তার সিগারেটের কৌটোটা তুলে নিল। তার ঢাকনা বন্ধ করল। তারপর, কৌটোটাকে পকেটে পুরে বলল, 'পারব।'

'কী করে পারবেন? আপনাকে যা বললাম, ভবিষ্যতে আর কারও কাছেই তা তো বলব না আমি। সবই তো আমি অস্বীকার করব।'

'তাতে কোন লাভ হবে না, প্রেমলতা দেবী।' শান্ত কিন্তু দৃঢ় গলায় ঘনশ্যাম বলল, 'আমার এই সিগারেটের কৌটোটা আসলে একটা মিনিয়েচার ডিক্টাফোন। আপনার প্রতিটি কথাই এর মধ্যে ধরা রইল। আপনার অ্যালিবাই ভাঙবার জন্যে আমাদের আর কিছু বলতে হবে না; যা বলবার এই যন্ত্রটাই বলবে। না, না, আপনি পালাবার চেষ্টা করবেন না। পুলিশ ইন্সপেক্টর আয়েঙ্গার এই হোটেলটাকে ঘিরে রেখেছেন; পালাবার কোন পথই তিনি রাখেন নি।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ঘনশ্যাম। বলল,'চলি!'

প্রেমলতা আর হাসছিলেন না।

আমি? অনিরুদ্ধ চমকে ওঠে।

মুর্গি খেকো মামদো

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

ছোটমামার সঙ্গে কোথাও গিয়ে বাড়ি ফেরার সময় রাত্তির হলেই ভূতের পাল্লায় পড়াটা যেন অনিবার্য। তাই সেবার পাশের গাঁয়ে ঝুলনপূর্ণিমার রাসের মেলায় যাবার জন্য ছোটমামা আমাকে খুব সাধাসাধি করলেও বেঁকে দাঁড়ালুম।

ছোটমামা আমাকে কলকাতার যাত্রা, সার্কাসের বাঘ সিংহ, প্রোফেসর ফুং চু-র ম্যাজিক আর নররাক্ষসের আস্ত মুগিভক্ষণের অনেক সব রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। তবু আমি গোঁ ধরে রইলুম। বললুম, "আমি কিছুতেই যাচ্ছি না ছোটমামা! তোমার যদি অত ইচ্ছে, তুমি একাই যাও।"

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে ছোটমামা বললেন, "প্রব্লেম কী জানিস পুঁটু? কথায় বলে, একা না বোকা। একা হলেই মানুষ কেন যেন বোকা বনে যায়। কিন্তু তুই কেন যেতে চাচ্ছিস না, খুলে বল্ তো শুনি?"

অগত্যা বললুম, "আমার ভয় করে।"

"ভয়? কিসের ভয়?"

"ভূতের।"

ছোটমামা খুব অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "তুই কী বলছিস পুঁটু? ভূতকে তুই ভয় পাস? তুই এত বোকা তা তো জানতুম না। ছ্যা ছ্যা! ভূতকে

তুই ভয় খাবি কী, ভূতই তো তোকে ভয় পাবে। ওরে বোকা। ভূতেরা মানুষকে ভয় পায় বলেই তো নিরিবিলি জায়গায় লুকিয়ে থাকে। তুই কি ভেবে দেখেছিস, কেন ভূতেরা পারতপক্ষে দিনের বেলা বেরোয় না? বেরুলেই যে মানুষের সামনে পড়ে যাবে। তাই ওরা রাতবিরেতে বেরোয়। হ্যাঁ, 'ঠিক দুক্কুর বেলা, ভূতে মারে ঢেলা।' তার মানে, দুপুর বেলায় ভূতেরা টুপটুপ করে ঢিল ছোঁড়ে বটে, কিন্তু সামনে আসে না। গাছপালার আড়াল থেকেই ঢিলগুলো ছোঁড়ে। তা হলে ভেবে দ্যাখ—"

ছোটমামার কথার ওপর বলে দিলুম, "ও তুমি যতোই বলো, আমি যাচ্ছি না।"

হঠাৎ ছোটমামা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, "ঠিক আছে। আজ আমরা মোনাদার বাড়ি যাই।"

এতে অবশ্যি আপত্তি করলুম না। ছোটমামার 'মোনাদা' হল মোনা ওঝা। কেউ কেউ তাকে মোনা বুজরুকও বলে। সে থাকে আমাদের গাঁয়ের শেষ দিকটায় গঙ্গার ধরে পুরনো শিব-মন্দিরের কাছে। মাথায় সাধুবাবাদের মতো চুড়োবাঁধা জটা। মুখ ভর্তি গোঁফ দাড়ি। কপালে লাল তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। বাঁ হাঁতের কবজিতে একটা তামার বালাও দেখেছি। সবসময় গাঁজা ভাঙের নেশায় তার চোখ দুটো টকটকে লাল হয়ে থাকে।

কিন্তু চেহারা যতই ভয় জাগানো হোক, স্বভাবে বেশ অমায়িক আর হাসিখুশি মানুষ মোনা। ওপর পাটির দুটো দাঁত নেই বলেই যেন তার হাসি দেখলে হাসি পায়।

মোনা ওঝা থাকে মন্দিরের পেছনে একটা ভাঙাচোরা ঘরে। সেখানে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ আছে। নিরিবিলি সুন্‌সান জায়গা। নেহাত সময়টা বিকেল। তা না হলে ছোটমামার সঙ্গে এমন জায়গায় কিছুতেই আসতুম না।

ছোটমামা ডাকলেন, "মোনাদা আছ নাকি? ও মোনাদা!"

মোনা ওঝা বটগাছের দিক থেকে সাড়া দিল, "কে ডাকে গো এমন অবেলায়?"

ছোটমামা মুখে রহস্য ফুটিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "গোপনে তন্ত্রসাধনা করছে, বুঝলি পুঁটু? ওকে এসময় ডিসটার্ব করাটা রিস্কি।"

কিন্তু তখনই বটগাছের আড়াল থেকে মোনা ওঝা বেরুল। তার হাতে

একটা মড়ার খুলি দেখে এবার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ছোটমামা কাঁচুমাঁচু মুখে বললেন, "কিছু মনে কোরো না মোনাদা। এই পুঁটুটার জন্য তোমার কাছে আসতে হল।"

মোনা ওঝা আমার দিকে লাল চোখে তাকিয়েই ফিক করে হাসল। অমনি আমার ভয়টা কেটে গেল। ওপর পাটির দুটো দাঁত না থাকায় তা হাসিটা সত্যিই হাসিয়ে ছাড়ে। ছোটমামা আমাকে ইশারায় হাসতে বারণ করলে কী হবে?

মোনা ওঝা বলল, "ব্যস! ব্যস! পুঁটুবাবুর ওপর যে পেত্নীটার নজর লেগেছিল, সে পালিয়ে গেল। ওই দ্যাখো, যাচ্ছে!" সে মড়ার খুলিসুদ্ধ হাতটা তুলে দূরে স্কুলবাড়ির দিকটা দেখাল। " পেত্নীটা থাকে ইস্কুলের পেছনে ওই তালগাছের ডগায়। দ্যাখো, তালপাতাগুলো কেমন নড়ছে। দেখতে পাচ্ছ তো?"

আমি তেমন কিছু দেখতে পেলুম না। কিন্তু ছোটমামা দেখে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, নড়ছে বটে। তবে মোনাদা, এর একটা স্থায়ী প্রতিকার করো। পেত্নীটার নজর লাগার জন্যই পুঁটু রাতবিরেতে বড্ড ভয় পায়।"

মোনা ওঝা বলল, "একটাকা দক্ষিণে লাগবে ছোটবাবু!"

পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ছোট মামা বললেন, "এই নাও। কিন্তু মোনাদা, একেবারে স্থায়ী প্রতিকার চাই। পুঁটু যেন আর রাতবিরেতে আমার সঙ্গে বেরিয়ে একটুও ভয় না পায়।"

টাকাটা নিয়ে চুড়োবাঁধা জটার ভেতর গুঁজে মোনা ওঝা বলল, "তাহলে বরঞ্চ তুমিই এই মন্তরটা শিখে নাও ছোটবাবু! ও ছোট ছেলে। ঠিক মতো মন্তরটা বলতে না পারলেই কেলেংকারি। নাও, মুখস্থ করো ঃ

ভূত-পেত্নী ভূতুম
দেখাং যদি পেতুম
ধরেং ধরেং খেতুম॥"

ছোটমামা মন্তরটা আওড়ালেন। বারকতক ট্রেনিংয়ের পর মোনা ওঝা বলল, "ব্যস! ব্যস! ঠিক আছে। এবার যেখানে ইচ্ছে যত রাত্তির হোক, ঘোরো। পুঁটুবাবু! নির্ভয়ে চলে যাও মামাবাবুর সঙ্গে। যেখানে খুশি, যখন

খুশি। সন্ধে কি নিশুতি, শ্মশান কি মশান, বনবাদাড় কি কি পাহাড়-পর্বত, মাঠ কি ঘাট, নদী কি বিল, কাঁহা কাঁহা মুল্লুক বুক ফুলিয়ে ঘোরো!''....

শ্রাবণ মাসের ঝুলনপূর্ণিমার দিন বৃষ্টিবাদলা হওয়াই নাকি নিয়ম। এবারকার দিনটি সন্ধ্যাঅব্দি তেমন কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। আকাশ ছিল সাফসুতরো ঝকঝকে নীল। তাই রাসের মেলায় ভিড় জমেছিল বড্ড বেশি। কলকাতার যাত্রা শেষ হতে রাত নটা বেজে গেল। আকাশে তখন ঝলমলে নিখুঁত গোল চাঁদ। আমরা ঢুকলুম নররাক্ষসের তাঁবুতে জ্যান্ত মুর্গি-ভক্ষণ দেখতে। কারণ সার্কাস আর ম্যাজিক দুই তাঁবুতেই নাইট শোয়ের টিকিট কাটার কিউটা বেজায় লম্বা।

কিন্তু ভয়ংকর চেহারার নররাক্ষস যেই হাঁউ মাঁউ খাঁউ বিকট, গর্জন করে মুর্গির খাঁচা খুলতে গেছে, অমনি কড় কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ার শব্দ কানে তালা ধরিয়ে দিল। নররাক্ষস আচমকা হকচকিয়ে গিয়েছিল হয় তো। তা না হলে ওর হাতছাড়া হয়ে মুর্গিটা দর্শকের ভিড়ে এসে পড়বে কেন?

তারপর শুরু হয়ে গেল একটা হইহট্টগোল। লোকের গায়ের ওপর জ্যান্ত মুর্গি পড়াটা খুব অস্বস্তিকর ব্যাপার। সেই সঙ্গে তাঁবুটাও দমকা বাতাস আর

বৃষ্টির দাপটে প্রায় ছিঁড়ে পড়ার অবস্থা। সবাই প্রাণ এবং মাথা বাঁচাতে তাঁবু ফর্দাফাঁই করে বেরুতে থাকল। আবার বাজ পড়ার শব্দ এবং চোখ ধাঁধানো আলো। ছোট মামাকে জড়িয়ে ধরেছিলুম ভাগ্যিস! নৈলে এই এই হুলুস্থুলের ভেতর যে তাঁর আর পাত্তা পাওয়া যেত না, সেটা আমি ভালই জানি। টের পেলুম, ছোটমামা সামনে কোনও জিনিসে ঢুঁ দেওয়ার পর সেখানটা ফাঁক হল। তখন বেরিয়ে পড়লেন। আমিও ওঁর প্যান্টের বেল্ট আঁকড়ে ধরে বাইরে চলে গেলুম।

ঝোড়োহাওয়া আর বৃষ্টিতে মেলার আলোগুলো দুলছিল। হঠাৎ একসঙ্গে সবগুলো নিভে গেল। গত গাজনের মেলাতেও এমনটি হয়েছিল। কালবোশেখির ঝড়বৃষ্টিতে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে সে এক সাংঘাতিক অবস্থা। এখন ঝুলনপূর্ণিমার রাতের ঝলমলে মেলাকে ভণ্ডুল করে দিল তেমনি একটা দুর্যোগ। প্রাকৃতিক বিদ্যুতের ঝিলিকে চারদিকে মানুষজনকে ছুটোছুটি করে বেড়াতে দেখলুম। ছোটমামা বললেন, "ট্রান্সফর্মারে বাজ পড়েছে মনে হচ্ছে! চল্ পুঁটু, আমরা বরং গাঁয়ের ভেতর কোনও বাড়িতে আশ্রয় নিই। বড্ড বেশি ভিজে যাচ্ছি।"

মেলা বসেছিল গাঁয়ের বাইরে খেলার মাঠে। পিচ রাস্তা ডিঙিয়ে গিয়ে সামনে একটা বাড়ির বারান্দা দেখতে পেলুম। বারান্দায় উঠে এতক্ষণে ছোটমামার বেল্ট ছেড়ে দিলুম। তারপর সেই আবছা আঁধারে কোঁ কোঁ শব্দ শুনে চমকে উঠলুম। "ও কিসের শব্দ ছোটমামা?"

ছোটমামা খিকখিক করে হেসে বললেন, "সেই নররাক্ষসের মুর্গিটা। বুঝলি পুঁটু? ওটা ধরে এনেছি।"

আঁতকে উঠে বললুম, "ও ছোটমামা! নররাক্ষসটা যদি মুর্গির খোঁজে এখানে চলে আসে?"

"আসবে না।" বলে ছোটমামা মুর্গিটার পিঠে হাত বুলিয়ে তাকে চুপ করাতে ব্যস্ত হলেন।

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। বললুম, "না, ছোটমামা! মুর্গিটা ছেড়ে দাও।"

"তোর মাথা খারাপ? আজকাল একটা মুর্গির দাম কত জানিস? এই মুর্গিটা যখন প্রাণে বেঁচে গেছে, একে বাঁচিয়ে রাখাই উচিত।" ছোটমামা গদগদভাবে বললেন। "বুঝতে চেষ্টা কর পুঁটু! মুর্গিটা ডিম পাড়বে। একগাদা ছানা হবে। সেগুলো বড় হয়ে ডিম পাড়বে। এমনি করে রীতিমতো একটা পোলট্রি হয়ে

যাবে। তাই না? একেই বলে বিনি ক্যাপিটালে বিজনেস! আমরা বিজনেসম্যান হব। বুঝলি তো?"

বুঝলুম বটে, কিন্তু অস্বস্তিটা গেল না। খালি মনে হচ্ছিল, নররাক্ষসটা যদি মুর্গির গন্ধে গন্ধে এখানে এসে পড়ে, মোনা ওঝার মন্তর দিয়ে কি ওকে ঠেকানো যাবে? ও তো ভূত নয়, রাক্ষস।

কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেল। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আবার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটল। আমরা বাড়ির পথ ধরলুম খোয়া বিছানো পথ বলে কাদা নেই। ছোটমামা মুর্গিটা বুকের কাছে যত্ন করে ধরে গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছেন। খোলামেলা মাঠের মাঝামাঝি একটা খালপোল। সেখানে কালো হয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে দেখে চাপা স্বরে বললুম, "ও ছোটমামা! সেই নররাক্ষসটা নয় তো?"

ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বললেন, " কে ওখানে?"

পাল্টা চ্যালেঞ্জ শোনা গেল, "তোমরাই বা কে হে?"

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, "আমরা যেই হই। তুমি ভূতের মতো ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ?"

"কী বললে? কী বললে? ভূতের মতো দাঁড়িয়ে আছি?"

"হ্যাঁ। তা-ই তো আছ।"

"আমি ভূতের ম-তো দাঁড়িয়ে আছি? মানে, তুমি 'মতো' বলছ?"

"মতো' বলছি ভদ্রতা করে। নৈলে—"

কালো মূর্তিটা ছোটমামার কথার ওপর বলে উঠল, "নৈলে?"

"নৈলে ভূতই বলতুম।"

"যাক গে! ভদ্রতার দরকার নেই। তুমি তা-ই বলো। 'মতো' শুনে-শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। 'মতো' কেন বলবে? মানুষকে 'মানুষের মতো' বলাটা অপমান নয়? যে যা, তাকে তা-ই বলা উচিত।"

ছোটমামা হেসে ফেললেন "যা বাব্বা! তুমি কি ভূত নাকি যে ভূত বলব?"

"একশোবার বলবে।"

"কী আশ্চর্য! তুমি ভূত?'

"সেণ্ট পারসেণ্ট। একেবারে বিশুদ্ধ খাঁটি ভূত।"

ছোটমামার মেজাজ এই ভাল এই খারাপ। ফের রেগে গিয়ে বললেন, "তুমি যদি খাঁটি ভূত, তা হলে প্রমাণ দাও।"

"কী প্রমাণ চাও বলো!"

"তুমি অদৃশ্য হও।"

"সেটাই তো হয়েছে প্রব্লেম রে ভাই!"

ভূতের দীর্ঘশ্বাস পড়ল। চোটমামা বললেন, "কী প্রব্লেম?"

"অদৃশ্য হতে পারছি না। মাঝে মাঝে এটা হয়, বুঝেছ? আসলে টাটকা ভূত তো। তাই অনেক কষ্ট করে যদি বা রূপ ধরতে পারি, ঝটপট অদৃশ্য হতে পারি নে। ট্রেনিংয়ের জন্য টিচার খুঁজে বেড়াচ্ছি। পাচ্ছিনে। শুনেছিলম এই খালপোলে এক মামদো থাকে। সে নাকি উইকের ক্র্যাশকোর্সে ঝটপট ভ্যানিশ হওয়া শেখায়। কিন্তু কোথায় সে? তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি।"

ছোটমামার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলুম। ফিসফিস করে বললুম, "সেই মন্তরটা, ছোট মামা!"

ছোটমামা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলেন। বললেন, "হ্যাঁ। শোনো হে ভূতচন্দর! তোমাকে এক্ষুনি ভ্যানিশ করে দিচ্ছি।

ভূত-পেত্নী ভূতুম
দেখ্যাং যদি পেতুম
ধরেং ধরেং খেতুম॥"

ভূতটা অমনি ডিগবাজি খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছোটমামা খিকখিক করে খুব হেসে বললেন, "আয় পুটু! বলেছিলুম না মোনাদার ক্ষমতার তুলনা হয় না?"

সেই সময় খালপোলের তলার দিক থেকে কেউ হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, "কি হে ছোকরা আমার হবু ট্রেনিকে ভাগিয়ে দিলে? কবরখানায় ট্রেনিং দিয়ে এসে সবে দুমুঠো খেতে বসেছি, আর তুমি কি না—রোসো! দেখাচ্ছি মজা!"

খালপোলের ও-মাথায় আবার একটা কালো মূর্তি দেখা গেল। এই মূর্তিটা বেশ মোটাসোটা। ছোটমামা সেই মন্তরটা পড়তে যাচ্ছেন, সে খ্যাঁ খ্যাঁ করে

অদ্ভুত হেসে বলল, "মোনা বুজরুকের মন্তরে কাজ হবে না হে ছোকরা। আমি যে-সে ভূত নই, মামদো।"

ছোটমামা খুব হাঁক ডাক করে মন্তরটা আওড়ালেন। কিন্তু মামদোর কিছু হল না। সে তেমনি বিকট খ্যাঁ খ্যাঁ করে হাসতে থাকল। তখন ফিসফিস করে বললুম, "ছোটমামা! ওকে বরং মুর্গিটা দিয়ে দাও।"

ছোটমামা চটে গিয়ে বললেন, "দিচ্ছি মুর্গি!"

মামদোর কানে যেতেই সে কয়েক পা এগিয়ে এল। "মুর্গি দিচ্ছ তুমি? বাঃ! তুমি তো তাহলে বড় ভাল। দাও, দাও! আহা! কতদিন মুর্গি খাইনি!"

ছোটামামা চেঁচামেচি করে বললেন "দেব না।"

মামদো এক-পা করে এগিয়ে এল। তারপর লম্ফঝম্ফ নাচের সঙ্গে ঘ্যানঘেনে গলায় গাইতে লাগল,

"কেত্তা রোজ বাদ্ মুর্গা খায়েগা হ্যম
সুরুয়া পিয়েগা হ্যম
হ্যড্ডি খায়েগা হ্যম॥
কুড়মুড়াকে মুড়মুড়াকে
হ্যড্ডি খায়েগা হ্যম !!"

নাচের চোটে কাঠের পোল মচ মচ করে কাঁপতে থাকল। সে নাচতে নাচতে কাছে আসতেই ছোটমামা মুর্গিটা খালের দিকে ছুঁড়ে ফেললেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, মুর্গিটা কোঁ কোঁ করতে করতে ডানা মেলে উড়ে গেল!

আর মামদোও জ্যোৎস্না ভরা মাঠে মুর্গি ধরতে দৌড়ুল। ছোটমামা পা বাড়িয়ে বললেন, "পালিয়ে আয়, পুঁটু!"

দুজনে দৌড়ুতে শুরু করলুম। অনেকটা দৌড়ুনোর পর থেমে গিয়ে ছোটমামা বললেন "মামদো যতই চেষ্টা করুক, নররাক্ষসের মুর্গি ধরতে পারবে না। তবে বলা যায় না, এতক্ষণ হয় তো নররাক্ষসও তার মুর্গির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। তা যদি পড়ে, বুঝলি পুঁটু? একখানা দেখবার মতো ডুয়েল হবে বটে। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে মুর্গিটা ধরে এনেছিলুম। নৈলে মামদো আজ কেলেংকারি করে ছাড়ত।"

ছোটমামা খিক খিক করে হাসতে লাগলেন।

বললুম, "আর এখানে নয় ছোটমামা! শিগগির বাড়ি চলো।"—

রক্তমন্দিরের রত্নরশ্মি

অদ্রীশ বর্ধন

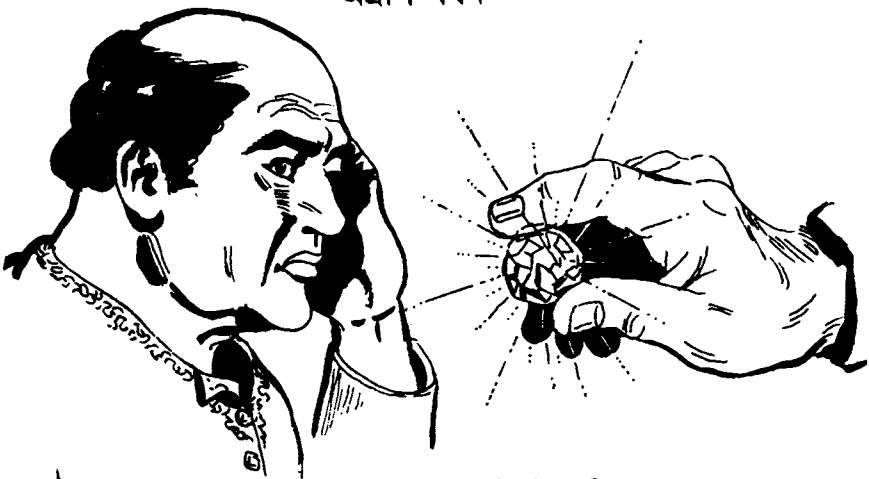

রাত আটটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের গলি দিয়ে বীরেন গাঙ্গুলি রোডে এসে দাঁড়াল লোকটা। বেশি বয়স নয়, অথচ হাতে রয়েছে একটা বেতের ছড়ি। হাতলটা রুপোর, গোল বলের মতো।

বাড়ি ফেরার হিড়িক শুরু হয়েছে আশপাশের দোকানে। জিনিস গুছোচ্ছে ফুটপাতের ফেরিওয়ালারা।

চৈত্র মাস। বেশ গরম পড়েছে। লোকটা তাই কলারওয়ালা নীল রঙের বাহারি গেঞ্জিটার গলা খুলে রেখেছে। ঝুলিয়ে পরেছে ব্লু জিনস্-এর প্যান্টের ওপর। মোজা ছাড়াই পরেছে সাদা ফোম-রবারের জুতো। হাঁটছে হনহনিয়ে। মাঝে মাঝে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে দু'পাশের দোকানের কাচের শোকেসে। কিন্তু থামছে না।

থামল নিউ রোড আর বীরেন গাঙ্গুলি রোডের মোড়ে। জহরতের দোকানের সামনে বিরাট সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, ক্যালকাটা ডায়মন্ড এক্সচেঞ্জ।

হিরে কেনাবেচার এতবড় দোকান কলকাতায় আর দুটি নেই।

লোকটা দাড়িয়েছে কাচের শোকেসের ঠিক সামনে। ঝট করে দেখে নিল আশপাশে, তারপরেই হাতের ছড়ির গোল হাতল দিয়ে ধাঁই করে মারল কাচের শোকেসে।

ঝনঝন শব্দে কাচ খানখান হচ্ছে, একই সঙ্গে তখন বিপদসঙ্কেত ঘন্টাও বেজে উঠেছে। এদিকে-ওদিকে লোক দাড়িয়ে গেছে। তারা থ।

লোকটা কিন্তু হাত গলিয়ে দিয়েছে ভাঙা শোকেসের মধ্যে।

পেছন ফিরে পালাতে গিয়েই পেল বাধা। মোড় ঘুরে তেড়ে আসছে ট্রাফিক সার্জেন্ট। কোমরের খাপ থেকে টেনে বার করেছে রিভলবার। চেঁচিয়ে উঠেছে পেছনে এসেই।

ঘুরে দাড়াল হিরে চোর। সার্জেন্টের মাথা টিপ করে চালাল ছড়ির হাতল।

গরমের জন্য হেলমেট খুলে রেখেছিল সার্জেন্ট। ভারী হাতলটা পড়ল রগের ওপর। চোখের সামনে দেখল আলোর ঝলকানি। চোট লেগেছে ব্রেনে। লুটিয়ে পড়ল ফুটপাথে।

দোকানের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে মস্ত চেহারার এক পুরুষমূর্তি। পরনে সাদা কুর্তা আর পায়জামা। চেঁচাচ্ছে গলার শির তুলে, " চোর! চোর!"

হিরে চোর ততক্ষণে পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছে। দৌড়চ্ছে পাকা দৌড়বাজের মতো, এখনই উধাও হয়ে যাবে গলিঘুঁজির মধ্যে। এই গলির মুখেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল একদল লোক। এদের মধ্যে থেকে ছিটকে গেল একটি ছেলে। বয়স খুব জোর পঁচিশ। গায়ে জিনসের জ্যাকেট আর প্যান্ট। এর পায়ে যেন ডানা লাগানো আছে। নাগাল ধরে ফেলল হিরেচোরের। দু'জনেই গড়িয়ে গেল রাস্তার ওপর।

এই সময় ছড়ির হাতল নেমে এসেছিল ছেলেটার মাথা টিপ করে। বজ্র আলিঙ্গন একটু শিথিল হয়েছিল এই কারণেই। সড়াত করে পিছলে গিয়ে ফের টেনে দৌড় লাগিয়েছিল হিরে চোর। ততক্ষণে হইহই করে তেড়ে এসেছে আরও অনেকে। সকলের আগে দু'জন ট্রাফিক পুলিশ।

একটাই কথা বলছিল হিরেচোর, " হিরে নেই আমার কাছে।"

না, হিরে পাওয়া যায়নি তার পকেটে। ভাঙা শোকেসের প্রায় সব হিরেই সে হাতিয়েছিল, চারটে হিরের আংটি আর দুটো ছোট-ছোট হিরে ছাড়া। হিরে নিয়েই তো সে দৌড়েছিল অত লোকের সামনে দিয়ে। তবে কি ঝটাপটি করার সময় হিরে চালান করেছে ছেলেটার পকেটে? কে না জানে, দোসর নিয়ে ঘোরে ছিনতাইবাজরা। বিপদ দেখলেই চোরাই জিনিসপত্র চালান করে সঙ্গীদের কাছে।

কিন্তু ছেলেটাকে সার্চ করেও পাওয়া গেল না হিরে, একই সঙ্গে দু'জনকে আনা হয়েছিল থানায়।

রুপোর হাতলওলা ছড়ির মধ্যে নেই তো?

না, সেখানেও নেই। একেবারেই নিরেট ছড়ি। রুপোর হাতলও নিরেট।

তবে কি রাস্তায় ঠিকরে পড়েছে? জনতা কুড়িয়ে নিয়েছে?

অসম্ভব। ট্রাফিক পুলিশ দু'জন সকলের আগে দৌড়চ্ছিল। রাস্তায় ছড়ানো হিরে লুট শুরু হলে হট্টগোলে তাদের টনক নড়ত।

রাস্তাতেও পড়ে নেই হিরে। তন্নতন্ন করে দেখার পরেও পাওয়া যায়নি।

দোকানের দরজায় দাড়িয়ে যিনি 'চোর, চোর' বলে চেঁচিয়েছিলেন, তিনিই জহরতের দোকানের খোদ মালিক। সেই রাতে থানায় তিনিও গিয়েছিলেন।

বলেছিলেন, "আটটা বাজতেই রোলিং শাটার নামিয়েছি আমি নিজে। তারপরেই শোকেস থেকে হিরেগুলো তুলে ভল্টে রাখবার জন্য যেই ঘুরেছি, অমনই ভাঙল কাচ।"

বড়বাবু বলেছিলেন, "কত টাকার হিরে গেল?"

" আন্দাজ হিসেবে এক কোটি টাকার তো হবেই। ঝামেলা হবে হিরের বকলেসটা নিয়ে।"

"হিরের বকলেস!"

"আজ্ঞে। কুকুর পোষার শখ ছিল ময়নাগড়ের মহারাজার। সেরা কুকুরকে হিরের বকলেস পরিয়ে রাখতেন। রাজত্ব গেছে—তাঁর ছেলে ঠাটবাট বজায় রাখবার জন্য বকলেসটা এনেছিল বেচবার জন্যে। আমি বলেছিলাম, রেখে যান। বিক্রি হলে দাম পাবেন, আমাকে কমিশন দেবেন। ছোকরা তো এখন আমাকে ছাড়বে না। যেভাবেই পারেন, হিরে উদ্ধার করে দিন।"

মাথা চুলকে বড়বাবু বলেছিলেন, " কিন্তু অত হিরে গেল কোথায়?"

"নিশ্চয় হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি," পরের দিন সকালে ইন্দ্রনাথের বৈঠকখানায় বসে বললেন খোদ মালিক, যাঁর নামের মধ্যেও রয়েছে জহরতের গন্ধ।

নাম তাঁর জহর দাশ। দিব্যি পেটাই চেহারা। লম্বায় ছ'ফুট তো বটেই। গায়ের রং আর ফেসকাটিং সাহেবদের মতো। খালি যা মাথাজোড়া বিশাল টাক।

যে বাঙালি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, ইন্দ্রনাথ তাকে একটু বেশি খাতির করে।

জহর দাশের হিরের বোতাম, অর্গান্ডির পাঞ্জাবি আর চুনোট করা কোঁচার দিকে তাকিয়ে তাই বলেছিল, "ফাইন! আপনার রুচি আছে।"

"তা আছে। অনেক কিছুর। দেখতে যদি চান, বাড়ি আসুন। আপনার সেই লেখক বন্ধুকেও নিয়ে আসুন। কিন্তু ভাই, বকলেসটাকেও উদ্ধার করে দিন। পুলিশ দিয়ে হবে না। অত হিরে কি ভ্যানিশড হয়ে গেল? হোপলেস! সামান্য এই রহস্যের সমাধান করতে পারছে না। তাই দৌড়ে এলাম। প্লিজ হেল্প।"

হিরে চুরির কাহিনী শুনে ইন্দ্রনাথ নিজেও মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিল। কিন্তু জহর দাশকে তো আর তা বলা যায় না।

তাই বলেছিল, "ভাবতে সময় দিন।"

"তা হলে চলুন, আমার বাড়িতে চলুন, মাথা সাফ হয়ে যাবে।"

ইন্দ্রনাথ আমাকে বালিগঞ্জ থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল জহর দাশের পেল্লায় গাড়িতেই। তিনি থাকেন আহিরিটোলার একটা বিরাট বাড়িতে। রাজবাড়ি বললেই চলে।

বৈঠকখানায় বসে আগে নিজের কাহিনী ফলাও করে বললেন জহর দাশ। হিরে কেনাবেচা সূত্রে পৃথিবীভ্রমণ তাঁর কাছে টালা থেকে টালিগঞ্জ যাওয়ার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইতো সেদিন ঘুরে এলেন সাউথ আমেরিকা। ভেনেজুয়েলার এক কিউরেটরের কাছ থেকে কিনলেন একটা রক্তমুখী নীলা।

"রক্তমুখী নীলা!" মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলাম আমি, " সে তো সর্বনেশে নীলা।"

"আজ্ঞে," টাকে হাত বুলোতে বুলোতে অবজ্ঞার সুরে বললেন জহর দাশ, খুবই সর্বনেশে। যা শুনে কিনলাম তা যদি সত্যি হয় তা হলে সাঙ্ঘাতিক সর্বনেশে।"

"কী শুনে কিনলেন?"

" আজটেকদের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?"

" শুনব না কেন?" আহত কণ্ঠে বলেছিলাম, "স্প্যানিয়ার্ডদের হামলার আগে মেক্সিকোয় যারা সবচেয়ে প্রবল জাত ছিল।"

" রাগ করলেন?"

" না, করিনি।"

" তা হলে শুনুন। আজটেকদের বিশ্বাস ছিল, সূর্য নাকি রোজ রাতে মরে যায়—নররক্ত না পেলে পরের দিন সকালে ওঠে না। তাই বছরে ১৫,০০০

নরবলি দিত রক্তলোলুপ সূর্যদেবতাকে ঠান্ডা রাখার জন্য। বেশির ভাগ যুদ্ধ বন্দি। আমি এই মন্দিরগুলোর কি নাম দিয়েছি জানেন? রক্তমন্দির। কী বুঝলেন?"

"রক্তমন্দিরে রোজ নরবলি হত।"

"রাইট। একটা মন্দিরের সূর্যদেবতার রক্তের তেষ্টা ছিল নাকি সবচেয়ে বেশি। যতক্ষণ না তেষ্টা মিটত, ততক্ষণ জ্বলজ্বল করত না একটা রক্তমুখী নীলা। তেষ্টা মিটলেই দপদপ করে দুবার ভেতরে জ্বলে উঠত লালরশ্মি। তেষ্টা পাওয়ার আগে জ্বলত একবার।"

"অদ্ভুত গল্প! কেউ দেখেছে?"

"হা হা! আমিও দেখিনি, তবে কিউরেটর যখন বলল, সেই মন্দিরের রক্তলোভী নীলা তার দখলে এসেছে, তখন কিনেই ফেললাম।"

"সঙ্গে নিয়ে এলেন? কাস্টম্‌স কিছু বলল না?" ভেতরের রাগ কথার মধ্যে গোপন রাখতে পারিনি। ভদ্রলোক ভয়ানক সবজান্তা।

আর একদফা অট্টহেসে জহর দাশ সামনের নিচু টেবিল থেকে মস্ত একটা টোবাকো পাইপ তুলে নিয়ে বললেন, " এর মধ্যে ছিল রক্তমুখী নীলা। জানতেই পারেনি।"

পাইপ ভক্ত ইন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়ে বলল, " দিন তো দেখি! কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?"

" এই তো এইখানে," বলেই, পাইপের যে ফোকরে তামাক ঠাসা হয়, সেটা পেঁচিয়ে খুলে ফেললেন জহর দাশ। খুলে এল কিন্তু আধখানা, বাকি আধখানা রয়েছে ছোট্ট একটা গর্ত, আধ ইঞ্চির মতো ব্যাস। বললেন মুচকি হেসে, " দামি পাথর আনতেই হয়, কী আর করি বলুন, রক্তমুখী নীলা এসেছিল এর ভেতরে।"

" এখন তিনি কোথায়?"

" রক্তমুখী নীলা? দেখতে সাধ হচ্ছে? চলুন। আমার রুচির কথা বলছিলাম না? এইটাই সেই রুচি, চলুন।"

দেখেছিলাম আশ্চর্য মৎস্যাধার। মোটা কাচের বিশাল চৌবাচ্চা। তার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে বড়-বড় রঙিন মাছ। তাদের অনেকের চোখের পাতা উঠছে আর নামছে। চোখ জ্বলছে ওপর থেকে ফোকাস করা সারি-সারি আলোয়।

" কী বুঝলেন?" জহর দাশের এই এক সবজান্তা উক্তি। হাড় জ্বলে যায়। চুপ করে রইলাম।

ইন্দ্রনাথ কিন্তু তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিল। বলল—" কলের মাছ আনিয়েছেন জাপান থেকে?"

" এই না হলে স্যার ইন্দ্রনাথ!" চোখ নাচালেন জহর দাশ। নিজেও যেন একটু নেচে নিলেন, "ধরলেন কী করে?"

"মাছের কি চোখ পিটপিট করে? করে না। রিমোট কন্ট্রোলার নিশ্চয় আপনার পকেটেই আছে। হাতটা কাইন্ডলি বের করবেন?"

" হা হা হা! ঠিক ধরেছেন। লেখক বন্ধু কিন্তু ধরতে পারেননি, " বলতে-বলতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে হাত বের করে রিমোট কন্ট্রোলারটা দেখালেন জহর দাশ।

"সাবাশ!" ইন্দ্রনাথের কথা যেন এখন নেচে নেচে ছুটছে, " এবারের ধাঁধাঁ ঃ জ্যান্ত মাছের ভিড়ে কলের মাছ কেন? আপনার এক নম্বর পরীক্ষায় যখন পাশ করেছি, দু'নম্বর পরীক্ষার রেজাল্টও বলে দিচ্ছি; কলের মাছেদের চোখে মণি বসিয়ে রেখেছেন। কিন্তু কেন?"

" সরেস ব্রেন আপনার। ঠিক জায়গায় ঘা মেরেছেন। খুব দামি রত্ন খুব বেশি লুকিয়ে রাখতে নেই, রাখতে হয় চোখের সামনে, তাই আনিয়েছি কলের মাছ।"

" রক্তমুখী নীলা কার চোখে?"

" আয়...আয়...আয়!" বলতে বলতে রিমোট টিপে গেলেন জহর দাশ। লেজ নেড়ে নেড়ে কাচের ওদিকে এসে গেল প্রায় আধহাত লম্বা একটা রামধনু-রঙিন মাছ—ওর একটা চোখে পীত পোখরাজ, আর একটা চোখে রক্তমুখী নীলা। —যাঃ! লেজের ঝাপটা মেরে দূরে ছিটকে গেল কলের মাছ।

আমার দিকে তাকিয়ে বিচ্ছিরি হাসলেন জহরত ব্যবসায়ী, " লেখক বন্ধুকে আমার আর একটা রুচির কথাবলে রাখি। —শুনেছেন?"

" হ্যাঁ, শুনছি," বলতেই হল আমাকে।

" আমিও লেখক।"

" তাই নাকি।"

" তবে আপনার মতো লেখা ছাপিয়ে বেড়াই না। জমিয়ে রাখছি, সেরা লেখাটা যে ছাই এখনও লেখা হল না, কোথায় বসে লিখব জানেন? জেলখানায়।...."

"জেলখানায় বসে লিখবেন?"

"আজ্ঞে। 'ডন কুইক্সোট' লেখা হয়েছিল জেলখানায়। সার ওয়াওটার রলে, ভলতেয়ার, ও হেনরি, বার্ট্রান্ড রাসেল—এঁরা সকলেই ভাল-ভাল লেখাগুলো কোথায় বসে লিখেছিলেন? জেলখানায়। হিটলার তাঁর আত্মজীবনী 'আমার সংগ্রাম'-এর প্রথম পর্ব কোথায় বসে ডিকটেট করেছিলেন? জেলখানায়, জওহরলাল নেহেরুও উত্তম গ্রন্থ রচনা করেছেন জেলখানায়। হা হা! আমিও চাই আমার সেরা লেখা জেলখানায় বসে লিখতে।"

সারা মুখে উপহাসের হাসি ছড়িয়ে কথা শেষ করলেন জহর দাশ। এখনও তিনি হাত বুলোচ্ছেন রিমোট কন্ট্রোলারে। বাইরে গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল একটা কুকুর। একবার.... দু'বার.... তিনবার। তারপর সব চুপ।

চৌবাচ্চার দিক থেকে এতক্ষণ চোখ সরায়নি ইন্দ্রনাথ। এখন আচমকা বলল, "সত্যিই জেলখানায় যেতে চান?"

"সত্যি! মাথায় ব্যামো আছে ভাবছেন?...

"তা একটু আছে। নইলে নিজের হিরে এইভাবে কেউ লোপাট করে?"

"চোখ নাচালেন জহর দাশ, " তাই নাকি? কীভাবে করলাম, সার ইন্দ্রনাথ?"

"রোলিং শাটার নামানোর ঠিক আগে হিরের বকলেস সমেত আরও হিরে নিজেই সরিয়ে নিয়েছিলেন।

" বটে! বটে!"

"রেলিং শাটার যখন নামানো হয়েছে, তখন শোকেসের বেশিরভাগ হিরেই ছিল আপনার পকেটে। হিরেচোর শুধু কাচ ভেঙেছে, হাত গলিয়েছে, তারপর ছুটেছে। সে আপনার লোক। তাকে হিরে নিতে কেউ দেখেনি, আপনিই নাকি দেখেছেন। জহর দাশ, চোর আপনি নিজে—হিরের বকলেসের মালিককে বোকা বানাতে চেয়েছেন—তাই নিজের হিরেও কিছু সরিয়েছেন—হয়তো রেখেছেন কলের মাছেদের চোখের সকেটে, জেলখানায় যাওয়ার সাধ কি আছে এখনও?"

সে কী হাসি জহর দাশের, "কক্ষোনো না। সেরা লেখা মাথায় থাকুক। ওটা একটা সূত্র, দেখছিলাম, আপনার মগজ কতটা ধারালো। ইয়েস সার ইন্দ্রনাথ, সমস্ত হিরে রয়েছে কলের মাছেদের চোখে, আপনার চোখের সামনেই। হা হা হা!"

" রক্তমুখী নীলা দেখাতে ডেকে এনেছিলাম তো একই মতলবে— আমার সঙ্গে চোর পুলিশ খেলবার জন্য। ফলে জানলাম, কুকর্মে ঝোঁক রয়েছে আপনার। অভিনব পন্থায় হিরে চুরিই বা করবেন না কেন?"

" খেলছিলাম তো বটেই, এ বড় মজার খেলা! এ-যুগের বড়লোকি খেলা। আমার পূর্বপুরুষরা যদি বেড়ালের বিয়ে দিয়ে টাকা উড়িয়ে মজা করতে পারে, আমি আমারই হিরে চুরি করে মজা করতে পারি না? আলবাত পারি।"

" নিজের হিরে নিয়ে করতে পারেন, পরের হিরে নিয়ে নয়।"

" হিরের বকলেস? আপনিও পারেননি বের করতে, পারলেই ফেরত পাবেন।"

" কুকুর ডাকছে কোথায়?"

ফের চোখ নাচালেন জহর দাশ। নিজেও যেন নাচলেন— দেখবার সাধ হয়েছে? আসুন! আসুন! এই তো পাশের ঘরে।"

মৎস্যাধার কক্ষ থেকে বেরনোর আগে চৌবাচ্চার সেই নকল মাছটার দিকে ফিরে চেয়েছিলাম। আবার লেজ নাড়ছিল এদিককার কাঁচের গায়ে। রক্তমুখী নীলা চোখ ফেরান ছিল আমার দিকেই। মনে হল যেন, দপ করে লাল রশ্মি ঠিকরে এল নীলার ভেতর থেকে। চোখের ভুল নিশ্চয়। ভয়ের চোটে কিন্তু হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল আমার।

পাশের ঘরের এক কোণে দেখলাম বিশাল কুকুরটাকে। ছোট বাছুরের সাইজ। লকলক করছে জিভ। টপটপ করে ঝরছে লালা। ধক ধক করছে দুই চোখ।

পাগলা কুকুর নাকি? সভয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম চৌকাঠে। গলায় যখন শেকল নেই, ও-কুকুরের কাছে আমি যাচ্ছি না।

চমৎকৃত চোখে চেয়ে ছিল ইন্দ্রনাথ। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে হাত বুলিয়ে নিল কুকুরটার গলার চামড়ার বকলেস। বলল, " চামড়ার পাটির নীচেই রয়েছে হিরের বকলেস।"

ঠিক এই সময় বিকট হাঁক পাড়ল বিরাট কুকুর। চার দেওয়াল যেন চৌচির হয়ে গেল সেই ডাকে। বিরক্ত গলায় বলল ইন্দ্রনাথ, "কী মজা হচ্ছে? হাত সরান রিমোট থেকে।"

অপরাধী যন্ত্রটা পকেটে রেখে দু' হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন জহর দাশ,

"ব্রেন বটে আপনার! খেলে আরাম আছে আপনার সঙ্গে। কলের কুকুরকেও ধরে ফেললেন?"

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল ইন্দ্রনাথ, "এর জন্য ব্রেনের দরকার হয় না, চোর মহারাজ। কলের ডাইনোসর যখন তৈরি হচ্ছে, কুকুর কেন হবে না?"

"হো হো হো! হা হা হা! খুব রগুড়ে লোক মশাই আপনি, ইয়েস সার ইন্দ্রনাথ।"

"বাকি রগড় দেখাবেন জেলখানায়, সেরা লেখাটিও লিখবেন।"

"পাগল! পুলিশকে জানিয়ে দেবেন, সব হিরে পাওয়া গেছে। কীভাবে? সে একটা গল্প এই লেখক বন্ধু লিখে দেবেন' খন। আংটিগুলো? এই তো আমার ট্যাকে। আবার আসবেন। আরও বুদ্ধির খেলা আমি জানি। হা হা হা! হো হো হো! হি হি হি!"

শক্ত গলায় ইন্দ্রনাথ বলল, " জহর দাশ, রক্তমুখী নীলা বিদেয় করুন।"

"কেন, সার ইন্দ্রনাথ?"

"অভিশপ্ত পাথর আপনার মাথা খারাপ করে দিয়েছে।"

জহর দাশ দাঁত খিঁচোলেন এবং পকেটে হাত পুরলেন। কুকুরটা ডেকে উঠল এবং খচখচ করে তেড়ে এল, দুই চোখ দিয়ে ঠিকরে এল লেসার স্পার্ক।

আমরা পালিয়ে এলাম।

পার্বতীপুরের রাজকুমার

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পার্বতীপুর স্টেশনে নেমেই সুজয়ের গাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। দুচোখের কোণ জ্বালা করতে লাগলো একটু একটু আঙুলের ডগাও ভোঁতাভোঁতা লাগলো। জুন মাসের দুপুর, গনগন করছে রোদ, তাও সুজয়ের হঠাৎ শীত করতে লাগলো। জ্বর আসবার সময়ে এই রকম হয়।

স্টেশনটা ছোটখাট, অতি সাধারণ। বাবা ট্রেন থেকে মালপত্র নামাচ্ছেন, মা আর দিদি একপাশে দাঁড়িয়ে বাক্স প্যাটরা গুনছে। সুজয় একটু দূরে সরে গেল। ধ্যুৎ, বেড়াতে এসে জ্বর হবার কোনো মানে হয়—মা টের পেলেই বিছানায় শুইয়ে রাখবেন।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে ওরা উঠলো ওভারব্রীজে। মাঝামাঝি আসবার পর সুজয়ের মনে হলো ব্রীজটা কোথায় যেন ভাঙা। তক্ষুনি কুলিটি বললো, 'দেখবেন বাবু, সাবধান, সামনে দুটো কাঠ ভাঙা আছে।' সুজয় অবাক হয়ে গেল—ঐ কথাটা হঠাৎ তার মনে হল কেন? সে তো ভাঙা জায়গাটা দেখতে পায়নি। দুখানা তক্তা নেই সেখানে, কেউ অন্যমনস্ক থাকলে গলে নিচে পড়ে যেতে পারে।

স্টেশনের বাইরে একটিমাত্র নীল রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, আর কয়েকখানা সাইকেল রিক্সা।

বাবা বললেন, 'ঐ যে আমাদের জন্য গাড়ি পাঠিয়েছে।'

বাবার বন্ধু রঞ্জিতকাকুর মামাবাড়ি পার্বতীপুরে। রঞ্জিতকাকুর মামারা একসময়ে এখানকার জমিদার ছিলেন। এখন তো আর জমিদারি নেই, কিন্তু সেই আমলের একটা প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। বড় বড় দুটো দীঘি আর ফলের বাগান আছে। রঞ্জিতকাকু প্রায়ই পার্বতীপুরের এই বাড়ির গল্প করতেন তাই বাবা একদিন বলেছিলেন, 'ব্যবস্থা করে দাও না, আমরা ওখানে কিছুদিন থেকে আসি।'

রঞ্জিতকাকু বলেছিলেন, 'কোনোই অসুবিধে নেই'। তাঁর এক মামা এখনো সেখানে থাকেন। অন্য মামারা থাকেন কলকাতায়, গ্রামে আর আসতে চান না। কিন্তু তাঁর মেজমামা এখানেই থাকতে ভালোবাসেন। তিনিই এ বাড়ির দেখাশুনো করেন।

রঞ্জিতকাকু তাঁর মেজমামাকে চিঠি লিখে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি নিজেও সঙ্গে আসবেন ঠিক করেছিলেন, কিন্তু শেষমুহূর্তে আটকে গেছেন কাজে।

একটা মস্ত বড় গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে নীল রঙের গাড়িটা। সুজয় বেশীর ভাগ গাছই চেনে না, কিন্তু এটা যে অশ্বত্থ গাছ তা সে চিনতে পেরেছে। পার্বতীপুর স্টেশনের বাইরে এরকম একটা গাছ থাকবে তাও যেন সে জানতো!

সুজয়ের একই সঙ্গে শীতও করছে, গরমও লাগছে।

গাড়ি থেকে একজন লম্বা, শুকনো চেহারার লোক নেমে বিনীতভাবে হাতজোড় করে বলল, 'মেজবাবু নিজে আসতে পারেন নি। আপনাদের ট্রেনে আসতে কোনোরকম অসুবিধে হয়নি তো? দয়া করে গাড়িতে উঠে বসুন।'

লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে সুজয়ের মনে হলো লোকটা মিথ্যে কথা বলছে!

গাড়িটা স্টার্ট নেবার সময় প্রচুর শব্দ করলো। এমন ফটফট দুমদাম শব্দ যেন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে গাড়িটার গায় হাত বুলোচ্ছিল, তারা ঐ শব্দ শুনে দূরে সরে গেল ভয়ে।

একটু খানি পাকা রাস্তার পরই গাড়িটা নেমে পড়লো মাঠের মধ্যে। সেইখান দিয়েই চলতে লাগলো ধুমধামের সঙ্গে। গাড়িটা লাফাচ্ছে যেন ঘোড়ার মতন!

ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গতবছর বন্যায় এদিককার রাস্তা সব ভেঙে গেছে তো। গাড়ি চালাবার উপায় নেই।'

বাবা বললেন, 'তাহলে গাড়ি আনলেন কেন? আমরা কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে না হয় হেঁটেই যেতুম। বেশী দূর তো নয়।'

ড্রাইভার বলল, 'না বেশী দূর নয়, এই মাত্র মাইল পাঁচেক।' বাবা বললেন, 'অ্যাঁ? রঞ্জিত যে বলেছিল স্টেশনের কাছেই বাড়ি!' ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, আগে খুব কাছে ছিল, এখন যে রেল স্টেশনটা দূরে সরে গেছে!'

সুজয় বসে আছে ড্রাইভারের পাশে, তার এসব কোনো কথাই বিশ্বাস হচ্ছে না।

মিনিট দশেক যাবার পরই গাড়িটা ক্যাঁকর কোঁ ভুররর-ভট শব্দ করে একেবারে থেকে গেল। ড্রাইভার নেমে গিয়ে, বনেট খুলে খুটখাট আরম্ভ করল।

মা বাবার দিকে ফিরে বললেন, 'আমি বলেছিলুম পুরী যেতে। শুনলে নাতো আমার কথা।'

ড্রাইভার উঁকি মেরে বলল, 'উপায় নেই, ঠেলতে হবে।' সবাই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। রোদ একেবারে ঝাঁঝাঁ করছে, তবে গত কালই বোধহয় বৃষ্টি হয়েছিল, মাঠের এখানে সেখানে জল জমে আছে। মা তো কাদার মধ্যেই পা দিয়ে ফেললেন। ড্রাইভার বলল, 'সাবধান, দেখবেন, এখানে বড্ড সাপ খোপের উপদ্রব কালই একজনকে সাপে কেটেছে।'

দিদি তাই শুনে এক লাফ দিল।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'সাপে কেটেছে মানে সাপে কামড়েছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায়? এই মাঠে?'

'মাঠে তো সাপের কামড়ে প্রায়ই এক আধজন মরে। কাল একজন মরেছে আমাদের রাজবাড়িতেই।'

মা বললেন, 'স্টেশনটা তো কাছে। ফিরে গেলে হয় না?'

বাবা বললেন, 'আহা, আগেই অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

মাঠের সামনে একটা উঁচু বাঁধ। গাড়িটা অনেক কষ্টে ঠেলে তোলা হলো ওপরে। সবাই দারুণভাবে হাঁপাতে লাগল। সুজয়ের শরীরটা কাঁপছে। ঠিক ম্যালেরিয়া রুগীর মত।

ড্রাইভার বলল, 'এইবার উঠে বসুন, আর চিন্তা নেই।'

গাড়ি চলতে শুরু করল আবার। সুজয়ের মনে হলো গাড়িটা আসলে খারাপ হয় নি। লোকটি ইচ্ছে করে ঠেলালো ওদের দিয়ে। মাঠটা পার করে দিল এই ভাবে।

বাঁধের ওপরে বেশ ভালো রাস্তা। একটু বাদেই সেটা গিয়ে মিশেছে পাকা রাস্তায়। তারপর আবার মিনিট দশেক চলার পর একটা মোড় এলো। রাস্তার মাঝখানটা গোল করে বাঁধানো। তার সামনে, বাঁদিকে আর ডানদিকে তিনটে রাস্তা বেরিয়ে গেছে। গাড়িটা বাঁ দিকে বেঁকতেই সুজয় বলে উঠলো, 'ডান দিকে।' মা, বাবা, দিদি সবাই তার দিকে তাকালো। ড্রাইভারও ঘচ করে ব্রেক কষে সুজয়ের দিকে চেয়ে রইল।

সুজয় দৃঢ়ভাবে বললো, 'এবারে ডানদিকে যেতে হবে।'

ড্রাইভারটি কাচুমাচু ভাবে বললো, 'হ্যাঁ আমারই ভুল হয়ে গেছে। এদিকে তো বেশি আসা হয় না!'

পেছনের সিট থেকে দিদি মুখ ঝুঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী করে জানলিরে?'

সুজয় কোনো উত্তর দিল না। দিদি তার ঘাড় ছুঁয়েছে। কিন্তু চমকে উঠলো না তো। সুজয়ের তো এখন জ্বরে পুড়ে যাবার কথা। তবে কি তার জ্বর হয় নি?

রাস্তাটা আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে মোড় ফেরবার আগেই সুজয় আবার বলে উঠলো, 'আমরা এসে গেছি।' বাবা বললেন, 'যাঃ, পাঁচ মাইল দূর বলল যে।' ড্রাইভার এবার রীতিমতন ভয়ে ভয়ে সুজয়ের দিকে চোরা চাহনি দিল।

গাড়িটা ডানদিকে ঘোরার একটু পরেই দেখা গেল গাছপালার আড়ালে একটা বিশাল বাড়ি। জমিদার বাড়িকে গ্রামের লোক রাজবাড়ি বলে। সত্যি রাজবাড়ির মতন দেখতে। সামনে প্রকাণ্ড লোহার গেট, দুপাশে দুটি গম্বুজ। গেটের পর সুরকি বিছানো পথ, তার দুদিকে নানারকম ফুলের গাছ আর পাথরের পরী। তারপর বাড়িটা যেন দুর্গের মতন।

গেট দিয়ে গাড়িটা ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সুজয় বলল, 'বাবা এই বাড়িতে আমি আগে এসেছি।'

বাবা বললেন, 'সে কি? তুই কী করে আগে আসবি এখানে? আমি নিজেই

কখনো আসিনি।'

সুজয় বলল, 'এই জায়গাটা আমার খুব চেনা। এই বাড়িটাও।'

দিদি বলল, 'এরকম অনেক বাড়ি ছবিতে দেখা যায়। দেখলেই মনে হয় চেনা চেনা।'

সুজয় বলল, 'না, সেরকম নয়, এই জায়গায় আগে এসেছি।'

মা বললেন, 'আমরা কেউ আসিনি। তুই কি একা এসেছিস?

গাড়িটা এসে থামলো বাড়ির সামনে। থাক থাক সিঁড়ি উঠে গেছে। তারপর পেতলের বল্টু লাগানো একটা মস্ত বড় কাঠের দরজা। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও কেউ বাইরে বেরিয়ে এল না।

ড্রাইভারটি সুজয়ের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। সুজয় বলল, 'কী হলো, কাউকে দরজা খুলতে বলুন!' সে চমকে গিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' তারপর সে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ধাক্কা দিল দরজায়। বেশ কয়েকবার ধাক্কা দেবার পর দরজা খুলে একজন লাঠিয়াল বেরিয়ে এল।

বাবা বললেন, 'আশ্চর্য তো! লাঠিয়াল বাইরে পাহারা দেবার বদলে দরজা বন্ধ করে ভেতরে বসে আছে!'

লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেজবাবু কোথায়?'

লোকটি বাবার দিকে চেয়ে রইল, কোনো উত্তর দিল না।

সুজয় বলল, 'এই লোকটি বোবা!'

ড্রাইভার প্রায় আঁতকে উঠলো সুজয়ের কথা শুনে। ফ্যাকাসে মুখে বলল, 'আপনি কী করে জানলেন?'

এবারে মা আর বাবা খুব অবাক হয়েছেন। দিদি বলল 'সত্যি?'

ড্রাইভার বলল, 'হ্যাঁ, রঘু কথা বলতে পারে না। এই রঘু, মালপত্তর তোল।'

লোকটি লাঠি নামিয়ে রেখে দুহাতে দুটো সুটকেস তুলে ভেতরে চলে গেল।

ড্রাইভার বলল, 'আসুন, ওপরে চলুন।'

মা বেশ বিরক্ত হয়েছেন। বাড়িতে অতিথি এলে বাড়ির লোক কেউ অভ্যর্থনা করতে আসবে না?

রঞ্জিতবাবু অবশ্য বলেছিলেন যে তাঁর মেজমামা বিয়ে করেন নি, বাড়িতে অন্য লোক আর বিশেষ কেউ নেই।

দোতলায় অনেকগুলি ঘর তালাবন্ধ। সুজয় ড্রাইভারের আগে আগে এগিয়ে গেল। তারপর বারান্দা ঘুরেই ডানদিকের প্রথম ঘরটার দরজা ঠেলে খুলে ফেলল। যেন সে জানতো যে এই ঘরটাই তাদের জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, সুজয় একবার বলল, 'মা, তোমাদের এই ঘর, আমি আর দিদি থাকব তিনতলায়। চল দিদি, আমাদের ঘরটা দেখে আসি।'

বাবা বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো খোকা? তুই এসব কী বলছিস?'

সুজয় মৃদুমৃদু হাসতে লাগলো, তার চোখ জ্বলজ্বল করছে, তাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে।

বাবা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'এই খোকা। কী হয়েছে তোর?'

সুজয় বলল, 'কী জানি! বুঝতে পারছি না। আমার সব কিছুই মনে হচ্ছে আগে থেকে জানা। এ বাড়িতে আগে আমি থেকেছি।'

মা বললেন, 'ছেলেটা ক্ষেপে গেল নাকি? এ বাড়িতে ও আগে আসবে কী করে?'

ড্রাইভারটি অস্ফুটভাবে বললো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু!' তারপরেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাবা তাকে ডেকে বললেন, 'এই যে, আপনি চলে যাচ্ছেন—আপনার বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না—?'

'বাবুর তো শরীর খারাপ। উনি ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না—'

'ঠিক আছে। ওঁর ঘরেই আমরা যাবো।'

'উনি বলেছেন সন্ধেবেলা দেখা করবেন। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। ডাকলেই রঘু আসবে।'

'ঐ লোকটি তো বোবা! যারা বোবা হয় তারা কালাও হয়। ডাকলে ও শুনবে কী করে?'

'না না, ও শুনতে পায়। কথা বলতে পারে না। আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মা এবারে প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, 'এ বাড়িতে আমার একটুও থাকতে ভালো লাগছে না বাপু। রঞ্জিতবাবু এ কোন জায়গায় পাঠালেন আমাদের?'

'রঞ্জিত তো বলেছিল আমাদের খুব ভালো লাগবে। ওর মেজমামা আমাদের খুব খাতির করবেন। তিনি খুব আমুদে লোক।'

'কোথায়! তিনি তো একবার দেখাও করলেন না!'

'শুনছি তো অসুস্থ। রঞ্জিতের চিঠির উত্তরে তিনি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আমাদের আসতে বলেছেন।'

'তাতে তো জানান নি যে তিনি অসুস্থ! ওকি! ওকি ছেলেটার কি হলো?'

সুজয় তখন থরথর করে কাঁপতে শুরু করছে। তার চোখে বুজে গেছে।

বাবা ভয় পেয়ে গিয়ে বললেন, 'খোকা, খোকা, অমন করছিস কেন?'

সুজয় বললো, 'আমি ওপরে যাব।' তারপরেই সে এক দৌড় লাগালো। 'ওকি? ওকি?' বলে বাবা, মা, দিদিও ছুটলেন তার পেছন পেছন।

সুজয় দৌড়তে দৌড়তে উঠে এলো তিনতলায়। সেখানে ড্রাইভার আর রঘু দাঁড়িয়ে আছে একটা ঘরের দরজার সামনে। দু-জনেরই মুখ শুকনো। সুজয়কে দেখে তারা বেশ ভয় পেয়েছে।

সুজয় হুকুমের সুরে বলল, 'সরে যাও। দরজা খোলো।' ড্রাইভার হাত জোড় করে বললো, 'ছোটবাবু! ছোটবাবু' আমার কোনো দোষ নেই!'

সুজয় এক ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। একজন মাঝবয়সী লোক একটা সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালো। লোকটির মাথায় টাক। মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি।

সুজয়কে দেখে লোকটিও বেশ ভয় পেয়ে গেল। এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এ কে? এ কে?' সুজয়ের বাবা-মাও ততক্ষণে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সুজয় তাঁদের দিকে ফিরে বললো 'এই লোকটা মেজবাবু নয়। এ একটা বদমাস! আগে নায়েবের কাজ করত।'

সিল্কের জোম্বা-পরা লোকটাও ড্রাইভারের মতন বলে উঠলো, 'ছোটবাবু' ছোটবাবু!'

সুজয় প্রায় লাফিয়ে গিয়ে লোকটার দাড়ি ধরে এক টান দিতেই সেই দাড়ি খুলে এল হাতে। নকল দাড়ি!

লোকটা বিকট সুরে চিৎকার করতে লাগলো, 'ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে!! ভূত! ভূত!! ছোটবাবু, ছেড়ে দাও আমাকে—আমি সব স্বীকার করছি।'

ড্রাইভার বললো, 'ছোটবাবু ঠিকই বলেছেন। এ মেজবাবু নয়। এ ছিল আগে এ বাড়ির নায়েব।'

রঘু আর ড্রাইভার এসে দুমদুম করে লোকটিকে ঘুঁষি মারতে লাগলো।

সে মাটিতে পড়ে কাৎরাতে লাগলো।

এরপর আস্তে আস্তে সব জানা গেল। দিন দশেক আগে এ বাড়ির মেজবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। অন্য ভাইরা সবাই কলকাতায় থাকেন। তাঁরা সে খবর জানতে পারেননি ঐ নায়েবই ইচ্ছে করে জানায় নি। তার বদলে সে নিজেই মেজবাবু সেজে এ বাড়ি থেকে সব জিনিসপত্র সরাবার মতলবে ছিল। বাড়ির মধ্যে বাইরের লোক বিশেষ কেউ ঢোকে না। ড্রাইভার আর রঘুকে সে ভয় দেখিয়ে নিজের দলে রেখেছিল।

নায়েব লোকটি বদমাস হলেও মোটেই সাহসী ছিল না। সুজয়কে দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল—পরে সব কথা নিজেই স্বীকার করল।

বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'খোকাকে দেখে তোমরা সবাই ভয় পাচ্ছিলে কেন? ছোটবাবু বলছিলে কেন?' নায়েব আর ড্রাইভার জানালো যে এ বাড়ির যিনি বড়বাবু ছিলেন তাঁর এক ছেলে ছিল ঠিক সুজয়েরই বয়সী, দেখতেও অবিকল একরকম। বছর খানেক আগে সে কলকাতা থেকে এখানে বেড়াতে এসে সাপের কামড়ে মারা যায়। সেই ঘটনার পর থেকেই বাবুরা আর এ বাড়িতে আসেন না। মেজবাবু একলাই এখানে থাকতেন। সুজয়কে দেখে আর তার কথাবার্তার ধরনে ওরা সবাই ভেবেছিল সেই ছোটবাবুই আবার ফিরে এসেছেন।

বাবা বললেন, 'কেউ মরে গেলে আবার ফিরে আসে কি করে? তোমাদের এইটুকুও বুদ্ধি নেই!'

ড্রাইভার বললো, 'ছোটবাবুকে তো পোড়নো হয়নি। এ দেশের নিয়ম হচ্ছে, কাউকে সাপে কামড়ালে তার দেহ নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। তাই করা হয়েছিল। লখীন্দর যেমন বেঁচে ফিরে এসেছিলেন, সেই রকম ছোটবাবুও নিশ্চয় ফিরে এসেছেন!'

বাবা সুজয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যাঃ এ-তো আমাদের ছেলে। এ তোমাদের ছোটবাবু হবে কী করে?'

কিন্তু সুজয় কী করে এখানকার রাস্তা ঘাট, এই বাড়ি সব আগে থেকে চিনলো? কী করেই বা জানলো যে রঘু বোবা, নায়েবই মেজোবাবু সেজে আছে কিছুই বোঝা গেল না। সুজয় নিজেও সে কথা বলতে পারলো না।

সুজয়ের শরীরে আর কাঁপুনি নেই। জ্বরভাবও ছেড়ে গেছে। আগের কথা আর তার কিছুই মনে নেই!

গন্ধটা খুব সন্দেহজনক

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে। দাদামশাই রেল কোম্পানীতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমরা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকী। তখন এতসব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি জঙ্গল-টঙ্গল ছিল। সেইরকমই এক নির্জন জঙ্গলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাঁকে বাড়ির বাইরে থাকতে হত। কখনো এক-নাগাড়ে তিন চার কিম্বা সাত দিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট নজন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোটো ছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচুগাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশী নয়। একধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার। একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনসটিটিউট ছিল, সেখানে প্রতি বছর দু-তিনবার

কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হত। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুই ভাতিতেও যাওয়া হত। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙ্গে বলতেন না। যেমন স্টোরকীপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বললেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভাল নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।" কিম্বা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত-গিন্নী এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলে-পুলেদের সামলে রাখবেন। এখানে যারা সব আছে, তারা ভাল নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, "কাদের কথা বলছেন দিদি?"

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেনখন।" তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন। একদিন হল কি, পুরোনো ঝি সখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধাবয়সী বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিনদুই পরে পালিত-গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে?"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মিচকি হেসে বললেন, "ওদের ওরকমই ধারা। ঝি-টার নাম বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদারবাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা—কোনটা মানুষ আর কোনটা মানুষ নয় তা চেনা ভারী মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।"

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নী, আর দিদিমা আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

সে মাথা নিচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।"

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খট্‌কা-ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতিরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন, হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল। তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশনমাস্টারেরা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে আমলে এরকম হামেশা হত। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন। পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা অনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে কিন্তু ড্রাইভার তার ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁক পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে

আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইস্‌ল দিল, গাড়িও ক্যাঁচ-কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক! ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়বার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে! ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তাঁর দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলেবেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল।

ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্রতন্ত্র নয়। আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন, তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন, কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না...ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তাঁর হাতের লাঠিটা হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল, তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে।

প্রথমেই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচন্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টাচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা—ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখবাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য, প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হল না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ-ওকে ঠেলছেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন—চলে আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘ-ভাল্লুক নই,...ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল কেউ যাওয়ার আগেই টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড! এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল

উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো-কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন, কী হয়েছে? অ্যাঁ? কী হয়েছে? তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন।

আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটনা ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন, কিন্তু তারপরই দেখা গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তাঁর মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল, কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কাঁদো-কাঁদো মুখে চার-পাঁচ-সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়!

তখনকার মফঃস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলাটেলা দেখাতে এলে তাঁকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামাবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাঁকে বললেন, "আপনার খেলা গণপতির চেয়ে ভাল। অতি আশ্চর্য খেলা!"

ভট্টাচার্যও বললেন, "হাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা—আমিও এরকম আর দেখিনি।"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী? এ তো আপনিই দেখালেন!"

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বলেন, "তা বটে, আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য!"

তাঁকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কৈ, আমরা তো পাচ্ছি না!"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পন্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাৎ আঁশটে গন্ধ! শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলুম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা-ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এল না। দিদিমার তখন ভারী মুশকিল। একা হাতে সব করতে-কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখেশুনে খুব গম্ভীর হয়ে

বললেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক!"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক, সে ভাল। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশী করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ-বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, "এসব কী কথা বলছেন মাসীমা? আমার শ্বশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি! তা বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে এ হচ্ছে ঐ দলেরই রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, রোসো।" বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই, তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই-পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে, কে আছিস?" বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, "যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।" দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি?" সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না, ফাইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কি! খুব ভাল ওরা, ডাকলেই আসে। লোক-টোক নয়, ওরা ওরাই!"

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিহিগলায় মেয়েলী পাট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার

সিরাজদৌল্লা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরিশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তাঁর ম্যালেরিয়া চাগিয়ে উঠল। লেপচাপা হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে, কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুৎফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই-ই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন—কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই মোটেই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, "দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল। একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি!"

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে, "মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?"

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, "সবই তো বোঝেন মশাই! একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়; তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসী তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসীরা নাবালক-নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসী রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, "আয় রে!" অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত।

মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে, সেই বড়ো আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পাটিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশী লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, "কে খেলবি আয়!" অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হত, মামাদের বয়সীই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কান্ড হল একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারায় খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালী টিম জুত করতে পারছে না। হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল। দুটো গোল শোধ দিয়ে আরও একখানা দিয়েছে, এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারীকে বলল, "ওরা বারোজন খেলছে!" রেফারী

গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারীই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, "তোমাদের টিমে চার-পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে!"

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারী, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, "গনে দেখুন!" রেফারী গুনে দেখে আহাম্মক—এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়েছে। রেফারী আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, "দেয়ার আর অ্যাট লীসট্ টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম!"

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায়—এগারোজন, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিম্বা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিলপিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারী দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, "শেষ তিনটে গোল যারা করেছে, তারা কই? তাদের তো দেখছি না! একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো—তারা কই?"

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিনমিন করে সাফাই গাইল, তাতে রেফারী আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাফ্‌সে পড়েছে, কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, "আবার সেই গন্ধ! এখানেও একটা রহস্য আছে, বুঝলে সমাদ্দার?"

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, "ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে!"

"কে? কাদের কথা বলছো?"

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "গন্ধটা খুব সন্দেহজনক!"

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ্য করতেন আর বলতেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বৌমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট্ বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুঁশ্ করে সব মিলিয়ে যায়! কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হল, উঠে বসে

কেবলমাত্র আপনমনে বলেছি—একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি! অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল! এরা সব কারা?"

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশী উচ্চবাচ্য করেন না, বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান আর বলেন, "এ ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়-ঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, "রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুঁকি, তারপর কথাবার্তা!" এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হত তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায়-ঘাটে বা হাটেবাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত, তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটার ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ঐ বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে! তাঁর কিছু বেশী ছিল। সন্ধ্যের পর ঘরের বার হতে হলেই তাঁর সঙ্গে কাউকে যেতে হত। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তাঁর বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল। মাস্টারমাইকে তো আর বলতে পারেন না—আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান, তাই বাধ্য হয়ে ভিতরবাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ করে বললেন, "এই শুনছিস?"

অমনি একটি সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, "কী বলছো?"

"আমি একটু বাথরুমে যাবো, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি—চল তো!"

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, "দাঁড়াবো কেন? তোমার

কিসের ভয়?"

বড়মামা ধমক দিয়ে বলেন, "ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমে কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, "কিসের ভয় বললে না?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের।"

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "খুব ফাজিল হয়েছো তোমরা!"

তা এইরকম সব হত দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তাঁর হাতে মাছের ছোট্ট থালুই, তাতে সিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে থালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাঁটা দেয় যদি! এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয়ভাবে এসে মাছটাকে ধরে থালুইতে ভরে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভাল কথা নয়, গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! তুমি কে হে? অ্যাঁ, কারা তোমরা?"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা শুঁকে সেও বলল, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক। আপনি কে বলুন তো? অ্যাঁ, কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না। একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তাঁর প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তাঁর গা শুঁকে ঐ কথা বলে গেছে ভাবা যায়?

নিশির ডাক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমরা তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। জায়গাটা কলকাতার কাছে হলেও বেশ গ্রাম-গ্রাম। পশ্চিমে গঙ্গা সেদিকে সব মন্দির, বাগানবাড়ি, বাঁশ-বিচালির গোলা। পশ্চিম থেকে একটি মাত্র পিচ বাঁধানো রাস্তা পুবে বাসরাস্তার দিকে চলে গেছে। বাকি সব অলি-গলি, গলির গলি, তস্য গলি। পাকা বাড়ি, সাবেক কালের বাড়ি অনেক ছিল, আবার সেই সঙ্গে ছিল টিন, টালি, খড়ের চালা। বড়-বড় গাছ। নিম, তেঁতুল, বট, অর্জুন। জংলা বসতি, বাগান। একটা বাগান ছিল, সেখানে শুধু কুল গাছ। আমরা সেখানে শীতকালে কুল চুরি করতে যেতুম। হরি মালী তাড়া করলে, মার দৌড়। ধরবে কী করে, আমরা যে ছোট ছিলুম, হরিণের মতো দৌড়তে পারতুম। কিছু না পেরে হরিদা চিৎকার করে বলত, সরস্বতী পুজোর আগে কুল খাওয়া, দাঁড়া, মা কালীকে বলে দেব।"

সেই সময় একদিন আমাদের বন্ধুমহলে খবর রটে গেল, আজ রাতে নিশির ডাক বেরোবে। আজ অমাবস্যা। সেটা কী জিনিস। বিমানই এই গোপন খবরটা এনেছিল। সে সব জানে। বিমান বললে, জমিদার অনাদি মল্লিকের এখন-তখন অবস্থা। অত বড় বাড়ি, বিষয়-সম্পত্তি, ঘোড়ার গাড়ি। তাঁকে তো সহজে মরতে দেওয়া যায় না। ডাক্তার-বদ্যি সব জবাব দিয়ে গেছেন। তাই এই শেষ চেষ্টা। অন্যের পরমায়ু কেড়ে নিয়ে তাঁকে বাঁচানো হবে। এক তান্ত্রিক এসেছেন

পশুপতিনাথ পাহাড় থেকে। সারা গায়ে তেল-সিঁদুর মেখে তিনি রাত বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে পথে বেরোবেন। হাতে থাকবে জলসমেত মুখ খোলা একটা ডাব। তিনি পল্লীবাসী সকলের নাম ধরে ডাকতে থাকবেন একে-একে। যেই কেউ সাড়া দেবে, অমনই ডাবের খোলার মুখটা টপ করে চাপা দিয়ে দেবেন। অমনই তার প্রাণ ওই ডাবের জলে আবদ্ধ হয়ে যাবে। ওই জল মল্লিকমশাইকে খাওয়ালে তিনি বেঁচে উঠবেন, আর এ মারা যাবে।

বিমান বললে, "খুব সাবধান। আজ আমরা সারারাত জেগে থাকব। ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে সাড়া দিয়েছিস কি মরেছিস।"

"পশুপতিনাথের তান্ত্রিক আমাদের নাম জানবে কী করে!"

"এ-পাড়ার লোকই জানিয়ে দেবে।"

বাড়িতে এসে মাকে খুব চুপিচুপি কথাটা বললুম। বাবা খুব কড়া মানুষ। ভূত, প্রেত, তন্ত্র, মন্ত্র মানেন না। শুধু বলবেন, "অঙ্ক কষো, অঙ্ক। অঙ্কই জীবন অঙ্কই ভগবান।" আর ওই অঙ্কটাই আমি পারি না। তাই বাবাকে না বলে মাকে বললুম। তা ছাড়া মায়ের চেয়েও বড় বন্ধু মানুষের আর কে আছে।

মা খুব ভয় পেলেন। মায়ের ছেলেবেলায় এইরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। মা এইসব অলৌকিক ব্যাপার খুব বিশ্বাস করেন। সিঙ্গুরে একবার ভুলভুলাইয়া ভূত মাকে সারারাত জঙ্গলে ঘুরিয়েছিল। আধমাইল দূরে মায়ের বাড়ি, মা কিন্তু কিছুতেই পৌঁছতে পারলেন না। ভুল রাস্তায় সারারাত চক্কর মারলেন।

সব শুনে মা বললেন, "আমরা তো জেগে থাকবই, তবে একজনকে নিয়েই আমার ভয়। সে তোর বাবা। যদি জানতে পারে সারারাত লাঠি হাতে রাস্তার রকে বসে থাকবে। এলেই পিটিয়ে শেষ করে দেবে, তারপর যা হয় হবে। না জানানোই ভাল। সেখানেও ভয়, ঘুমের ঘোরে ডাক শুনে উত্তর দিয়ে দিলেই হয়ে গেল।"

আমি বললুম, "বাবার পাশে আমিই তো শুই। জেগেই থাকব। যদি দেখি উত্তর দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে মুখ চেপে ধরব।"

আমাদের রাত জাগার সব পরিকল্পনা প্রস্তুত। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে গঙ্গার ধারের বটতলায় বসে ওই একই আলোচনা হল। সন্ধ্যে হব-হব, বাড়ি ফিরে এলুম। চারপাশ এরই মধ্যে কেমন যেন থমথম করছে। কালীবাড়িতে অমাবস্যার রাতের পূজোর আয়োজন হচ্ছে দেখে এসেছি। অন্য অমাবস্যায় আমরা বন্ধুরা গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি ভোগ খাওয়ার লোভে ঠিক হাজির

হয়ে যেতুম। সে রাত বারোটাই হোক, একটাই হোক। আজ আর কোনও বেরনো-টেরনো নয়। টাইট হয়ে বসে থাকো বাড়িতে।

অমাবস্যার রাত অন্ধকার হয় ঠিকই, তবে আজ যেন আলকাতরা-রাত। ঘরের জানলায় আকাশটা আটকে আছে, মনে হচ্ছে ওইখানেই শেষ। ওর পরে আর কিছু নেই, মনে হচ্ছে ওইখানেই শেষ। ওর পরে আর কিছু নেই, মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তারাগুলো যেন আগুনের মতো জ্বলছে ধকধক করে। রাস্তাতেও আজ যেন তেমন লোক চলাচল নেই। রাত ন'টার আগেই সব যেন নিঝুম মেরে গেল। দোকানপাট বন্ধ। মিষ্টির দোকানের পেছন দিকের ছেঁচা বেড়ার দরজাটা খোলা। মাঠে আলো পড়েছে। মজা পুকুর। কচু গাছের ঝোপ। কালো কুকুরটা কড়ার চাঁছি খাওয়ার লোভে সামনের থাবায় মুখ রেখে বসে আছে। এই সবই আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরের জানলায় বসে।

রাত দশটার সময় মা বললেন, "দেখছিস পলাশ, আজ এরই মধ্যে ঘুমে শরীর যেন ভারী হয়ে আসছে। তোর কিছু মনে হচ্ছে না!"

"মনে হচ্ছে না আবার! ইতিহাস পড়ছিলুম, এমন ঢুল ধরল, মাথাটা টাঁই করে দেওয়ালে ঠুকে গেল। তাই তো এই জানালায় এসে বসে আছি।"

"বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা। সারা পাড়াটাকে মন্ত্রের প্রভাবে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে আস্তে আস্তে।"

"কীভাবে করে মা?"

"আমি জানি। খুব একটা উঁচু জায়গায় উঠে বিশাল একটা ধুনুচিতে আগুন জ্বালিয়ে ধুনো দিতে থাকে। তা সঙ্গে মন্ত্র। যেদিকে বাতাস সেই দিকে ধোঁয়াটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মানুষের শরীর ভারী হয়। ঘুম পায়। বেশ একটা সুখ-সুখ লাগে। এই সুখের মধ্যে থেকেই একজন চলে যায়।"

"এর হাত থেকে বাঁচার উপায়?"

"আমার জানা আছে। লঙ্কা পোড়া। দাঁড়া, চাটুতে কয়েকটা লঙ্কা পোড়াই। সব প্রভাব কেটে যাবে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়িসুদ্ধু সবাই হাঁচি আর কাশিতে অস্থির। আমাদের পুসিটা একপাশে থুপ্‌পি মেরে ঘুমোচ্ছিল। ফিঁচ-ফিঁচ করে হাঁচতে-হাঁচতে উঠে বসল। অবাক হয়ে গেছে। রাত দশটার সময় এ আবার কী! বাবা বাইরের ঘর থেকে ছুটে এলেন, "কী করছ তুমি! এরপর লোকে যে থানায় ডায়েরি করবে আমাদের নামে।"

মা শুধু গম্ভীর মুখে একটা কথাই বললেন, "যা করছি সবই জীবের মঙ্গলের জন্যে।"

"এর চেয়ে অমঙ্গল আর কী হতে পারে!" বলে, বাবা উদ্দাম কাশতে-কাশতে পালিয়ে গেলেন। মন্দিরে অমাবস্যার রাতের পুজো শুরু হয়ে গেছে। কাঁসর, ঘন্টা, জগঝম্পের শব্দ ভেসে আসছে।

রাত এগারোটার সময় রোজ যেমন আমরা শুয়ে পড়ি, সেই রকমই শোয়া হল। আলো-টালো সব নিভে গেছে। এক বিছানায় বাবা আর আমি পাশাপাশি। আর এক বিছানায় মা। দোতলার ঘর। ঠিক নীচেই রাস্তা। গরম কাল। জানলা-টানলা সব খোলা। বাবার শ্বাসপ্রশ্বাস যেই বড় হল, মা মশারির ভেতর থেকে ফিসফিস করে ডাকলেন, "পলাশ!"

"সব ঠিক আছে মা।"

"সাবধান, সজাগ থাকিস।"

"ঠিক আছে মা।"

বাবা পাশ ফিরলেন। আমরা দু'জনেই চুপ করে গেলুম। মন্দিরের আরতি শেষ। রাত নিঝুম। কোথাও একটা কুকুরও আজ ডাকছে না। শুধু দেওয়াল ঘড়ির ঠকাস্-ঠকাস্ শব্দ। ঢং করে একটা বাজল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে; আর বোধহয় জেগে থাকতে পারলুম না। আমাকে সাবধান করে মা নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। জোরে-জোরে নিশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি। ভীষণ ভয় করছে আমার।

রাত দেড়টা। আজ আর বোধহয় নিশি বেরোল না। সবটাই গুজব।এমনও হয় না কি! এই সব ভেবে সবে পাশ ফিরে শুয়েছি, এমন সময় দূরে কোথাও চিং করে একটা শব্দ হল। আমার কান খাড়া। বিছানায় আধশোয়া। গম্ভীর গলায় কে টেনে-টেনে সুর করে ডাকছে, "অনাথ, অনাথ।" তিনবার। পরের নাম, "দীনবন্ধু, দীনবন্ধু।" গলাটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে ডাকতে-ডাকতে। আমাদের বাড়ির সামনে। বাবার নাম ধরে ডাকছে, "হরিশঙ্কর, হরিশঙ্কর।" আমার হাত বাবার ঠোঁটের কাছে। তেমন হলেই চেপে ধরব।

খুব ইচ্ছে করছে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি। ভীষণ উত্তেজনা হচ্ছে। বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারছি না তাই। ডাকটা ক্রমশই গঙ্গার দিকে চলে যাচ্ছে, "কানাই, কানাই, বনমালী, বনমালী, হারাধন, হারাধন।" শেষে আর শোনা গেল না। বাতাসের শাঁ শাঁ শব্দ। গঙ্গায় শেষ রাতের স্টিমারের ভোঁ। ডাকটা

কী আবার এদিকে ঘুরে আসবে! এইসব ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরের দিন বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল। বাইরের রাস্তায় লোকজন, হইচই। রাতের অতবড় একটা ঘটনার কোনও চিহ্নই পড়ে নেই। আরও একটু বেলা বাড়তেই পবিত্রদের বাড়ি ছুটে গেলুম। ওইখানেই আমাদের আড্ডা বসে। তারপর ওইখান থেকেই কোমরে গামছা বেঁধে আমরা গঙ্গায় গিয়ে পড়ি।

সেদিন আর কোনও আলোচনা নয়। একটাই বিষয়, নিশির ডাকে কেউ কি সাড়া দিয়েছিল। না, নিশি ডেকেডেকে সাড়া না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল! আমরা অনুসন্ধানে বেরোলুম। ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস তো করা যায় না, কে মারা গেছে। যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবে ঘুরে-ঘুরে দেখতে হবে।

এ পাড়া-সে পাড়া, এ গলি-সে গলি ঘুরছি আমরা। জীবন স্বাভাবিক। কোথাও কিছু নেই। তার মানে সব বাজে। কোনও এক পাগলের কীর্তি! বিমান আবার সাহস করে দোতলার বারান্দা থেকে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিশি দেখেছে। বেঁটেখাটো, চারচৌকো, জটাজুটধারী একটা জীব। দগদগে লাল। বেলুনের মতো রাস্তার এক হাত ওপর দিয়ে ভেসে-ভেসে চলে যাচ্ছে। শেয়ালের মতো কণ্ঠস্বর, "নিতাই, নিতাই।"

পাড়ার শেষ মাথায় রাস্তার কলে দাঁড়িয়ে দু'জন কাজের মেয়ে বলাবলি করছে, কুলবাগানের হারু কাল শেষ রাতে হঠাৎ মারা গেছে। রাতে খাটিয়া পেতে দাওয়ায় শুয়েছিল। সুস্থ, সবল একটা মানুষ। অসুখ নেই, বিসুখ নেই। সকালে দেখা গেল, বিছানায় মরে পড়ে আছে।

ছোট-ছোট। হারুদার কুলবাগান। গাছের পর গাছ। গোল গোল পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে আসছে প্রখর সূর্যের আলো। ছায়া আছে, তবে কেমন যেন শুকনো ছায়া। মাঝখানে একটা কুঁড়েঘর। খবর পেয়ে কিছু লোকজন এসেছে। খাটিয়ায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে আমাদের হারুদা। চেহারাটা কাগজের মতো ফ্যাকফ্যাকে সাদা। সবাই বলাবলি করেছে, হার্ট অ্যাটাক।

একমাত্র আমরাই জানি ব্যাপারটা কী! রাত দুটোর সময় মৃত্যুর কণ্ঠস্বর—"হারুউ, হারুউ।" আধো ঘুম, আধো জাগরণে একটি উত্তর—"যাই।" খপ করে ডাবের খোলার মুখ বন্ধ।

এখন ভাবি, এমনও হয়। কিন্তু তার পরে অনাদি মল্লিক আরও অনেকদিন বেঁচে থেকে শেষে আত্মহত্যা করেছিলেন।

দাঁত বাঁধানো কংকাল

শেখর বসু

বিখ্যাত দাঁতের ডাক্তার বিনায়ক সামন্ত তাঁর চেম্বারে বসে নতুন এক পাটি দাঁত খুব মন দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। শীতের রাত। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে আবার। শীতের সঙ্গে দাঁত ব্যথার সম্পর্কটা বোধহয় একটু বেশি, কিন্তু রুগীপত্তর আজ তেমন আসেনি। দু-চারজন যারা এসেছিল, তারা চটপট ডাক্তার দেখিয়ে বাড়ি ফিরে গেছে অনেকক্ষণ।

আর কেউ হয়ত আসবে না। কিন্তু ডাক্তার চেম্বার বন্ধ করেননি, খুপরি-ঘরে বসে নিজের কাজ করে যাচ্ছেন একটার পর একটা। রাস্তায় চাপ-চাপ কুয়াশা, কদাচিৎ হর্ন বাজাতে বাজাতে দু-একটা প্রাইভেট গাড়ি যাচ্ছে।

এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেলেন ডাক্তার সামন্ত। এরকম মাঝেমধ্যে হয়। রোগ বলে কথা, উটকো সময়ে কিছু রুগী আসেই। তবে ভালমানুষ ডাক্তার কাউকেই ফেরান না। ডাক্তার দাঁতের পাটি পরীক্ষা করতে করতে বললেন, 'বলুন?'

রুগী কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়াল।

ডাক্তারের চোখ নামিয়ে কথা বলার অভ্যেস, তিনি সেইভাবেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী অসুবিধে?'

রুগী এবারও কোনো উত্তর দিল না। ডাক্তার সামান্য অসন্তুষ্ট হয়ে চোখ

তুললেন। চোখ তোলার পরই ডাক্তারের চোখ উলটে যাওয়ার কথা। ডাক্তারের জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে তার ঠিক তাই হত। ডাক্তার কিন্তু একটুও ভয় না পেয়ে সামনের কংকালটার চোখের গর্তের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

কংকাল হাতজোড় করে বলল, ''ডাক্তারবাবু, খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।'

ডাক্তার একটু হেসে ফেলে বললেন, 'সবাই তাই আসে।'

কংকাল একটু আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি খুব ভয়ে ছিলাম ডাক্তারবাবু। ভেবেছিলাম আপনি বোধহয় আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যাবেন, কিন্তু...।'

ডাক্তার এবার একটু চটে উঠে বললেন, 'ভূতের ভয় পেয়ে পেয়ে ভূতের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে এখন। হিসেব করে দেখেছি, ভূতের ভয় পেয়ে সারা জীবনে আমরা মোট তিন বছর পাঁচ মাস নষ্ট হয়েছে। কম সময়! ভয় না পেলে ওই সময়টা আমি কত ভাবে কাজে লাগাতে পারতাম! আসলে আমরা খেটে-খাওয়া-মানুষ, ভূতের ভয় পেয়ে সময় নষ্ট করা বড়লোকদের মানায়।'

কংকাল একটু আহত হয়ে বলল, 'আমি কিন্তু ভূত নই, কংকাল। ভূতরা তো ছোট জাত।'

কংকালের কথায় ডাক্তার একটু বিরক্ত হলেন। 'আমি জাতটাত মানি না, আমার কাছে ভূতও যা কংকালও তাই। তা, তোমার অসুবিধেটা কী বলে ফেল চটপট, অনেক রাত হয়ে গেছে।'

কংকাল যে কাহিনী শোনাল এবার, তা অত্যন্ত করুণ। নিজের দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কংকালের চোখের গর্তে জল এসে যাচ্ছিল বারবার।

কংকাল নানা কথায় যা বলল, তা ছোট করলে এইরকম দাঁড়ায় ঃ আমি পুরনো আমলের কংকাল। আমার বয়স প্রায় একশো। তা, একটা সময় দিব্যি ছিলাম আমরা। ছোট কংকালরা বড়দের সম্মান করত, বড় কংকালরা ছোটদের স্নেহ করত। কোথাও কোনোরকম গোলমাল ছিল না। যে যার মানসম্মান নিয়ে দিব্যি গাছে-গাছে ঘোরাফেরা করতে পারত। কিন্তু এখন দিনকাল এক্কেবারে পালটে গেছে। এখনকার ছোট কংকালরা রাম-বিচ্ছু, বড়দের মানা তো দূরের কথা, সুযোগ পেলেই তাদের পেছনে লাগে। ওদের

জ্বালায় মরতে মরতে আমি একদিন কংকাল এলাকায় চলে গিয়েছি। নিরিবিলিতে বসে যে একটু সাধু-কংকালদের নাম করব, তার উপায় নেই কিন্তু। বিচ্ছুর দল অদ্দূরে গিয়েও আমাকে জ্বালায়। সেদিন গাছের মগডালে বসে একটু ঝিমোচ্ছিলাম, এমন সময় একটা ছোট্ট কংকাল গিয়ে পেছন থেকে আমাকে এমন এক ধাক্কা মারল যে...'

কথাটা শেষ করতে না পেরে কংকাল ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ডাক্তার সামন্ত এমনিতে খুব কড়া ধাচের মানুষ, কিন্তু কাউকে কাঁদতে দেখলে ওঁর গলার ভেতরটা ভার-ভার হয়ে ওঠে। ডাক্তার ধরা গলায় বললেন, ''আরে! কী আশ্চর্য! কান্না কেন, পড়ে গিয়ে কি চোট লেগেছে?'

কংকাল চোখের গর্তের জল মুছে বলল, 'আজ্ঞে শুধু চোট লাগলে আমি এত কষ্ট পেতাম না। আচমকা পড়ে গিয়ে আমার ওপর পাটির তিনটে দাঁত ভেঙে গেছে।'

ডাক্তার সামন্ত আগেই লক্ষ্য করেছিলেন কংকালের তিনটে দাঁত ভাঙা, সেদিকে আর একবার তাকাতেই কংকাল একেবারে ভেঙে পড়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু, কংকালের যদি দাঁতই না থাকে তাহলে আর কী-ই বা থাকল তার।'

বিরাট একটা নিশ্বাস ফেলে আবার কান্না জুড়তে যাচ্ছিল কংকাল, কিন্তু ডাক্তার ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক আর কাঁদতে হবে না, তা আমার কাছে কী জন্যে দাঁত বাঁধাতে?'

কংকাল মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলল, আজ থাক।

ডাক্তার আর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনেক রাত হয়ে গেছে যে, আচ্ছা ঠিক আছে, সামনের চেয়ারে বসে পড়ো চটপট।'

কংকাল চেয়ারে বসল।

অনেক খেটেখুটে কংকালের দাঁত তিনটে নিখুঁতভাবে বাঁধিয়ে দিলেন ডাক্তার। তারপর ওর সামনে ছোট্ট একটা আয়না তুলে ধরে বললেন, 'দেখ কেমন দেখাচ্ছে।'

আয়না ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের দাঁত দেখে কংকালের মুখে হাসি আর ধরে না।

ডাক্তার হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুশি?'

কংকাল লম্বা করে ঘাড় কাত করল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তারপরেই মুখ শুকনো

করে বলল 'কিন্তু ডাক্তারবাবু লাগছে? ব্যথা লাগছে?'

কংকাল দুপাশে দ্রুত মাথা নাড়িয়ে বলল, 'ন্না, একটুও না। আমি বলছিলাম কি, মানে...' বলতে বলতে কংকাল হাতজোড় করল। 'আজকাল আমরা বড্ড গরিব হয়ে গেছি। তবে হ্যাঁ, একটা সময় আমাদের টাকা-পয়সা সোনা-দানার কোনো অভাব ছিল না। প্রায় প্রত্যেক কংকালই দু-চারটে করে গুপ্তধন পাহারা দিত। এখন আর সে যুগ নেই, মানুষরা এখন বাড়তি টাকা আর গয়নাগাটি ব্যাংকের লকারে রেখে দেয়। তার ফলে আমাদের হাতে আর কিছুই আসে না।'

ডাক্তার গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করলেন, 'এসব কথা উঠছে কেন?'

কংকাল কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'আপনি আমার জন্যে এত করলেন ডাক্তারবাবু, কিন্তু আমি...সত্যি বলছি, আপনার ফিজ দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই নেই আমার।'

ডাক্তার এবার ধমকে উঠলেন—'তোমার কাছে কি আমি ফিজ চেয়েছি?'

'না, আপনি তো...'

'তবে?'

কংকাল এবার আর কোনো উত্তর দিতে পারল না।

ডাক্তারবাবু গরিবের বন্ধু, আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা কংকালের দিকে তাকিয়ে স্নেহের সুরে বললেন, 'আমি তো বাবা আগে কখনো ভূত-পেত্নির দাঁত বাঁধাইনি, একটা নতুন কায়দায় তোমার দাঁত সেট করেছি, সেটিং কেমন হয়েছে আমাকে জানিয়ে যেও মাঝেমধ্যে।'

কংকাল সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, এ আর বলতে!'

ডাক্তার কী যেন ভেবে নিয়ে বললেন, 'না, তোমার আর আসার দরকার নেই।'

মন-খারাপ করা গলায় কংকাল জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

'কেন আবার, আমার রুগীপত্তর তো সব মানুষ। কেন কখন তোমাকে দেখে ফেলে ভয়টয় পেয়ে কেলেংকারি বাধাবে শেষে।'

ডাক্তারের কথায় যুক্তি আছে। সত্যিই তো, সবাই তো আর ডাক্তারের মতো সাহসী নয়। তাহলে উপায়?

শেষ পর্যন্ত উপায় বার করল কংকালই।

কংকাল বলল, 'দাঁত না থাকলে কংকালরা হাসতে পারে না। আমার হাসি

শুনলেই আপনি বুঝতে পারবেন আমার দাঁত ভাল আছে। আমি মাঝেমধ্যে রাত্তিরে এসে ঘরের বাইরে থেকে হাসি শুনিয়ে যাব আপনাকে।'

ডাক্তার হাসতে হাসতে বললেন, 'বাহ্! দারুণ বুদ্ধি বেরিয়েছে তো তোমার করোটি থেকে।'

সেই থেকে চার-ছ মাস অন্তর মাঝরাতে ডাক্তারের বাড়ির পাশে ভয়ংকর এক হাসির শব্দ শোনা যায়। হাসি শুনে ডাক্তার বুঝতে পারেন, কংকালের দাঁত ভাল আছে। কিন্তু ইদানীং ছোট্ট একটা গোলমাল দেখা দিয়েছে। তার জন্য অবশ্য কংকাল বেচারার কোনো দোষ নেই। কংকালটার বয়স হয়েছে অনেক, বয়েস হলে চোখে একটু কম দেখে সবাই, আর ভীমরতিও ধরে কারও-কারও। তা, এই কংকালটার দুটোই হয়েছে। তাই সে মাঝে মধ্যে অন্য পাড়ায় গিয়ে অন্য বাড়ি ডাক্তারের বাড়ি ভেবে নিয়ে বিকট ওই হাসি হেসে ফেলে। রক্ত-হিম-করা ওই হাসি শুনে চমকে ওঠে সবাই।

কথাটা আমার কানে গেছে বলে তোমাদের জানিয়ে দিলাম। রাত্তিরবেলায় হঠাৎ ওরকম হাসি শুনতে পেলে ভয় পেয়ো না কিন্তু।

জোড়া খুনের তদন্ত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় হুগলি সেতু হওয়ার পরে মৌড়িগ্রামের গুরুত্ব বেড়ে গেলেও আমার চার কাঠার নিরালাবাসের শান্তি কিন্তু বিঘ্নিত হয়নি। ছোট্ট এই দোতলা বাড়িটায় রাখহরিকে নিয়ে আমি বেশ শান্তিতেই আছি। আমার এখানে আশ্রয় পেয়ে অনাথ ছেলেটার যেমন একটা হিল্লে হয়েছে, আমিও তেমনই ওর মতো একজনকে পেয়ে বর্তে গেছি।

সত্যি, কত কাজই না করে ছেলেটা। ভোরে উঠে আমাকে কফি খাওয়ায়। তারপর ঘরদোর পরিষ্কার করে। চা-জলখাবার দেয়। দু'জনের জন্য দুটো ডিমসেদ্ধ আর মাখন-টোস্ট চটপট করে ফেলে ও। বেলা দশটার মধ্যে রান্নাও শেষ। ছুটির দিন অনেক কিছুই করে। খুব বিশ্বাসী ছেলে। লেখাপড়াতেও অমনোযোগী নয়। গল্পের বই তো পেলে ছাড়ে না। সবচেয়ে বেশি নজর দেয় আমার শরীরের দিকে। এক-এক সময় মনে হয়, ছেলেটি কি গতজন্মে আমার কেউ ছিল?

রোজকার মতো আজও সকালে উঠে বাগানে পায়চারি করছি। নানারকম ফুলগাছে আমার সাজানো বাগান। বাগানের এককোণে একটা শ্বেতরঙ্গনের গাছ ফুলে-ফুলে ভরে আছে। আমি যখন সেই গাছটার কাছাকাছি এসেছি, তেমন সময় পেছনে থেকে রাখহরি ডাকল, "দাদাবাবু!"

"কী ব্যাপার রাখহরি?"

"এক দিদিমণি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"বসতে বলো।"

"একটু তাড়াতাড়ি আসুন। মনে হচ্ছে খুবই জরুরি।"

আমি আর একটুও দেরি না করে সঙ্গে ঘরে এলাম। ঘরে গিয়ে যাকে দেখলাম, তাকে দেখেই চমকে উঠলাম, "এ কী, সুজাতা!"

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা কিশোরী সুজাতা একটা মিনি স্কার্ট পরে সোফায় হেলান দিয়ে বসে ছিল। আমার সাড়া পেয়েই অশ্রুসজল চোখে ধরা-ধরা গলায় বলল, "অম্বরদা!"

"কী হয়েছে তোমার?" কাঁদছ কেন তুমি?"

"বাবা।"

"বাবার কী হয়েছে?"

আর থাকতে পারল না সুজাতা। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "বাবা নেই।"

"সে কী, দয়াময় নেই!"

"না। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাবা আর চোখ মেলে তাকাচ্ছেন না। কত ডাকলাম বাবাকে। বাবুয়া কত কাঁদল 'বাবা বাবা' করে, কিন্তু বাবা সাড়া দিলেন না।"

"তারপর?"

"তারপর আর কী? পাড়ার লোকেরা গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনলেন। ডাক্তারবাবু এসে বাবাকে দেখেই বললেন, বাবা নেই। ডেথ সার্টিফিকেটও দিলেন না। বললেন, বাবা মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। পুলিশ কেসের ব্যাপার এটা।"

"তার মানে?"

আমি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, "বাড়িতে কে আছে এখন?"

"বাবুয়া আছে বাবার মরদেহের কাছে। আর আছে পাড়ার লোকজন।"

"চলো, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।"

সুজাতা আবার কান্না শুরু করল। কাঁদুক। কাঁদলে মনটা হালকা হয়। আমি পোশাক পরিবর্তন করে থানায় একটা ফোন করলাম। তারপর সদ্য কোন স্কুটারটা বের করে ওকে বললাম, "বোসো।"

সুজাতা বলল, "আমি হেঁটেই যেতে পারব।"

"পারলেও যেয়ো না। আমাকে শক্ত করে ধরে বোসো। এখনই পৌঁছে যাব, এটা থাকতে হাঁটবে কেন?"

সুজাতা বসলে আমি ওকে নিয়ে ওদের বাড়িতে এলাম।

পুলিশ তখনও আসেনি। বাড়িতে ঢুকেই যে-ঘরে দয়াময় থাকতেন, সেই ঘরে আগে গেলাম। দয়াময় একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। অত্যন্ত ভালমানুষ তিনি। কয়েক বছর হলো স্ত্রী মারা গেছেন। আমার কাছে আসতেনও মাঝে-মাঝে। আমার বাগানের শ্বেতরঙ্গনের গাছটা ওঁরই দেওয়া। সেই দয়াময় নেই, এ কি ভাবা যায়? আর দু-চার বছর পরে মেয়ে একটু বড় হলে তার বিয়ে দেবেন, ছেলেকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাবেন, কত স্বপ্ন ছিল তাঁর। এখন সংসারটাই ভেসে গেল।

আমি ভালভাবে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ পায়ের বুড়ো আঙুলের মাথায় একটা সুচ অথবা পিন বেঁধার মতো দাগ দেখতে পেলাম। সেখানটায় এমনভাবে রক্ত জমে আছে যে, খুব ভালভাবে লক্ষ্য না করলে বোঝা যাবে না। যে-ডাক্তারবাবু এখানে এসেছিলেন, তিনি খুবই অভিজ্ঞ বলতে হবে। না হলে অন্য কেউ হলে হয়তো হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বলেই ডেথ-সার্টিফিকেট লিখে দিতেন।

আমি সুজাতাকে বললাম, "তোমরা কোন ঘরে শোও?"

সুজাতা ওদের ঘর দেখিয়ে দিল। যে ঘরে মা শুতেন সেই ঘরে সুজাতা ও বাবুয়া শোয়। পাশের ঘরে দয়াময়। শোওয়ায় সময় দু'ঘরের দরজাই খোলা থাকে। বন্ধ থাকে শুধু বাইরের দরজাটা। আততায়ী তা হলে কোন্ পথে এসেছিল?

আমি সুজাতাকে বললাম, "দু'ঘরের দরজা খোলা থাকলেও বাইরের দরজা বন্ধ ছিল তো?"

সুজাতা বলল, "হ্যাঁ। আমি নিজে হাতে বন্ধ করেছিলাম।"

"তা হলে?"

আমি এবার ঘরের মেঝেয় আততায়ীর পায়ের ছাপ লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু না। সেসবের কোনও বালাই নেই। তবে অদ্ভুত রকমের একটা চ্যাপটা দাগ ঘরময় চলে বেড়িয়েছে। সেটা জানলার কাছে, ঘরের মেঝেয়, সর্বত্র বিচরণ করেছে। এমনকি, সুজাতার ঘরেও ঢুকেছিল সেটা। সেটা না জুতোর দাগ, না পায়ের।

একটু পরেই নতুন ইনস্পেক্টর পুলিশ নিয়ে ভেতরে ঢুকে সব কিছু লিখে-টিখে মৃতদেহ মর্গে পাঠালেন। আমি পুলিশকে তাদের কাজ করতে দিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছে গেলাম। ডাক্তারবাবুর নাম অনাদি সামন্ত। বয়সে তরুণ। উনি তখন কয়েকজন রোগীকে যত্ন করে দেখছিলেন। আমি গিয়ে পরিচয় দিয়ে দয়াময়ের নাম করতেই উনি বললেন, "ওই ভদ্রলোকের ডেথ সার্টিফিকেট আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। ভদ্রলোককে বেশ ঠাণ্ডা মাথায় এবং পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে।"

"আমি আপনার কাছে ডেথ সার্টিফিকেট চাইতে আসিনি। এসেছি অন্য ব্যাপারে। আপনি ওটাকে খুন বলছেন কেন?"

"ওঁর পায়ের কাছটা একটু লক্ষ্য করবেন, তা হলেই বুঝতে পারবেন আমার অনুমান ঠিক কিনা।"

"তা হলে আপনি বলতে চান....।"

"কোনও সুচ অথবা আলপিনের মুখে মারাত্মক বিষ প্রয়োগ করে মৃত্যু ঘটানো হয়েছে ভদ্রলোকের।"

" স্ট্রেঞ্জ!" আমি নীরবে সেখান থেকে আবার চলে এলাম সুজাতাদের বাড়িতে। কী চতুর খুনি। আমি এ-ঘর, ও-ঘর, সে-ঘরে ঢুকে সেই দাগগুলো লক্ষ্য করে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। মেঝেয় অল্প ধুলো না থাকলে এই দাগ বোঝা যেত না। হঠাৎ দাগ ধরে যেতে-যেতে সুজাতার ঘরে এসে ওর বুক-শেল্‌ফের কাছে গিয়ে এমনই একটা জিনিস পেয়ে গেলাম, যা দেখে বিস্ময়ের অন্ত রইল না। জিনিসটা আমি একটা পলিপ্যাকে মুড়ে যত্ন করে পকেটে পুরলাম। তারপর বিদায় নিয়ে সোজা চলে এলাম নিজের বাসায়। কোনও বুদ্ধিতেই এর ব্যাখ্যা পেলাম না। এ-জিনিস সুজাতার ঘরে কী করে আসে? চোদ্দ বছরের একটা মেয়ে এত বড় একটা ঝুঁকি কী করে নিতে পারে? তাছাড়া এ-কাজ সে করবেই বা কেন?

একসময় রাখহরি এসে বলল, "দাদাবাবু, চা!"

বললাম, "না, থাক। একটু পরেই স্নান করে খেতে যাব। তারপর মর্গে যাব একবার।"

নির্বাক রাখহরি নতমস্তকে তার নিজের কাজে চলে গেল। আমি পকেট

থেকে সেই ভয়ঙ্কর জিনিসটা বের করে টেবিলের ওপর রেখে বারে বারে দেখতে লাগলাম।

দয়াময়ের সৎকার্য সেরে যখন ঘরে ফিরলাম তখন রাত একটা। ক্লান্ত দেহে বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করতে লাগলাম। সুজাতার শুভ্র সুন্দর পবিত্র মুখখানি চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে সুজাতার ঘরে পাওয়া জিনিসটার একটুও পার্থক্য নেই। কিন্তু এ-জিনিস সুজাতার ঘরে এল কী করে? আমি অনেকক্ষণ ধরে এই ব্যাপারে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম একসময়।

ঘুম ভাঙল রাখহরির ডাকে, "দাদাবাবু, দাদাবাবু!"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কেন রে?"

"বাগানে একটা লাশ।"

লাশ! এক অজানা আশঙ্কায় বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমার এখানে লাশ কী করে আসবে? কার লাশ! দয়াময়ের খুনের সঙ্গে কি এই হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগসূত্র আছে? না হলে আততায়ী লাশটিকে আমার বাগানেই বা রেখে যাবে কেন? যেহেতু, আমি এই হত্যাকাণ্ডের একজন তদন্তকারী গোয়েন্দা, তাই আমাকে ভয় দেখানোর জন্যই এ-কাজ করেছে নিশ্চয়ই।

আমি কোনওরকমে চোখে-মুখে একটু জল দিয়েই ছুটে গেলাম বাগানে। এক জায়গায় একটা রক্তকরবীর গাছ ছিল। সেই গাছের নীচেই পড়ে ছিল লাশ। সকালের সোনা রোদ এসে তার ফ্যাকাসে মুখে লুটিয়ে পড়েছে। এরও কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। শুধু কপালের ওপর পিন-বেঁধা ছোট্ট একটুকরো কাগজে লেখা আছে, "এবার তোমার পালা।"

আমি চিরকুটটা পকেটে রেখে যুবকের মুখের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ঘরে এসে ফোন করলাম, "হ্যালো, পুলিশ স্টেশন! অম্বর চ্যাটার্জি স্পিকিং।"

ওদিক থেকে উত্তর আসতেই বললাম, "এবার আমার পালা।"

"তার মানে?"

"ডাক্তার সামন্ত, মানে যিনি আমাদের দয়াময়ের ডেথ সার্টিফিকেট না দিয়ে মৃতদেহ মর্গে পাঠিয়েছিলেন, তিনি এখন আমার বাগানে প্রাণহীন দেহে ঘুমোচ্ছেন। তাঁকেও একটু কষ্ট করে মর্গে নিয়ে যান।"

"আমরা এক্ষুণি যাচ্ছি।"

আমি কোনও কথা না বলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম।

একটু পরেই পুলিশ এল। তদন্ত হল। বাগানে ঘাসের গালিচায় আততায়ীর চরণচিহ্ন বোঝা গেল না।

নতুন ইনস্পেক্টর বললেন, "গেটে তো তালা দেওয়া। লাশ এখানে বয়ে আনল কী করে?"

আমি বললাম, "কমদামি তালা তো, এমনও হতে পারে, নকল চাবিতে গেট খুলে, যাওয়ার সময় আবার তালার কল টিপে দিয়ে গেছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, 'হতে যে পারে না, তা নয়। তবে মিঃ চ্যাটার্জি,আপনি যতই বলুন, দয়াময়ের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে আমরা কিন্তু মেয়েটাকেই সন্দেহ করছি।"

"সেটা আপনাদের ব্যাপার। তবে সন্দেহ করবার আগে একবার অন্তত ভেবে দেখা উচিত ছিল, কোনও মেয়েই তার বাবাকে ওইভাবে হত্যা করতে পারে না। এবং ও জিনিস সংগ্রহ করাও অল্পবয়সী একটি মেয়ের পক্ষে অসম্ভব।"

"মোটেই অসম্ভব নয়, মনে করুন না এর ভেতরে আমার কি আপনার মাথাই যদি কাজ করে, তা হলে কি সত্যিই অসম্ভব?"

এঁর কথার কী উত্তর দেব, ভেবে না পেয়ে আমি চুপ করে রইলাম। উনি আবার বললেন, "বদ্ধ ঘরের মধ্যে দয়াময়কে খুন নিশ্চয়ই ভূতে করেনি?"

"অদ্ভুত কিছুতে করেছে। না হলে ঘরের ভেতর ওইসব দাগ আসে কোত্থেকে? দয়াময়ের খুনের ব্যাপারে যদি মেয়ে সন্দেহভাজন হয়, তা হলে এইখানকার খুনের ব্যাপারে আমাকেই সন্দেহ করুন।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "চ্যাটার্জিবাবু, এই ব্যাপারে আপনিও কিন্তু সন্দেহমুক্ত নন। আপনার এখানে আসব বলে সবাই যখন তৈরি হয়েছি, ঠিক তখনই এমন একটা ফোন এল যা শুনলে আপনিও চমকে উঠবেন।"

"কীরকম শুনি?"

"আপনি নাকি সুজাতাকে বাঁচাবার জন্য পুলিশ আসবার আগেই বাড়িতে ঢুকে অনেক প্রমাণ লোপ করেছেন। আর সামন্ত ডাক্তারকে শাসিয়েছিলেন দয়াময়ের ডেথ সার্টিফিকেট লিখে না দিলে তাকে খুন করা হবে বলে। যেহেতু সামন্ত ডাক্তার আপনার প্রস্তাবে রাজি হননি, তাই আপনিই ওকে খুন করে আপনার বাগানে ফেলে রেখেছেন। এবং যেহেতু আপনি নিজেই একজন তদন্তকারী গোয়েন্দা, তাই সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য পুলিশকে ফোন করে

ডাকিয়ে এনেছেন এখানে।"

রাগে লাল হয়ে উঠল আমার মুখ। ঘটনা যা, তাতে এইরকমই মনে হয়। ইনস্পেক্টরও নতুন, তাই আমাকেই সন্দেহ করছেন। বললাম, "ঠিক আছে। আপনি আপনার ফর্মে কাজ করে যান। আমিও আমার কাজ করে যাব। এখন, চলুন, একটু চা-টা খেয়ে ফিল্ডে নামা যাক।"

সবাই ভেতরে এলে রাখহরিকে চা করতে হলে আমার উকিল বন্ধু রণেন্দুকে একটা ফোন করলাম। রণেন্দু ফোন ধরলে বললাম, "ভাই, কোনও দুষ্টচক্র আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছে। এখানকার নতুন ইনস্পেক্টরও আমার সহযোগী নন। এই ব্যাপারে আমি তোমার একটু সাহায্য চাই। হয়তো ওরা পরিকল্পনা করে আমাকে অ্যারেস্ট করিয়ে তদন্তের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। সাক্ষাতে সব বলব। পারলে তুমি আজই একবার দেখা করো আমার সঙ্গে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "আরে, দুর মশাই। আপনি কি সত্যিই ভাবলেন? আমি রসিকতা করছিলাম আপনার সঙ্গে।"

আমি বললাম, "সত্যি-মিথ্যে জানি না। আমি আমার দিকটা নিরাপদ করে রাখলাম। আপনি এখানে নতুন এসেছেন, আমাকে চেনেন না। তাই উড়ো-ফোনে বিভ্রান্ত হয়েছেন, এতেই আপনার বোঝা উচিত, এর পেছনে একটা চক্র আছে।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "চক্র তো একটা আছেই। তবে কিনা এই প্রাণঘাতী বিষের শিশি আর সুচটা যে আপনার টেবিলে কী করে এল, তা কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না।"

আমি যে কী উত্তর দেব, ভেবে পেলাম না।

ইনস্পেক্টর একটু বিদ্রূপ করে বললেন, "দেখুন, এটাও হয়তো খুনিরা আপনাকে জালে জড়াবার জন্য কোনও ফাঁকে রেখে গেছে।"

আমি বললাম, "না। ওটা খুনিরা রেখে যায়নি। আমিই ওটাকে গতকাল নিয়ে এসেছি দয়াময়ের ঘর থেকে। সুজাতার বুক-শেল্‌ফের মধ্যে এটা ছিল। সম্ভবত সুজাতাকে জড়াবার জন্য খুনির এটা চতুর পরিকল্পনা।"

"সেটা আপনি পুলিশকে জানাননি কেন?"

"আমার কাজে সুবিধের জন্য।"

ইনস্পেক্টর বললেন, "কাজটা ভাল করেননি চ্যাটার্জিবাবু, এটা আমরা নিয়ে যাচ্ছি।"

চা-পর্ব শেষ করে ইনস্পেক্টর তাঁর লোকজন নিয়ে চলে গেলেন। আমি রাগে, উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম। একটু পরেই রণেন্দু এলে তাকে সব কথা খুলে বললাম। সব শুনে রণেন্দু বলল, "মনে রাখিস তুই সরকারি গোয়েন্দা নস্ একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা। তোকে এরা নানাভাবে ফাঁসাতে পারে। যাই হোক, আমি ওপর মহলে যোগাযোগ করছি তোর ব্যাপারে। তুই শুধু জেনে রাখ, ওই ইনস্পেক্টর তোর কিছু করতে পারবে না।"

রণেন্দু চলে গেলে আমি সামান্য একটু জলযোগ সেরে সোজা চলে গেলাম ডাক্তার সামন্তর ওখানে। সেখানে তখন লোকজনের ভিড়, কান্নাকাটি। ওঁর ডিসপেনসারিতে যে লোকটি থাকে, তাকে আড়ালে ডেকে এনে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সে বলল, "হ্যাঁ, সামন্তদাকে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে না দিলে খুন করা হবে, এমন একটা হুমকি ফোন মারফত দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু উনি রাজি হননি তাতে। আর তারই পরিণাম এই।"

"কাল কখন থেকে উনি বাড়ি ছিলেন না?"

"রাত ন'টার পর একটি ছেলে এল ওঁকে নিয়ে যাবে বলে। সেই যে গেলেন, আর ফিরলেন না।"

"ছেলেটিকে চেনো?"

"দেখলে চিনতে পারব। বাজারে অনেকবার দেখেছি ওকে। নাম জানি না। তবে এলাকার ছেলে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে আমার স্কুটারে চাপিয়ে বড় রাস্তায় নিয়ে এলাম। তারপর বাজারের কাছাকাছি আসতেই সে বলল, "ওই তো, ওই ছেলেটা।"

ছেলেটি তখন ওকে দেখেই দৌড়।

আমি ছুটে গিয়ে তাকে ধরলাম। ততক্ষণে আরও অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে। আমি ইশারায় সকলকে চলে যেতে বলে ছেলেটিকে একান্তে এনে বললাম, "কাল ডাক্তারবাবুকে তুই কোথায় নিয়ে গিয়েছিলি? কার অসুখ করেছিল?"

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে বলল, "কারও না।"

"তা হলে কেন ডেকেছিলি?"

"আমাকে ডালিমদা পাঠিয়েছিল। এর বেশি আমি কিছুই জানি না।"

"তুই জানিস, ডাক্তারবাবুর কী হয়েছে?"

"জানি। আমাকে ছেড়ে দিন, আপনারর দুটি পায়ে পড়ি।"

"ডালিমদা কোথায় থাকে?"

ছেলেটি চুপ করে রইল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, "বল্ কোথায় থাকে?"

"চলুন, বাড়িটা আমি দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

আমি বাড়ি দেখে সুজাতাদের ওখানে গেলাম। আমাকে দেখেই সুজাতা বলল, "কাল থেকে পুলিশ আমাকে জ্বালিয়ে মারছে, অম্বরদা। মাঝে-মাঝে আসছে আর এমন ধমকাচ্ছে যেন বাবাকে খুন আমিই করেছি।"

"আমি সব জানি। তবে কয়েকটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব। তুমি ঠিকঠাক উত্তর দেবে কিন্তু।"

"বলুন।"

"তোমাদের আত্মীয়স্বজন সত্যিই কি কেউ কোথাও নেই?"

"না। এক-দূর সম্পর্কের কাকা আছেন। তিনি শিবপুরে থাকেন। যোগাযোগ রাখেন না।"

"ইদানীং কোনও ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে তোমাদের মনোমালিন্য হয়েছিল?"

"যোগাযোগই যেখানে নেই, সেখানে মনোমালিন্যের প্রশ্নই ওঠে না।"

"তুমি ডালিমকে চেনো?"

ডালিমের নাম শোনামাত্রেই চমকে উঠল সুজাতা। বলল, "চিনি। এই ব্যাপারে ওর কি কোনও হাত আছে?"

"তোমাকে যা জিজ্ঞস করছি, তার উত্তর দাও।"

"গত বছর কালীপূজোর সময় ডালিম আমার বাবার কাজে হাজার-এক টাকা চাঁদা চায়। বাবা দিতে রাজি হননি বলে ডালিম বাবাকে শাসিয়েছিল এর পর এখানে বাজার করতে বা ব্যাঙ্কে এলে মজা দেখাবে বলে। ওখানকার ব্যাঙ্কের লকারে আমাদের অনেক গয়না এবং স্থায়ী আমানতে টাকাও আছে অনেক। ডালিমের এক পরিচিত লোক ওই ব্যাঙ্কে কাজ করে। সম্ভবত তার মারফতই জেনেছে ডালিম।"

"তারপর?"

"তারপর একদিন আমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্কুল থেকে ফিরছি, ডামিল হঠাৎ খুব জোরে স্কুটার চালিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। ভাগ্য ভাল যে, হাত-পা ভাঙেনি। পড়ে গিয়ে একটু চোট পেয়েছিলাম শুধু। পরদিন বাবা ওদের বাড়ি গিয়ে ওর বাবাকে অভিযোগ করলে আমার

বাবাকে উনি দারুণ অপমান করে তাড়িয়ে দেন। বলেন, জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ না করতে।"

"তোমার বাবা থানায় গেলেন না কেন?"

"বাবা হয়তো বেশি ঝামেলা চাননি। আর থানার কথা বলছেন তো? ডালিমের বাবা কে জানেন?"

"কে শুনি?"

সুজাতার মুখে নামটা শুনেই মাথা গরম হয়ে উঠল আমার। বললাম, "বুঝেছি। সেইজন্য ইনস্পেক্টরের এত দেমাক। পেছনে তা হলে ঘুঘুর ঘুঘু আছে। ঠিক আছে, ঘুঘুর ফাঁদ আমিও পাতছি।"

এরপর বাড়ি এসে খাওয়াদাওয়া করে সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার গেলাম গোয়েন্দাগিরি করতে। ডালিমের বাড়ির পাশ দিয়ে দু-একবার যাতায়াত করে একটা দোকানে বসে ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিলাম। দোকানদার বলল, "অত্যন্ত মন্দ চরিত্রের ছেলে এই ডালিম। বাপ দুষ্টচক্রের লোক, তার ওপর অন্য ক্ষমতাও রাখেন। কাজেই ছেলের উচ্ছন্নে যাওয়ার পথ একেবারে পরিষ্কার। এখন ওর আর-এক বাজে সঙ্গী নেলোকে নিয়ে একটা গ্রিল তৈরির দোকান করেছে। তাও লোকের কাছ থেকে টাকা অ্যাডভান্স নেয়, জিনিস ডেলিভারি দেয় না ঠিকমতো। এই নিয়ে রোজই ঝামেলা লেগে থাকে। ওই দেখুন, নেলো আসছে। ওর দুটো পায়েরই আঙুল নেই। খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে। আর...."

আর কিছুই শোনবার দরকার নেই আমার। গ্রিলের দোকান শুনেই শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হয়ে গেছে। দয়াময়ের একবারও সেগুলো পরীক্ষা করবার কথা মনে হয়নি কারও। আমি আর এক মুহূর্তও দেরি না করে সুজাতাদের বাড়িতে এলাম। যা ভেবেছি, তাই। শিয়রের জানলার গ্রিলটা নড়বড় করছে। আততায়ী এই পথেই এসেছিল। যাওয়ার সময় চোখে ধোঁয়া দেবে বলে গ্রিল আবার ফিট করে একটা-দুটো স্ক্রু আলাগাভাবে এঁটে দিয়ে পালিয়েছে।

সফলতার আনন্দে আমি তখন দারুণ উত্তেজিত হয়েছি। সুজাতাকে একটু সাবধানে থাকতে বলে সোজা চলে এলাম রণেন্দুর বাড়িতে। ওকে সব কথা খুলে বলতেই ও বলল, "এখন ছলে, বলে, কৌশলে নেলোর জবানবন্দি নিয়েই ডালিমকে ফাঁদে ফেলতে হবে। সরাসরি ডালিমকে আক্রমণ করা ঠিক

হবে না। হাজার হলেও ওর বাবার নামডাকের ব্যাপার আছে তো, খুঁটির জোরও আছে।"

"এ-কাজটা তা হলে তোমাকেই করতে হবে ভাই। আমি আড়ালে থাকব।"

"তাই থেকো।"

"ওদিকের কাজ কিছু কি এগোল?"

"ওপর মহলে কথাবার্তা হয়েছে। সদর দফতরের কিছু সাদা পোশাকের পুলিশ এখন ঘোরাফেরা করছে বাড়িটার আশপাশে।"

"ধন্যবাদ।"

আমি রণেন্দুকে নিয়ে ডালিমের দোকানে এলাম। সুন্দর ছিপছিপে চেহারার ডালিম কিসের যেন হিসেবনিকেশ করছিল দোকানের ভেতর। আর নেলো বাইরের রাস্তায় গ্রিলের পেটি নাড়াচাড়া করছিল।

রণেন্দুর গাড়িটা ছিল বড় রাস্তায়। আমার স্কুটার আমার কাছে। পরিকল্পনামতো আমি দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। রণেন্দু গিয়ে নেলোকে বলল, "এই যে ভাই, একবার আমার বাড়িতে গিয়ে একটা গেট আর কয়েকটা জানলার মাপ নিয়ে আসতে হবে যে।"

নেলো বলল, "এখন হবে না। কাল সকালে আসবেন।"

"কাল আমি থাকব নারে ভাই। আমি এখনই গাড়ি করে নিয়ে যাব, নিয়ে আসব। অ্যাডভান্সও দেব দু'হাজার টাকা।"

"কোথায় আপনার বাড়ি?"

"বেশিদূরে নয়, ওই যে নতুন কোয়ার্টারগুলো হচ্ছে, ওর পাশেই।"

ডালিম ভেতরে থেকে বলল, "যা, নিয়ে আয় চট করে।"

রণেন্দু নেলোকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর আমি ইচ্ছে করেই ডালিমকে দেখা দেব বলে ওর দোকানের সামনে স্কুটার থামালাম। তারপর আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়ে চলে এলাম আবার। ডালিমের মুখ তখন শুকিয়ে এতুটুকু।

রণেন্দুর গাড়িটা একসময় দয়াময়ের বাড়ির সামনে এসে থামল। ওদের অনুসরণ করে আমিও তখন এসে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির দিকে তাকিয়েই আঁতকে উঠল নেলো। তারপর বিকট একটা চিৎকার করে শুরু করল প্রাণপণে ছোটা। কিন্তু যাবে কোথায় বাছাধন? সাদা পোশাকের পুলিশরা ধরে ফেলল তাকে। তারপর-দু-চার ঘা দিতেই "বাবা রে, মা রে....।"

আমি ওর কাছে গিয়ে চুলের মুঠি ধরে বললাম, "কিরে, আমাকে চিনতে পারিস?"

নেলো আমার পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বলল, "খুব চিনি দাদা। কিন্তু আমার কোনও দোষ নেই। সবের মূলে ডালিম। ও-ই আমাকে দিয়ে এইসব করিয়েছে।"

"আমার বাগানে সামন্তর লাশ ফেলে এসেছিল কে?"

"আমরা দু'জনেই ছিলাম।"

"গ্রিল খুলে ঘরের ভেতরে ঢুকেছিল কে?"

"আজ্ঞে, আমি। ডালিম বলেছিল, পায়ে ন্যাকড়া বেঁধে পাতার ওপর দিয়ে ভর করে চলতে—যাতে ছাপ না পড়ে। কাজ হয়ে গেলে মেয়েটার ঘরে বিষের শিশি আর সুচটা রেখে আসতে। সেইমতোই কাজ করেছিলাম।"

"দয়াময়কে খুন করা হল কেন?"

"ডালিম প্রতিশোধ নেবে বলেছিল, তাই। তা ছাড়া বাবাকে মেরে মেয়েটাকে শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর। কেননা, মেয়েটা প্রায়ই ওকে অপমান করত।"

"এবং যেহেতু ডাক্তাবাবু সার্টিফিকেট দেননি, তাই তাঁকেও সরিয়ে দেওয়া হল। তা নেলোবাবু, ডালিমের না হয় শাঁসালো বাবা আছে, কিন্তু তোমার কী হবে?"

নেলো আর কিছু বলার আগেই জোরালো একটা শব্দের সঙ্গে চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল। কী জোরে একটা বোমা ফাটল। নেলো চিৎকার করেই বসে পড়ল, "বাবা রে।" ওর পায়ে একটা টুকরো এসে লেগেছে। ভাগ্যে দূর থেকে ছুঁড়েছিল। না হলে আমরা সবাই জখম হতাম। ঘটনাটি এমনই আকস্মিক যে, পুলিশরাও হতচকিত।

আমি তারই মধ্যে স্কুটার নিয়ে ধাওয়া করলাম সেই শয়তানকে। আমি ওর অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে বললাম, "যতই চেষ্টা করো, তুমি পালিয়ে বাঁচবে না ডালিম। তুমি যে খুনি, তা প্রমাণ হয়ে গেছে। তাই, ভাল চাও তো এখনও ধরা দাও।"

ডালিম অনেক জোরে স্কুটার চালাচ্ছিল। আমার কথা শুনতে পেল কি না কে জানে, একবার শুধু ঘাড় বাঁকিয়ে আমাকে দেখেই আরও স্পিড নিল। এবার সে নবনির্মিত দ্বিতীয় সেতুর পথ ধরল। আলোকমালায় সজ্জিত

সন্ধেরাতের সেতুর ওপর এ এক মারণ অভিযান। আমাদের দু'জনের স্কুটারই তখন প্রচণ্ড গতি নিয়েছে। ধরা পড়বার ভয়ে ডালিম এত জোরে স্কুটার চালাচ্ছে যে, ওর সঙ্গে আমি পেরে উঠছি না। আমার কাছে অটোম্যাটিকটাও আছে। কিন্তু এইরকম অবস্থায় সেটাকে ব্যবহার করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। সেতুর দু'পাশের জনতা তখন আমাদের স্কুটার-দৌড় দেখছে। আতঙ্কিত জনতার চোখের সামনে ডালিমের স্কুটার টোলের দিকে না গিয়ে হঠাৎ রং সাইডে ঘুরে যেতেই অন্যদিক থেকে একটা ভারী ট্রাক এসে ধাক্কা মারল সেটাকে। স্কুটারটা ছিটকে পড়ল কয়েক হাত দূরে। আর ডালিম? তার প্রাণহীন দেহটা ব্রিজের ওপর গিয়ে পড়ল শালিমার ইয়ার্ডের একটা ধাবমান মালগাড়ির মাথায়।

হইহই করে অনেকেই ছুটে এসেছে তখন। পলাতক লরিটিও চোখের পলকে বেপাত্তা। আর ডালিমের দেহটা মালগাড়ির মাথায় শুয়ে কোথায় যে চলে গেল, কে জানে?

অপরাধী তার শাস্তি পেয়েছে। শত্রুর শেষ দেখে আমিও ফিরে এলাম। আমি যখন ফিরে এলাম, নেলোর হাতে তখন হাতকড়া। চারদিকে থিকথিক করছে পুলিশ। সেই ইনস্পেক্টরও এসেছেন। আমি ডালিমের ব্যাপারে বিবৃতি লিখে ওঁর হাতে দিতেই তিনি বললেন, "আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম মিঃ চ্যাটার্জি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।"

আমি হেসে বললাম, "আরে কী আশ্চর্য! ক্ষমা করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আপনার কর্তব্য পালন করতে এসে যা করণীয়, ঠিকই করেছেন।"

সে-রাতে দয়াময়ের বাড়ি পুলিশ পাহারায় রেখে সুজাতা ও বাবুয়াকে আমার বাসায় নিয়ে এলাম। পরে ওদের ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে কিছু একটা করা যাবে। এখন তো ওরা আশ্রয় পাক।

ডিমাপুরের ডিম রহস্য

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কোহিমা থেকে ডিমাপুরে ফিরে উঠলাম সারকিট হাউসে। ইচ্ছে ছিল, সারকিট হাউসে দু-একদিন কাটিয়ে ডিমাপুরের আশপাশ ঘুরে প্লেনে চেপে কাকার সঙ্গে ফিরে যাবো কলকাতা। কিন্তু তা' আর হ'লো না।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়া করে সবে নিজেদের ঘরে ফিরে এসেছি, এমন সময় দরজায় ঠক ঠক শব্দ।

কাকা দরজা খুলতেই আমাদের ঘরের বেয়ারা বলল, "বোস সাব, আপকা টেলিফোন।'

কি ব্যাপার। এত রাতে আবার কে টেলিফোন করছে। আবার লাল সিংকে নিয়ে কোন ঝামেলা হলো নাকি।

'নাঃ, এরা দেখছি, আমাকে একদিনও নিশ্চিন্ত থাকতে দেবে না।'

সৃজনকাকা একটু চিন্তিত গলায় বললেন, 'চল তো বাদল, দেখে আসি, এত রাতে আবার কে ফোন করছে।"

ঘুমে তখন আমার চোখ ঢুলুঢুলু। তবু চোখ কচলাতে কচলাতে কাকার সঙ্গে নিচে চললাম ফোন ধরতে।

'হ্যালো, সৃজন বোস স্পিকিং—'

ফোনের ও প্রান্ত থেকে গলা ভেসে এলো, 'মিঃ বোস আমি ডঃ ভাটনগর বলছি। আপনি কি চিনতে পারছেন আমাকে?'

খানিকক্ষণ ভেবে উত্তর দিল কাকা, 'হ্যাঁ নিশ্চয়। আপনি দিল্লীর ডঃ ভাটনগর তো। বছর চারেক আগে বেনারসের সেমিনারে তো আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু আপনি কি এখন ডিমাপুরে—?'

"সে অনেক কথা। খুব বিপদে পড়েছি। ফোনে সব বলা যাবে না। কাল সকালে আমার বাড়িতে একবার আসবেন? সকাল আটটা নাগাদ গাড়ি পাঠাব।'

কাকা আমার দিকে একবার তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে। আটটা নাগাদ তৈরি হয়ে থাকব।'

ঘরে ফিরে কাকাকে বললাম, 'কী ব্যাপার। এখানেও আবার অ্যাডভেনচার নাকি!'

ঘুমোতে যাবার আগে ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। দূরে রহস্যময় নাগা পাহাড়; সামনে ধান-সিঁড়ি নদী জ্যোৎস্নার আলোয় দুধের নদী হয়ে কোথায় বয়ে চলেছে। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, আবার কোন রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে কে জানে!

রাতে বিছানায় শুয়ে অজানা অ্যাডভেনচারের কথা ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

পরের দিন সকালে সৃজনকাকার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

'তাড়াতাড়ি উঠে পড়, ডঃ ভাটনগরের বাড়ি যেতে হবে না?'

ঝটপট বিছানা থেকে উঠে দেখলাম, আমাদের ঘরটা সকালের রোদে ভরে গেছে। বালকনি থেকে চোখে পড়ে, ধানসিঁড়ি নদী কুলকুল করে বয়ে চলেছে। দূরে নাগাপাহাড় ধূসর রহস্যময়।

ঠিক সকাল আটটা নাগাদ, একটা সবুজ রংয়ের জিপ এসে দাঁড়াল সারকিট হাউসের সামনে। গাড়ির ড্রাইভার এক নাগা যুবক। পরে নাম জেনেছি, ইমতি আও। আমাদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল ইংরেজীতে, 'আপনি কি মিঃ সৃজন বোস? আমি ডঃ ভাটনগরের কাছ থেকে আসছি—'

কাকা বললেন, 'চলুন—'

আমি আর সৃজন কাকা জিপে চড়ে বসলাম। আমাদের সঙ্গে কাকার সেই বিখ্যাত বাক্স। আমরা যেখানেই যাই না কেন, কাকার এই বাক্সটি থাকবেই। এতে আছে বেশ কিছু ম্যাপ, ম্যাগনিফাইং গ্লাস, চুম্বক, নানা ধরনের কেমিক্যাল সলিউশন, খুব ছোট সাইজের জাপানী মাইক্রোস্কোপ, আমেরিকান হাতুড়ি, ধারালো ছুরি, শক্ত নাইলন কর্ড, পকেট ট্রানজিস্টর, ছোট টেপ রেকর্ডার, ছোট জাপানী ওয়াকি-টকি ইত্যাদি হাজার রকমের জিনিস। কিন্তু এত জিনিস থাকা সত্ত্বেও বাক্সটা তেমন ভারী নয়। দশ-বারো কেজির বেশি হবে না।

ডিমাপুর শহর ছাড়িয়ে বোকাজানের রাস্তায় একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির সামনে থামল আমাদের জিপ। জিপ থামবার একটু পরেই লোহার দরজা খুলে দিল দারোয়ান। আমাদের জিপ ভেতরে গিয়ে একটা দোতালা বাড়ির সামনে থামলে আমরা জিপ থেকে নামলাম।

আমাদের জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন ডঃ ভাটনগর। সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। লম্বায় প্রায় পৌনে ছ'ফুট। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। বয়স পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যে।

ডঃ ভাটনগর আমাদের দেখে মৃদু হাসলেন, 'হ্যালো মিঃ বোস। ওয়েলকাম টু মাই কটেজ।'

কাকা আর ডঃ ভাটনগর দুজনে করমর্দন করলেন।

কাকা আমার সঙ্গে ডঃ ভাটনগরের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটি আমার ভাইপো বাদল। আমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে।'

'খুব ভালো, খুব ভালো। বেড়ানোর পক্ষে এর চেয়ে ভালো জায়গা আর হয় না। যে ক'দিন এখানে থাকবেন সে ক'দিন আমার এখানেই থেকে যান।'

'কোন আপত্তি নেই, তবে আমাদের জিনিসপত্র যে সারকিট হাউসে থেকে গেছে।'

'সেজন্য কোন অসুবিধে নেই। আমার ড্রাইভার না হয় আপনাদের জিনিসপত্র সারকিট হাউস থেকে নিয়ে আসবে।'

ঘাড় নেড়ে সৃজনকাকা বললেন, 'এবার আপনার সমস্যটা বলুন। আপনার বিপদ—'

'হ্যাঁ, বলব। সবই বলব আপনাকে। সে কথা বলবার জন্যই তো এখানে এনেছি। আমার কী ভাগ্য যে ঠিক সময়েই আপনি ডিমাপুরে ছিলেন।'

'কিন্তু আমি যে এখানে আছি, সেকথা কে বলল আপনাকে?' সৃজনকাকার চোখেমুখে বিস্ময়।

'বাঃ, সেকথা এখানকার কে না জানে। ইম্ফল রেডিয়ো স্টেশন থেকেই তো সেদিন আপনার সম্বন্ধে বলল। আপনি শোনেন নি।'

'না, খবরটা তাহলে মিস করেছি।' সৃজনকাকা হাসলেন। কথা বলতে বলতে বাড়ির ভেতরে একটা ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

ডঃ ভাটনগর বললেন, 'এটা আমার ল্যাবরেটরি। বসুন, এখানেই বসা যাক। এখানে বসেই না হোক গল্প-সপ্প হবে।

ল্যাবোরেটরিটি আকারে বিশাল। নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, দেয়ালে অনেক রঙিন চার্ট। সবকিছু আমার ঠিক হৃদয়ঙ্গম হচ্ছিল না।

একটু পরে একটি নাগা মেয়ে এসে আমাদের সামনে সকালের জলখাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। ওমলেট টোস্ট সন্দেশ আর চা। সকালে খেয়ে আসতে পারি নি, তাই বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। খেতে খেতে আমাদের গল্প শুরু হলো আবার। নিজের কথা বলতে শুরু করার আগে ডঃ ভাটনগর একবার তাকালেন আমার দিকে।

ডঃ ভাটনগরের মনের কথা বুঝতে পেরে কাকা বললেন, 'সংকোচের কিছু নেই ডঃ ভাটনগর। ও আমার অ্যাসিস্টেনটের মতো। ওর সামনে সবকিছু বলতে পারেন।'

ডঃ ভাটনগরের সংকোচ কেটে গেল। উনি বললেন, 'জানেন পরশু রাতে আমার ল্যাবোরেটারি থেকে পাঁচটা ডিম চুরি গেছে। এই ডিম চুরির রহস্য আপনাকে ভেদ করতে হবে—'

আমি সৃজন কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওর মুখ গম্ভীর। কাকার নানা রকম মুডের সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত। তাই বুঝতে কোনও অসুবিধা হলো না, ডঃ ভাটনগরের কথায় কাকা বেশ চটে গেছেন। আর চটে যাবারই কথা। সৃজনকাকার মতো এখন একজন ভারত বিখ্যাত বিজ্ঞানী গোয়েন্দাকে কিনা ডিমচুরির রহস্য ভেদ করতে হবে। ডিম-চুরির রহস্য কাকা নয়, আমিই করতে পারি এই মুহূর্তে। ডঃ ভাটনগরের রাঁধুনি নির্ঘাত ডিমগুলি দিয়ে ওমলেট বানিয়ে খেয়েছে, আর এখন দোষ চাপাচ্ছে চোরের ঘাড়ে।

ডঃ ভাটনগর বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই

মুচকি হেসে বললেন, 'মিঃ বোস কিছু মনে করবেন না। এই ডিম কিন্তু খাওয়ার ডিম নয়। হাঁসের ডিমের মতো দেখতে এই ডিম আসলে সোলার ফুয়েল। কয়েকটি জটিল রাসায়নিক জিনিস দিয়ে এই ডিমগুলো তৈরি করেছি ল্যাবোরেটরিতে। তারপর বিশেষ পদ্ধতিতে এই ডিমগুলির সঙ্গে সূর্যরশ্মির বিক্রিয়া ঘটিয়েছিল ল্যাবেরোটরিতে। এই বিক্রিয়া ঘটাতে সময় লাগে সাত থেকে দশ দিন।' এইরকম একটি ডিম দিয়ে ছোট সাইজের একটা এরোপ্লেন চালানো যাবে অন্তত ঘন্টা পাঁচেক।'

ডঃ ভাটনগরের কথা শুনে সৃজনকাকা বললেন, 'সত্যি! আপনি তো অসাধ্য সাধন করেছেন। কিন্তু এসব ফরমূলা আপনি কোথায় পেলেন? এ কি আপনার নিজের নাকি কারো কাছ থেকে পেয়েছেন?'

কাকার এ প্রশ্নে ডঃ ভাটনগর যেন একটু চটে গেলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে। তিন-চার মিনিট চুপ করে থেকে আবার শুরু করলেন ডঃ ভাটনগর।

'আপনি তো জানেনই সারা পৃথিবীময় এখন জ্বালানীর দুর্ভিক্ষ চলছে। যা কিছু সামান্য পেট্রোলিয়াম আছে, তা' শেষ হতে আর ক'দিন। তাই আমি গবেষণা করছিলাম কীভাবে সূর্যের শক্তি আমাদের কাজে লাগানো যায়। কিন্তু সবকিছু যখন প্রায় করে এনেছিলাম, তখনই এই সর্বনাশ—'

ডঃ ভাটনগর হঠাৎ যেন ভেঙ্গে পড়লেন। দুঃখে হতাশায়।

সৃজনকাকা বলল, 'কিন্তু তাতে আপনার চিন্তা কি! আপনার কাছে তো সূর্য-ডিমের ফরমূলা আছে। সেই ফরমূলা থেকে আবার তৈরি করুন সূর্য-ডিম।'

'তা থাকলে তো হতোই। কিন্তু চোরেরা আমার ফরমূলাসুদ্ধ চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'অবাক কাণ্ড! তা'হলে তো মনে হচ্ছে, এ আপনার ল্যাবরোটরির ভেতরের কারো কাজ।'

'তা মনে হয় না। কারণ আমার ল্যাবোরেটরিতে আমি একলাই কাজ করি। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু সাহায্য করে ড্রাইভার ইমতি আও। আর ওর বউ লিলি আমাদের সকলের জন্য রান্নাবান্না করে। এরা ছাড়া বাইরের লোক আমার কাছে ক্বচিৎ কদাচিৎ আসে। কারণ আমি পাবলিসিটি একদম পছন্দ

করি না। ইচ্ছে ছিল, সূর্য-ডিমের ব্যাপারটা সফল হলে সায়েন্টিফিক আমেরিকানে প্রবন্ধ পাঠাব। ওদের সঙ্গে চিঠিপত্র লিখে সব পাকা করে ফেলেছিলাম।'

'তাহলে মনে হয় আপনার ওই চিঠির সূত্র ধরে কোনো যশোলোভী বৈজ্ঞানিক হয়তো—'

তা মনে হয় না। তবে কে জানে—, স্বগতোক্তির মতো বলেন ডঃ স্বরূপ ভাটনগর।

ডঃ ভাটনগরের ল্যাবোরেটরির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় দেখলাম একটা বেশ বড় প্রিজম। তার ভেতর থেকে নানা রংয়ের বর্ণালি ফুটে বেরোচ্ছে।

ডঃ ভাটনগর বললেন, 'এখানে প্রিজমের মাধ্যমে সূর্যরশ্মির সঙ্গে ডিমের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতাম।' সৃজনকাকা আর আমি মনোযোগ দিয়ে প্রিজমটা দেখলাম। ওর মাথার উপরে অর্ধ-গোলাকার কাচের ঢাকনা, যার ভিতর দিয়ে সূর্যরশ্মি ঢুকছে ল্যাবেরোটরির ভেতরে।

ডঃ ভাটনগর আমাদের বুঝিয়ে বললেন, কী করে ল্যাবরেটরির ভেতরে সূর্যের আলো রাসায়নিক ডিমের ভেতরে ঘনীভূত করা হয়। এই সূর্য-ডিম দিয়ে যেমন পেটরোলের কাজ চলে, তেমনি প্রয়োজন হলে এ থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা যাবে। তবে বিদ্যুৎ তৈরির প্রক্রিয়াটি পরীক্ষামূলক পর্যায়ে ছিল। আর কিছুদিন গবেষণা করলেই উনি পদ্ধতিটি নিখুঁত করে তুলতে পারতেন। কিন্তু তার আগেই এই চুরি।

ডঃ ভাটনগরের কথা-বার্তা শুনে ও ল্যাবেরোটরি ঘুরে দেখে ওঁর ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। ডিমাপুর শহরের এক প্রান্তে বসে মানুষের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কী গভীর নিষ্ঠায় গবেষণা করে যাচ্ছেন। কলকাতা, দিল্লী, মাদ্রাজের মানুষজন বোধহয় ডঃ ভাটনগরের এই গবেষণার খবরও রাখে না। সৃজনকাকার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, ল্যাবেরোটরির সবকিছু খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, কিন্তু কোন মন্তব্য করছে না।

ল্যাবোরেটরি দেখা হয়ে গেলে ডঃ ভাটনগর বললেন, 'আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, স্নান করে খেয়ে নিন। পরে বিকেলে আবার আলোচনায় বসা যাবে। চলুন, আপনাদের ঘর দেখিয়ে আনি।'

ল্যাবোরেটরির ওপরে ছাদ। সেই ছাদের একপাশে গোটা তিনেক ঘর।

ওর মধ্যে পূবের ঘরে থাকেন ডঃ ভাটনগর নিজে। বাকি দু'টো বোধ হয় গেস্ট রুম। নিচে থাকে সস্ত্রীক আও আর দারোয়ান। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও নিচে। পশ্চিমের ঘরের দরজাটা ভেজানো।

ডঃ ভাটনগর দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'এই-ঘরটা আপনাদের জন্য। যে ক'দিন ডিমাপুরে থাকবেন, এখানেই থাকুন। কোন কিছু প্রয়োজন হলে কলিংবেল টিপবেন। লিলি আপনাদের জন্য সবকিছু বন্দোবস্ত করে দেবে।'

ঘরে ঢুকে আমরা তো অবাক, ড্রাইভার ইমতি আও এরই মধ্যে আমাদের সব জিনিসপত্র সারকিট হাউস থেকে এনে রেখেছে। ঘরটাও বেশ ভালো, মোজেক করা। দু'টো খাট টেবিল চেয়ার, ওয়ার্ড-রোব সব কিছু পরিপাটি করে সাজানো। সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। সবই ভালো, কিন্তু ডঃ ভাটনগরের সারা বাড়িতে একটা অদ্ভুত গন্ধ। এরকম গন্ধ আগে কখনো পাই নি। স্নান-টান করে দুপুরে খাওয়া দাওয়া ভালোই হলো। ভাত, ডাল, নদীর টাটকা মাছ, দই। দুপুরে খাওয়ার পর আমার চোখ ভেঙ্গে আসছিল ঘুমে। সৃজন কাকা বলল, 'কি বাদল, বাইরে থেকে আমার সঙ্গে ঘুরে আসবি নাকি?'

আমি বললাম, 'না, কাকা, তুমি যাও। আমি বরং একটু ঘুমিয়ে নিই।'

কাকা বেরিয়ে গেলে দরজা ভেজিয়ে ঘুম লাগালাম আমি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি খেয়াল নেই। বিচ্ছিরি এক স্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে উঠে দেখি, আমাকে ধাক্কা দিয়ে ডাকছেন ডঃ ভাটনগর।

'কি ব্যাপার বাদল, তোমার কাকা কোথায়? কোথাও বেরিয়েছেন নাকি?'

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, কী একটা কাজে বেরিয়েছেন। এক্ষুনি ফিরবেন নিশ্চয়ই।'

কিন্তু কাকার ফিরতে অনেক রাত হলো। কাকা যখন ফিরলেন, দেখি, কাকার চেহারা ঝড়ো কাকের মতো। সারা শরীরে ধুলো মাখা।

কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'ডঃ ভাটনগর কোথায়?'

'বোধ হয় নিজের ঘরে।' কিন্তু তুমি গিয়েছিলে কোথায়?'

'বলছি। তার আগে দরজাটা ভেজিয়ে দে।'

ঘরের দরজা ভেজিয়ে বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এলেন কাকা।

পকেট থেকে এক গাদা কীসব কাগজপত্র বের করে সেগুলো খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলেন। ক্লান্ত হলেও কাকার চোখ মুখ খুব উজ্জ্বল। কাগজপত্র

দেখতে দেখতে একবার মুখ তুলে বললেন, 'বুঝলি, দুপুরে এখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে গিয়েছিলাম মিঃ বরাগোহাঁইয়ের কাছে। উনি এখানে পি টি আইয়ের করেসপনডেন্ট—'

'মানে খবরের কাগজের লোক—'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু সাদা ডিমের সঙ্গে ওদের কী যোগ?'

কাকা মুচকি হেসে বলল, 'একটু আছে। নাহলে আর গিয়েছি কেন?' তোর মনে আছে, দু'তিন মাস আগে কাগজে খবর বেরিয়েছিল, ডিমাপুর অঞ্চলে বেশ কয়েকবার ফ্লাইং সসার দেখা গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে। কিন্তু এসবের সঙ্গে ডঃ ভাটনগরে সম্পর্ক কী তা' তো ছাই বুঝতে পারছি না।' আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়ি।

'আসলে কী ব্যাপার জানিস। ওর ল্যাবোরেটরিতে ঢুকেই একটা র‍্যাকে সাজানো দেখলাম, ফ্লাইং সসারের ওপর বেশ কয়েকটা বই। ব্যাপারটা দেখে কেমন একটা খটকা লাগল। যে লোক সোলার এনারজি বা সূর্য-শক্তির ওপর গবেষণা করছে, তার ল্যাবেরোটরিতে ফ্লাইং সসারের ওপর এতগুলি বই কেন। অবশ্য এতে অবাক হওয়ার তেমন কোন কারণ নেই। তবু আমার কিন্তু কিন্তু লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল, ডিমাপুরের আকাশে বেশ কয়েকবার ফ্লাইং সসার দেখতে পাওয়ার কথা।'

'তাহলে কি তুমি বলছ, ফ্লাইং সসারের লোকগুলোই ডাঃ ভাটনগরের ডিম চুরি করে নিয়ে গেছে?'

'হতে পারে। তবে ইমতি আও লোকটা সুবিধের নয়। ওর নাম আছে পুলিশের খাতায়।'

'তাই নাকি।' আমি খানিকটা অবাক হই, কারণ লোকটাকে দেখে বেশ ভালো লোক বলেই মনে হয়।

কাকা, বলে চলে, 'মিঃ বরগোঁহাইয়ের কাছে শুনলাম, মাস দুয়েক আগে নাকি ডিমাপুরেই একটা ফ্লাইং সসার নেমেছিল।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'সত্যি!'

'সত্যি মিথ্যে জানি না। তবে ডিমাপুরের এক বুড়ো কাঠুরে নাকি দেখেছিল, ডঃ ভাটনগরের বাড়ির পাশের মাঠে একদিন সন্ধ্যেবেলা, একটা ফ্লাইং সসার

নেমেছিল। মিঃ বরগোঁহাইকে সঙ্গে নিয়ে আজ ঐ বুড়ো কাঠুরের সঙ্গের দেখা করেছি। বুড়ো কাঠুরে আমাকে বলল, ও নাকি পাশের জঙ্গলের ভেতরে থেকে দেখেছে, ফ্লাইং সসারটা দেখতে অনেকটা চ্যাপটা লাট্টুর মতো। সেই লাট্টুর ভেতর থেকে দু'টো লোক নেমে ডঃ ভাটনগরের বাড়ির দিকে হাঁটছিল। ওদের হাতে নাকি ছিল সাদা রংয়ের কয়েকটা জিনিস ছিল।'

'সাদা ডিম নাকি।'

'হয়তো তাই হবে। আসল ব্যাপারটা কি জানিস। মনে হয় রেডিয়ো সিগনালিং করে ঐ ফ্লাইং সসারটাকে আকাশ থেকে নামিয়েছেন ডঃ ভাটনাগর।'

লিংয়ের কাজটা ভালো জানেন ভাটনাগর।

'কিন্তু ভেতরের লোক দু'টো?'

'আরে ওরা কি আর মানুষ নাকি? ওরা তো রোবট। ঐ রোবটগুলির কাছ থেকে রেডিয়ো-সিগনালিং করে হাতিয়ে নিয়েছিল ঐ সূর্য-ডিমগুলো। ভেবেছিল, ঐ ডিমগুলো দিয়ে পৃথিবী জোড়া নাম কিনবে। কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারে নি। চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছে। পরশু রাতে ওর ল্যাবোরেটরি থেকে ডিমগুলো সরিয়েছে—'

কাকা কথা শেষ করবার আগেই দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে কে একজন ঢুকে পড়ল।

ভালো করে ঠাহর করে দেখি, ইমতি আও। ওর হাতে উদ্যত রিভলভার।

ওর মুখ গম্ভীর, ভয়ংকর। জড়ানো ইংরেজিতে বলল, ইমতি আও, 'মিঃ বোস আপনি একটু বেশিই জেনে গেছেন। সুতরাং—

এদিকে ঘরের মধ্যে সেই গন্ধটা তীব্রতর হয়ে উঠছিল। বিশেষত ইমতি আওয়ের শরীর থেকেই গন্ধটা যেন বেশি আসছিল।

একটু পরেই অবাক কাণ্ড। আমাদের দিকে রিভলভার তাক করে থাকতে থাকতে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল আও। সেই তীব্র গন্ধে আমারও মাথা ঝিমঝিম করছিল।

কাকা বললেন, 'চল, শিগগির। তাড়াতাড়ি এ বাড়ি থেকে পালাতে হবে। না হলে আমাদের অবস্থাও হবে ইমতি আওয়ের মতো। সেই ডিমগুলির কেমিক্যাল রিয়াকশন শুরু হয়ে গেছে।'

কোন রকমে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে ছুটলাম নিচের দিকে। যাবার আগে

দেখলাম, ডঃ ভাটনাগরের ঘরে তালা দেওয়া। তবে কি ভাটনগর ঘরে তালা দিয়ে বাইরে কোথাও গেছেন। নাকি ওকে তালা দিয়ে বন্দী করে রেখেছে ইমতি আও। কিন্তু তখন আর এতকিছু ভাববার সময় নেই। বাড়িময় তীব্র গন্ধে সমস্ত চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ছুটে বাড়ির বাইরে গিয়ে সবে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় সমস্ত বাড়ি জুড়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

শিউরে উঠল সৃজন কাকার দিকে তাকালাম। উঃ, আর একটু হলেই পুড়ে মরতাম আমরা।

একটু পরেই হেডলাইট জ্বালিয়ে পুলিশের জিপ এসে থামল। জিপ থেকে নামলেন পুলিশের এক অফিসার, জন্য কয়েক কনেস্টবল আর এক ভদ্রলোক।

সেই ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সৃজন কাকা বললেন, 'আসুন মিঃ বরগোঁহাই, ঠিক সময়ে এসেছেন।

বুঝলাম, ইনিই মিঃ বরগোঁহাই, পি টি আই করেসপনডেন্ট। পুলিশ অফিসার মিঃ আঙ্গামি বললেন, 'ইমতি আও কোথায়? ওর বিরুদ্ধে অনেক চার্জ।

পরের দিন বিকেলে ডিমাপুরের সারকিট হাউসে বসে সকলের সঙ্গে গল্প হচ্ছিল।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল সৃজন কাকা, 'ডঃ ভাটনাগর জানতেন না যে সাদা ডিমগুলি চুরি করেছে ওরই ড্রাইভার-কাম অ্যাসিসট্যান্ট ইমতি আও আর ওর বউ লিলি। বেচারারা জানত না, ওই বিশেষ ডিম রাখতে হয় বিশেষ এক মাধ্যমের ভেতরে। কিন্তু ওরা ডিমগুলো রেখেছিল বাড়ীর নিচে একটা বাক্সের ভেতরে। খোলা হাওয়ায় ঠিক আটচল্লিশ ঘন্টা পরে ডিমগুলো ফেটে গিয়ে সারা বাড়িতে আগুন লেগে গেছে। অতি লোভ করতে গিয়ে ইমতি আওকে পুড়ে মরতে হলো।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম 'কিন্তু ডঃ ভাটনগরের কী হলো? উনি কি বেঁচে গেছেন?'

হতাশ ভঙ্গিতে উত্তর দিলেন মিঃ বরগোঁহাই, 'উনি কি আর বেঁচে আছেন? উনিও নিশ্চয়ই পুড়ে মরেছেন ইমতি আওয়ের মতো। বড় ভাল লোক ছিলেন ডঃ ভাটনগর।'

কিন্তু এমন সময় আমাদের সবাইকে অবাক করে ঘরে ঢুকলেন ডঃ ভাটনগর।' ওর সারা শরীরে ব্যানডেজ। এখানে ওখানে ফোলা।

ডঃ ভাটনগর বললেন, মিঃ বোসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে একটু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। সবে খাটের উপর শরীরটা এলিয়ে দিয়েছি, এমন সময় দরজা খুলে হঠাৎ ভেতরে এলো ইমতি আও। হাতে উদ্যত রিভলভার। মাতালের মতো টলছে। ওর ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, আমার ল্যাবোরেটরি থেকে ডিম সরিয়েছে কারা। আমার এতদিনের বিশ্বাসী লোক লোভে পড়ে কেমন বদলে গেছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমাকে বাঁধতে শুরু করেছে আও। ওর হাতে রিভলভার, ওর সঙ্গে পারব কি করে! যাতে আমি চিৎকার করতে না পারি, তাই ঘরে তালা দিয়ে যাওয়ার আগে আমার মুখে গুঁজে দিয়ে গেল কাপড়। পরে বাড়িতে আগুন লেগে গেলে হঠাৎ শরীরে এসে গেল অসুরের শক্তি। দরজা ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে বাঁচলাম। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, নিজে বাঁচলেও আগুন থেকে আমার ল্যাবোরেটরি বাঁচাতে পারলাম না। ভিনগ্রহের ঐ ডিমগুলো যে এত ভয়ংকর....তা' আমিও বুঝতে পারি নি।'

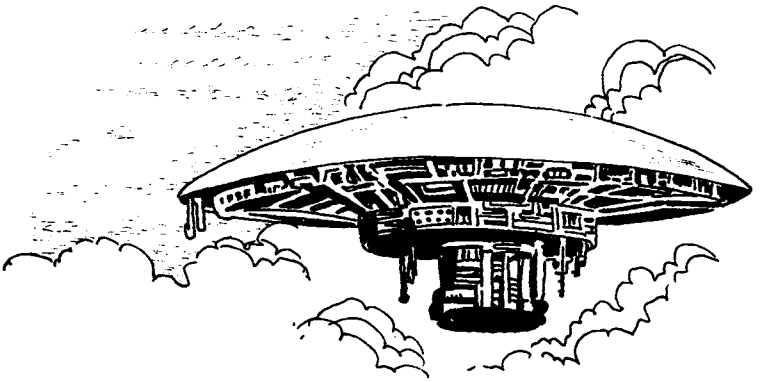

হঠাৎ আমরা বুঝতে শুনতে পেলাম, বাইরে তীক্ষ্ণ শিসের মতো আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম, নীল আকাশের বুক চিরে দ্রুত উড়ে যাচ্ছে একটা হলুদ রংয়ের লাট্টু।

উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে ফ্লাইং সসারের দিকে চেয়ে রইলেন ডঃ ভাটনগর। আমি মন্তব্য করলাম, 'বোধহয় হারানো ডিমগুলোর খোঁজে ফিরে এসেছে উড়ন্ত চাকি।'

চন্দ্রদার গোয়েন্দাগিরি

রূপক চট্টরাজ

নীল এসে চন্দ্রদাকে বলল, "জানো চন্দ্রদা, বারাসাতের কাছে এক ম্যাজিশিয়ান এসেছেন।"

"নাম কী?"

"নামটা! নামটা শুনেছিলাম..."

"ভুলে মেরেছিস তো?"

"না, ঠিক তা নয়, যা বিদ্‌ঘুটে নাম। একবার শুনেই মনে রাখা যায় না।"

"এত কম মেমারি হলে তো আমার শাগরেদের চলবে না।"

"তুমি সব কথার এত জেরা করো যে,আসল কথাটাই ভুলে যাই।"

চন্দ্রদা হাসতে-হাসতে বললেন, "ঠিক আছে। তারপর বলো—"

"তুমি যাবে ওখানে?"

"ওখানে গিয়ে ম্যাজিক দেখার মতো আমার সময় নেই।"

"তুমি তো শুধু সময়ই দেখছ, আর ওখানে যে লোকটা ঠকিয়ে রোজ কত পয়সা রোজগার করছে, সেটা একবার ভেবে দেখেছ!"

"এতে ভাবার কী আছে। ওটা ওর পেশা। তা ছাড়া ওকে তো সংসার চালাতে হবে।"

"সে তো হবেই। কিন্তু আমি শুনেছি ব্যাপারটা একটু গোলমেলে, কেমন যেন একটা রহস্য-রহস্য গন্ধ আছে, বুঝলে চন্দ্রা।"

"বলছিস?"

"আসলে লোক ঠকানোরও তো একটা সীমা আছে। এভাবে বোকা বানানো ঠিক নয়। মনে হয়, ও তুকতাক জানে। ম্যাজিক-ট্যাজিক কিচ্ছু না, সব বাজে।"

"তবে তো একবার যেতেই হয়।"

"হ্যাঁ চন্দ্রদা, তুমি ঘটনাটা শোনো। দেখবে দারুণ ইন্টারেস্টিং। তখন তোমারও জানতে ইচ্ছে করবে ব্যাপারটা কেমন করে হচ্ছে।"

'আচ্ছা, বল শুনি।"

"জানো, ম্যাজিশিয়ান ভদ্রলোক সারাদিনে খেলা দেখান না। দেখান সন্ধে হলেই। তাও সাতটা হবে। এক-একজনকে খেলা দেখানোর জন্য মিনিটদশেক সময় নেন। প্রত্যেককে দেখান একই খেলা। রোজ সাত আট-দশজন করে খেলা দ্যাখে।

তাই খুব ভিড়ও হচ্ছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো? যাদের খেলা দেখান, তারা সকলেই প্রায় স্কুল—কলেজের ছাত্রছাত্রী। আমার বন্ধু পুপুনও সেদিন গিয়েছিল। সে দেখেছে ধোঁয়ার মধ্যে একটা লালপরি ভেসে বেড়াচ্ছে। ঘটনাটা ওর চোখের সামনেই ঘটে। ও যখন ম্যাজিশিয়ানের কাছে গেল, তখন ওকে, আরও যারা খেলা দেখবে, তাদের সঙ্গে বাইরে অপেক্ষা করতে হয়। কিছুক্ষণ বাদে ওর ডাক পড়ল। ঘরে ঢুকতেই ম্যাজিশিয়ান ওকে একটা আসনের ওপর বসতে দিলেন আর ওর মাথায় একটা টুপির মতো কীযেন পরিয়ে দিলেন। সামনে একপাত্র জল।

প্রথমেই হাত ধুয়ে নিয়ে নমস্কার করতে বলেন। ঘরে তখন একটা প্রদীপ আর ধূপ জ্বলছে। ধূপটা ছিল ধুনুচিতে। কয়েকটা ধূপ গুঁড়ো করে দিতেই ভুস-ভুস করে ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে গেল। এত চোখ জ্বালা করতে লাগল যে, ঘরে তখন টেকা দায়। ম্যাজিশিয়ান পুপুনকে চোখ বন্ধ করতে বলে কমুণ্ডলু থেকে এক গণ্ডুষ জল ওর দু' হাত দিয়ে কী সব মন্ত্র উচ্চারণ করতে হঠাৎই প্রদীপটা নিভে গেল। সেই অন্ধকারেই দু'হাতের জলটা সারা মুখে মেখে ওকে সামনে তাকাতে আদেশ করলেন।

অন্ধকার কাটানোর জন্য তখন ম্যাজিশিয়ান একটা মোমবাতি জ্বেলেছেন। পুপুন দেখল, সারা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি, আর তার ঠিক সামনে ধোঁয়া ভেদ

করে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে একটা লালচে-মতো মুখ। সারা মাথায় সাদা শণের মতো চুল মৃদু দুলছে। আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। ম্যাজিশিয়ান চেঁচিয়ে উঠলেন, এই দ্যাখো লালপরি, কী দেখতে পাচ্ছ তো?"

পুপুন মন্ত্রমুগ্ধের মতো হ্যাঁ বলতেই, খুব জোরে হাততালি দিয়ে ওঠেন ম্যাজিশিয়ান। সঙ্গে-সঙ্গে বড় আলো জ্বলে ওঠে। পুপুনের মাথা থেকে টুপিটা খুলে রেখে পুপুনকে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে দেন ওই ম্যাজিশিয়ান।

আসলে আমরা তো জানতে পারতাম না এতসব কাণ্ড। সেদিন বিকেলে আমাদের ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সময়তো পুপুন না আসায় আমাদের সব প্রোগ্রাম ভেস্তে গেল। পরদিন যখন পুপুন এল, তখন আমরা ক'জন ওকে চেপে ধরলাম গতকাল পালিয়ে যাওয়ার জন্য। ও বলল, "সেদিন সকালে মাসির বাড়ি গিয়েছিলাম বারাসাতে। বিকেলের আগেই ফেরার কথা। কিন্তু মাসতুতো ভাইবোনেরা ম্যাজিক দেখতে যাওয়ার জন্য এমন ঝুলোঝুলি করল যে, আর না দেখে পারলাম না। ওখানেই থেকে গেলাম। তাই তোদের সঙ্গে খেলা দেখতে যেতে পারিনি।" এর পর পুপুন ওই ম্যাজিক দেখার ঘটনাটা বলল। "বুঝলে চন্দ্রদা, আমার কিন্তু এ ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।"

"হুঁ, ঘটনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং।"

"কী, তা হলে এখন বলছ তো!"

"চল, একদিন দেখেই আসি কেমন ম্যাজিক।"

"কিন্তু তোমাকে যদি ঢুকতে না দেয়?"

"আঃ, তোকে তো দেবে। তুই দেখবি, আর আমি যা-যা বলব, তাই ঠিকমতো করবি। এ-ম্যাজিকের রহস্য ভেদ করা এমন কিছু কঠিন নয় রে নিলু।"

"পারবে, তুমি পারবে চন্দ্রদা?"

"নিশ্চয় পারব। কত বড়-বড় রহস্য উদ্‌ঘাটন করলাম, আর এটা তো নস্যি!"

"কী যে বলো চন্দ্রদা। এতজন খেলাটা দেখে কিছুই ধরতে পারল না, আর তুমি কিনা আমার মুখে শুনেই বলছ, এটা কিছু নয়, নস্যি।"

"তা ছাড়া আর কী! শোন তবে, ওই যে ঘর অন্ধকার হয়ে যায়, তারপর ম্যাজিশিয়ান হাতে জল দেন, এর মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে আসল রহস্য।

বুঝলি?"

"কী বলছ তুমি! অন্ধকার তো বেশিক্ষণ । এরই মধ্যে এত কাণ্ড!"

হ্যাঁ, বলছিটা কী? তবে শোন.."

রহস্যের সূত্রটা চন্দ্রদা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন নীলকে। নীল তো শুনেই হাঁ। বলল, "তুমি একটা জিনিয়াস, চন্দ্রদা।

আমার মাথায় কিন্তু এসব এক্কেবারেই আসেনি।"

"আসবে, আসবে। একটু ধৈর্য ধরে ব্যাপারগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে।"

"ঠিক আছে। তুমি কিন্তু কাউকে বলবে না এই লালপরি রহস্যের কথা। আমি বন্ধুদের স্টান্ট দেব, কেমন?"

"বেশ, তাই হবে। তবে যেগুলো বলে দিলাম সেগুলো মাথা ঠাণ্ডা করে খেয়াল রাখিস, দেখবি তুই কত সহজেই খেলাটা ধরে ফেলিস।"

পরদিন নীল বন্ধুদের সামনে পুপুনকে ডেকে বলে, "তোকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে সেদিন। আমাদের বন্ধু হয়ে কী করে যে এত বোকার মতো খেলাটার তারিফ করেছিস, সেটা ভেবেই পাচ্ছিনা।"

"বেশি বকিস না তো। চল না, তুইও বোকা বনে যাবি।"

পুপুনের কথা শুনে বন্ধুরাও নীলকে বলল, "সেই ভাল, সকলে মিলেই একদিন যাওয়া যাক। কেমন ম্যাজিক, দেখা যাবে। তা হলে তো তোর মনে আর কোনও সন্দেহ থাকবে না।"

এ-কথায় পুপুনও সায় দিল, "ঠিক বলেছিস রে, নীল ক'দিন চন্দ্রদার সঙ্গে ঘুরে ভাবছে, ও বড় গোয়েন্দা হয়ে গিয়েছে। ওকে যাই বলি না কেন—ও কেমন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে। যেদিন ওরকম কারও পাল্লায় পড়বে, তখন বুঝবে কত ধানে কত চাল।"

"আহা, তুই এত চটছিস কেন?" নীল বলল।

"চটব না? যেদিন তুই শুনেছিস ম্যাজিক দেখার কথা, তখন থেকে শুধু আমার পেছনে লেগে আছিস। আচ্ছা ছেলে তো তুই।"

"ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। এবার থেকে তোকে আর কিছু বলবনা, হল তো! একটু রাগ কমা। আর সকলে মিলে ঠিক কর, একদিন গিয়ে ম্যাজিক দেখে আসি।

তবে, আমি প্রথমেই দেখব, আর কেমন করে ওটা ফাঁস করতে হয়, আমার খুব ভাল জানা আছে।"

'নে, আর কপচাসনি। কাজে দেখা, তখন বুঝব তুই কতবড় ওস্তাদ।"

"তোর চ্যালেঞ্জ আমি অ্যাকসেপ্ট করছি পুপুন। আর যদি ম্যাজিকের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারি, তবে তুই কথা দে, সকলকে রুটি-মাংস খাওয়াবি।"

পুপুন বন্ধুদের চাপে এই শর্তেই রাজি হয়ে গেল। যাওয়ার দিনও ঠিক করে ফেলল ওরা।

সেদিন ছিল এক ছুটির দিন। বোধ হয় রবিবার। সময়তো সকলে গিয়ে হাজির হল ম্যাজিশিয়ানে ডেরায়। নীলই প্রথমে ঢুকল ম্যাজিক দেখতে। বন্ধুরা সকলেই বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

এদিকে ভেতরে ম্যাজিশিয়ান নীলকে খেলা দেখাতে শুরু করেছেন। একটু পরেই নীল দেখাতে শুরু করেছেন। একটু পরেই নীল তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সামনের দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে যেতে গেল।

ম্যাজিশিয়ানও কিছু একটা আঁচ করে দ্রুত ওর পথ আগলে দাঁড়ালেন। নীলের কাণ্ড দেখে ভদ্রলোক হতবাক।

নীল বলল, "রাস্তা ছাড়ুন। আপনার বুজরুকি সব ধরে ফেলেছি।"

"এত তাড়াতাড়ি এ-ম্যাজিক ধরার ক্ষমতা তোমার কেন ভাই, অনেকেরই নেই। এর জন্য চাই খুব পাকা মাথা, বুঝলে?"

"আপনার, ধারণা ভুল প্রমাণ করার জন্য যে আমি এখানে এসেছি, সেটা এক্ষুনি বুঝতে পারবেন। আমার বন্ধুরা বাইরে অপেক্ষা করছে। আমাকে ছেড়ে দিন। ওদের ভেতরে ডাকি।"

"আহা-হা এর মধ্যে আবার বন্ধুবান্ধব কেন? এ-ঘরে তো তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। শুধু-শুধু আবার ওদের....."

"তা তো হয় না। আমরা প্ল্যান করেই এখানে এসেছি।" আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটা বাজি ধরা হয়েছে। ওদের বলেছি, এ-ম্যাজিক আমি ফাঁস করে দেবই দেব।

সুতরাং দেরি নয়, পথ ছাড়ুন। ওদের ডেকে এনে দেখাই, আপনার কেরামতির বহর।"

নীলের কথায় ম্যাজিশিয়ান একটু হকচকিয়ে গেলেন। ভয়ও পেলেন। বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না, এত অল্প সময়ে নীল কী করে রহস্যটা ধরে ফেলল।

কিছুতেই বাইরে বেরোবার পথ করতে না পেরে নীল তাচ্ছিল্যের

ভঙ্গিতে বলে, "এই পাকা মাথার কেরামতিটা তবে শুনুন। আপনি ঘর যখন অন্ধকার করেন এবং তারপর হাতে জল দেন, মধ্যেই তো থেকে যায় আসল রহস্য।"

"বা রে , ঘর অন্ধকার রাখব কেন? সঙ্গে-সঙ্গেই তো একটা মোমবাতি জ্বেলে দিলাম।"

"কিন্তু হাতে জল দেওয়ার ব্যাপারটা? ওটা তো জল নয়, আসলে ভ্যানিশিং লাল রং, যা আপনি ঘর অন্ধকার হওয়ার মুখেই হাতে ঢেলে দেন আর অন্ধকার হতেই মুখে মেখে নিতে বলেন। তাই মুখে-হাতে লাল রং মেখে সবাই লালপরি দ্যাখে।"

"আরে, এটা পরি হবে কেন? ওটা তো আমাদেরই মুখ। সামনের দেওয়ালে ওই যে বড় আয়না সেট করা আছে, সারা ঘর ধোঁয়ায় ভর্তি থাকায় ওটা কারও নজরেই পড়ে না।

যখন আপনি বলেন সামনে তাকাতে, তখন চোখে পড়ে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। আর মাথায় যে এই টুপিটা পরিয়ে দেন, এটা তো মেমেদের পরচুলা। তাই আয়নায় হঠাৎ নিজেকে চেনা যায় না। ঘরে মোমবাতির মৃদু আলোয় গাঢ় ধোঁয়া ভেদ করে সামনের আয়নায় আবছা ছবি ফুটে ওঠে। ঠিক তখনই আপনি 'লালপরি, লালপরি' শব্দে চেঁচিয়ে ওঠায় মনে গেঁথে যায় ওটা লালপরি। আসলে ওটা কিস্‌সু নয়। আমরা সকলে নিজের মুখের ছবিই দেখি।

তবে, একটা ব্যাপারে আমি খুব সতর্ক থেকেছি আগাগোড়া, যাতে হাতের ওই লাল ভ্যানিশিং রং মুখে না লেগে যায়। হাতটা মুখে বোলানোর ভান করে রং ফেলে দিয়েছি আর তাতেই মুখের স্বাভাবিক রঙের প্রতিচ্ছবি দেখলাম লালপরির পরিবর্তে।"

এইভাবে চন্দ্রদার সূত্র মেনেই নীল লালপরি-রহস্য উদ্‌ঘাটন করল।

অপ্রত্যাশিতভাবে ম্যাজিক ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ম্যাজিশিয়ান আর কোনও উপায় না দেখে নীলের দু' হাত চেপে ধরে আকুলভাবে বলেন, "প্লিজ, এ-ব্যাপারটা কাউকে বলবে না। তোমার টিকিটের টাকাটাও ফেরত দিচ্ছি। বুঝতেই তো পারছ, এটা একটা ম্যাজিক।"

নীল ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়।

ম্যাজিশিয়ান অবস্থা বেগতিক দেখে ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলেন, "আমার দিকটা একবার ভেবে দ্যাখো। আমাকেও তো সংসার চালাতে

হয়। ম্যাজিক দেখিয়ে দুটো পয়সা রোজগার করি। আর এতেই কোনওরকমে দিন কাটে। তার ওপর দু-দুটো বাচ্চা ঘরে।

ওরা না খেতে পেয়ে মারা পড়বে। তোমারও ভাইবোন আছে। ওদের কথা অন্তত ভেবে আমাকে ছেড়ে দাও। দয়া করে আর কাউকে এ-ব্যাপারটা বোলো না।

তোমার বন্ধুদেরও না। আমি তোমার বন্ধুদের বিনা পয়সার খেলা দেখাচ্ছি। আর এও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, বেশিদিন এখানে খেলা দেখাব না। দু-এক দিনের মধ্যেই চলে যাব।"

ম্যাজিশিয়ানের অসহায় অবস্থার কথা শুনে নীল কেমন জানি একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। তা হলে এখন বন্ধুদের সামনে গিয়ে কী বলবে! একদিকে একটা সংসার, আর অন্যদিকে মান-সম্মান, বাজি জেতার হাতছানি। দু-এক মিনিট চিন্তা করে ও ম্যাজিশিয়ানকে বলে, "দরজাটা খুলুন।

আমি বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলি। ওরা আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করছে।"

ম্যাজিশিয়ান বাধ্য হয়েই দরজা খুলে দিলেন।

নীলকে দেখে বন্ধুদের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। পুপুন তো অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে। নীল বলল, "সত্যি পুপুন, তোর কথাই ঠিক। আমি হেরে গেছি। এককথায় এটা দুর্ধর্ষ ম্যাজিক।

আজকে উনি তোদের বিনে পয়সায় খেলা দেখাবেন, আমাকে কথা দিয়েছেন। আরও বলেছেন যে, ম্যাজিকটা আমাকেও শিখিয়ে দেবেন"

ডাকিনীর রাত

ডাঃ নীহার রঞ্জন গুপ্ত

টেলিফোন ষ্ট্যাণ্ডে একটি টেলিফোন। ক্রিং ক্রিং করে বেজে চলেছে।

বেলেঘাটা অঞ্চলের একটা পুরাতন বাড়ীর কক্ষে ১৮/১৯ বছরের একটি তরুণী ও মধ্যবয়সী এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল। মেয়েটি গিয়ে টেলিফোন তুলে নিলঃ হ্যালো, কে সুমিতা?

হাঁ!—

কি ঠিক করলে?—সুমিতা নিরুত্তর।

ফোনে আবার কণ্ঠস্বর ভেসে এলোঃ এখনো ভেবে দেখো আমার প্রস্তাব। সুখ শান্তিতে নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রা চাও, না রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে চাও?

আমি রাজী—

দ্যাটস্ লাইক এ গুড গার্লস—তাহলে প্রস্তুত থেকো। কাল সকালে শশধর আর তুমি যাত্রা করবে। তোমাদের পরিচয়—সিলোন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডাঃ শশধর ব্যানার্জী—তার একমাত্র ভাইঝি তুমি।

ট্রেন চলেছে। শশধর আর সুমিতা কাকা ভাইঝির পরিচয়ে অবসরপ্রাপ্ত জীবন যাপন করতে চলেছে সাঁওতাল পরগণার এক শহরে।

নগেন্দ্রনারায়ণ পিতার একমাত্র পুত্র, স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত যুবক, অনেকগুলো কলিয়ারীর মালিক ভোর বেলা ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে আসতে দূর থেকে

ভ্রমণরত কাকা ভাইঝিকে দেখে ঘোড়া থামিয়ে আলাপ করল। ডাঃ ব্যানার্জী পরিচয় দিয়ে তাকে চায়ের নিমন্ত্রণ জানালেন।

সেই রাত্রে একটা অমানুষিক চীৎকারে সুমিতার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিসের চীৎকার? নেকড়ে বাঘের বলেই মনে হল।

কলকাতার কিরীটি ও তার বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা চলছিল সাঁওতাল পরগণার এক শহরে, নেকড়ে বাঘের আবির্ভাব সম্পর্কে। নেকড়ে বাঘটাকে দেখা যায়নি, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনজন কুলী জাতীয় লোক নিহত হয়েছে, তাদের গলায় পাঁচটি গোলাকার ক্ষত চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। শহরে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কুলীদের ধারণা ওটা কোন পিশাচের কারসাজী। দারোগাবাবু কিরীটিকে রহস্য ভেদের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিরীটি যেতে রাজী হয়। সে কুলীর ছদ্মবেশে গিয়ে কুলিদের দলে নাম লেখায়।

রণেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ট হয় শশধর ও সুমিতার। রণেন্দ্রনারায়ণ আমন্ত্রণ জানায় তার গৃহে একরাত্রে নৈশ ভোজের। মস্ত গেটওয়ালা বাগান বাড়ী। আহারাদির পর রণেন্দ্র ওদের পৈতৃক ঐশ্বর্য দেখায় এবং নিজে খুব ভাল সেতারী বলেই সেতার বাজিয়ে শোনাতে থাকে সুমিতার গানের পর। সেই রাত্রে সুমিতা স্বপ্ন দেখে রণেন্দ্রনারায়ণকে, পরক্ষণেই তার মনে পড়ে— সেকি, কি তার সত্যকারের পরিচয়!—সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে যায়। একটা মানুষের আর্ত চীৎকার!

দারোগা লণ্ঠন নিয়ে বের হয়ে পড়ে রাত্রির জনশূন্য প্রান্তরে। অলক্ষ্যে আরো একজন ছায়ামূর্তি তাকে অনুসরণ করে। দারোগা চন্দলাল চমকে ওঠেঃ কে?

পরেরদিন ভোরবেলা রণেন্দ্রনারায়ণ সুমিতাদের বাড়িতে এসে বলে, গতরাত্রে আবার একজন নিহত হয়েছে। ঐ ঘটনা নিয়ে শশধর সুমিতা ও রণেন্দ্রনারায়ণের মধ্যে যখন আলোচনা চলেছে তখন বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। রণেন্দ্রনারায়ণের গাড়ি এসেছে। নিয়ে এসেছে নতুন ড্রাইভার চন্দ্রমোহন আর তার সঙ্গে কিশোর বাদল।

চন্দ্রমোহনকে সুমিতার কেন জানি ভাল লাগে না। বাদলকে ভাল লাগে, বাদলের পরিচয় দেন রণেন্দ্রনারায়ণ।

রণেন্দ্রনারায়ণ চলে যেতেই শশধর ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করেঃ কতদূর এগুলো? সুমিতা চুপ করে থাকে।

রণেন্দ্র ঘরে ফিরে এলে তার সেক্রেটারী নুটবিহারী বলেঃ খাদে গোলমাল বেঁধেছে—এই নেকড়ে ভীতির একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। রণেন্দ্র বলেঃ কি করতে পারি বলুন? ডিষ্ট্রিক্ট সুপারকে সংবাদ দিয়েছি তিনি আসছেন। সামনের মাঘী পূর্ণিমার মেলায় কি করলেন? নুটবিহারী জবাব দেন. সব ব্যবস্থাই তিনি করেছেন। সেক্রেটারী নুটবিহারী অত্যন্ত কর্মঠ লোক। পাঁচ বৎসর হলো কাজে নিযুক্ত হলেও....তার কর্মদক্ষতায় রণেন্দ্রনারায়ণ অত্যন্ত প্রীত।

চন্দ্রমোহনের বিশেষ ভক্ত বাদল ছায়ার মত তার সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। বাদলের মা গরীব বিধবা তার স্বামী কলিয়ারীর দুর্ঘটনায় মারা যান। এখন রণেন্দ্রনারায়ণের অর্থ সাহায্যেই তার দিল চলে। বাদল লেখাপড়া করে না বলে বাদলের মার আক্ষেপ। সেদিনও তিনি এসেছিলেন বাদলের খোঁজে চন্দ্রমোহনের কাছে। অনুযোগ জানান চন্দ্রমোহনেরই কাছে যে সে লেখাপড়া একেবারেই করে না।

রণেন্দ্রনারায়ণ বলেছিলেন সুমিতাকে মাঘী পূর্ণিমার মেলায় যাবার জন্য। সুমিতা রাজী হয় না। শশধর বলেন!

যাও মা যাও। ঘুরে এসো—

রণেন্দ্র চলে যাবার পর সুমিতা বেঁকে বসে, সে যাবে না। শশধর বললেন, যেতে হবেই। এবং যত তাড়াতাড়ি রণেন্দ্রনারায়ণ তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে ততই মঙ্গল, কারণ উপর থেকে তাগিদ আসছে। ছয়মাস হয়ে গেল।

যেতে হয় সুমিতাকে রণেন্দ্রর সঙ্গে মেলায়। রাস্তায় গাড়িতে কত আলাপ হয়। কিন্তু সুমিতা যেন কেমন প্রাণহীন নিরাসক্ত। রণেন্দ্রই নিজে ড্রাইভ করে।

সেই রাত্রেই শশধর রণেন্দ্রের গৃহে হানা দেয়—রণেন্দ্রর ঘর হতে সিন্দুক থেকে তার মায়ের বহুমূল্য জড়োয়ার গহনাগুলো চুরি করতে। কিন্তু চন্দ্রমোহনের কাছে ধরা পড়ে যায়। চন্দ্রমোহন তাকে বলে, এই ছোট কাজের জন্য সে এখানে আসেনি। শশধর ক্ষেপে যায়, বলে—জবাবদিহি যদি করতেই হয় সে তার কাছে করবে না, করবে দলপতির কাছে।

ইডেন গার্ডেনে রাত্রির অন্ধকারে দলপতির সঙ্গে শশধরের দেখা হয়। চন্দ্রমোহনের কথা সে জানায়। দলপতি বলে চন্দ্রমোহনকে গার্ড করবার জন্যই পাঠিয়েছি কি? এবং শশধরকে ভৎর্সনা করে গহনা চুরির জন্য। আসল কাজের কতদূর হলো তারও জন্য তাগিদ দেয়।

এদিকে শশধরকে পৌঁছে দিয়ে সুমিতা ফিরে আসে এবং আচমকা বাদল ও চন্দ্রমোহনের কথাবার্তা তার কানে যায়। বাদলের যেন কেমন ছমছমে ভাব! সেই রাত্রে রণেন্দ্রর গৃহে প্রহরারত পুলিশ প্রহরীরা নিহত হয়। থানার দারোগা আসে তদন্তে—সেই পাঁচটি রক্তাক্ত বিক্ষিপ্ত চিহ্ন;—মৃতের এবং আশেপাশে কেডস জুতোর ছাপ ভিজে মাটিতে।

শশধর ফিরে এসে সুমিতাকে বলে দলপতির তাগিদের কথা। সুমিতা কেঁদে ফেলে, এত বড় প্রতারণা সে করতে পারবে না। শশধর বলে, তাহলে দলপতি ত তাকে ক্ষমা করবে না, সুমিতা বলে, সে যে কোন দণ্ড মাথা পেতে নেবে, কিন্তু এ কাজ পারবে না। চিন্তিত হয় শশধর। বেচারী সুমিতার প্রতি কেমন একটা অনুকম্পাও বোধ করে। সেই রাত্রেই চন্দ্রমোহন শশধরকে তাগিদ দেয় তার মেয়েকে চন্দ্রমোহনের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য। কি ভেবে শশধর বলে, বেশ সে রাজী আছে, সে যেন তার সঙ্গে মাঠের শেষে পাহাড়ের গুহায় দেখা করে।

চন্দ্রমোহনের সঙ্গে বাদলের কথা হচ্ছিল তার ঘরের মধ্যে। কথা বলছিল বাদল, আমার কি হলো চন্দরদা! রাত হতেই কেমন যেন একটা ভয়ংকর ইচ্ছা আমার মনে জাগে—যেন, যেন হত্যা করতে ইচ্ছা করে গলা টিপে।

তুমি ক্লান্ত বাদল, শুয়ে পড়, বিশ্রাম নাও।

ঘুমাতে আমি পারি না। চোখ বুঁজলেই সেই দুঃস্বপ্ন, সেই ভয়ংকর রাক্ষসটা সামনে এসে দাঁড়ায় আমার।

বাড়ী যাও। একটা ঘুমের ঔষধ দিচ্ছি, খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো।

সুমিতা আর রণেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কথা হয়।

আমাকে কি তোমার ভয় হয় সুমিতা?

সুমিতা নিশ্চুপ। কি জবাব দেবে সে? কেমন করে সে বলবেঃ যে তোমার যোগ্য আমি নই। বল, বল সুমিতা, আমার আশা কি নিতান্তই দুরাশা? তোমার কাকাকে সব বলি?

না, না, এত তাড়াতাড়ি নয়। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে মিতা। বেশ।

মধ্য রাত্রি। একাকী গুহার মধ্যে চন্দ্রমোহন শশধরের অপেক্ষায়। দুরভিসন্ধি নিয়েই চন্দ্রমোহন এসেছে গুহার মধ্যে, শশধরের সঙ্গে দেখা করতে, শশধর তার প্রস্তাবে রাজী থাকে ভালই। নচেৎ সে আজ রাত্রেই শশধরকে হত্যা করবে, তাই সে ঘুমন্ত বাদলকে হিপনোটাইজের দ্বারা আহ্বান করে।

ঘরে হিপনোটাইজড বাদল শয্যায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। চন্দ্রমোহনের আহ্বানে ঘুমের মধ্যেই সে উঠে দাঁড়ায়। বেচারী মা পাশে শুয়ে কিছুই জানতে পারে না। বাদল তন্দ্রার ঘোরে উঠে বাড়ির বাইরে আসে,বাড়ীর বাইরে একটা ঝোপ মত, সেখানে প্রবেশ করে।

চন্দ্রমোহন অধীর অপেক্ষায় শশধরের। শশধর এসে প্রবেশ করে গুহার মধ্যে, বলে এসো শশধর। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এলেনা।

বাদল তন্দ্রার ঘোরে একা একা হেঁটে চলেছে। একাকী কিরীটি ঐ সময় অন্ধকারে মাঠের মধ্যে ঘুরছিল, দূর হতে বাদলকে একা একা মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখে বিস্মিত হয়,তাকে অনুসরণ করে। কোথায় যায় বাদল এত রাত্রে?

শশধর কথা বলতে বলতে আচমকা চন্দ্রমোহনকে পশ্চাৎ দিক হতে চুরি মারে,একটা আর্ত কাতর শব্দ করে চন্দ্রমোহন ঢলে পড়ে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তন্দ্রার ঘোরে বাদল গুহার মধ্যে ঢোকে। অন্ধকারে বাদলকে চিনতে না পেরে শশধর চট করে গুহা ছেড়ে পালায়। মৃত্যু যন্ত্রনায় ক্ষীণ কণ্ঠে কাতরাতে থাকে চন্দ্রমোহনঃ বাদল বাদল—

আশ্চর্য্য, বাদল গিয়ে লাফিয়ে চন্দ্রমোহনেরই গলা টিপে ধরে।

কিরীটি চন্দনলালকে থানায় ডেকে তুলে তাকে নিয়ে গুহায় ছুটে আসে। এসে দেখে হাতে লোহার নেলস বসান বাদল রক্তাক্ত চন্দ্রমোহনের বুকের উপরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। চন্দ্রমোহনের হত্যাপরাধে বাদল ধৃত হোল।

পরের দিন প্রত্যুষে শশধরের গৃহে চায়ের টেবিলে রণেন্দ্রনারায়ণ এসে সংবাদ দিল, চন্দ্রমোহনের হত্যাপরাধে বাদল ধৃত হয়েছে।

থানায় এসে বাদলের মা কান্নাকাটি করে। বলে তার ছেলে নির্দোষ। চন্দ্রমোহনকে সে কখনই হত্যা করে নি। চন্দনলাল তাকে হটিয়ে দেয়।

বিকেল বাদলের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে শশধর শুনতে পায়, পাগলের মত ডাক ছেড়ে বাদলের মা ছেলের জন্য কাঁদছেঃ বাদল রে! শশধর বিচলিত হয়ে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি যেতে শুরু করে।

থানায় বসে কিরীটি দারোগা চন্দনলালকে বুঝাচ্ছিল নেলসগুলো দিয়ে, কি ভাবে এখানে নেকড়ে বিভীষিকা হত্যা করে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু আসল ব্রেন সামহোয়ার বিহাইণ্ড, বাদল ও চন্দ্রমোহন—প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু কে?

কে সব কিছুর পশ্চাতে, এ রহস্যের মেঘনাদ কে? চন্দনলাল কিন্তু জানতে চান না। তিনি বলেন, হত্যাকারী বাদল। কিরীটি বলে, বাদল নির্দ্দোষ।

সুমিতা রণেন্দ্রকে বলেঃ না। না এ হতেই পারে না। বাদল নির্দ্দোষ।

আমারও তাই মনে হয়, মিস মল্লিক। কলকাতা হতে আমি ব্যারিষ্টার আনবো।

শশধর চুপ করে থাকে।

সেই রাত্রে আবার ছায়া মূর্তির আবির্ভাব ঘটে।

শশধর বলে, সে ধরা দেবে।

ছায়ামূর্তি বলেঃ তুমি কি পাগল হলে?

পাগল হইনি এখনো তবে পাগল হতে হবে, যদি না প্রায়শ্চিত্ত করি।

বুঝতে পারছো না শশধর, তোমার সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই টানবো না। সব দোষ আমার ঘাড়ে নেবো।

ছায়ামূর্তি যখন বের হয়ে যায় শশধরের বাড়ী থেকে, ছায়ার মত দূর হতে অলক্ষ্যে কিরীটি তাকে অনুসরণ করে।

থানায় এলেন শশধর পর দিন। দারোগাকে বল্লেন, তিনি জানেন চন্দ্রমোহনের সত্যিকারের হত্যাকারী কে, তিনি জবানবন্দী দেবেন।

জবানবন্দী দিতে যাবেন, এমন সময় ওয়ার্ডার এল, জানাল বাদল মাথা ঠুকতে ঠুকতে রক্তাক্ত হয়ে মারা গেছে।

শশধর একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। দারোগা প্রশ্ন করে, জবানবন্দী দেবেন না?

শশধর বল্লেনঃ না—

শশধর একাকী ঘরের মধ্যে পায়চারী করছেনঃ ছায়ামূর্তি এসে ঘরে প্রবেশ করে।

শশধর! ছায়ামূর্তি নাম ধরে ডাকে।

কে! ও তুমি—

এ সব কি শুনছি। সুমিতা—

কী?

তাকে আমি হত্যা করবো, কোথায় সে?

না। হত্যা করতে তুমি পাবেনা। আমি বেঁচে থাকতে নয়।

শশধর!

বৃথা শাসিয়ে আর লাভ নেই। এতদিন তোমার কথা আমি শুনে আসছি, আজ আমার কথা তোমায় শুনতে হবে হরবিলাস —

তুমি রাস্কেল!

হঠাৎ দরজার গোড়ায় কিরীটির কণ্ঠস্বর শোনা গেলঃ হরবিলাস, শশধর, তোমাদের খেলা শেষ হয়েছে, হ্যাণ্ডস আপ!

আরে কে ও! কিরীটিবাবু, আসুন, বলতে বলতে চকিতে হরবিলাস ঘুরে দাঁড়ায় এবং নিমেষে এক লাফ দিয়ে কিরীটিকে একেবারে ধরাশায়ী করে অন্তর্হিত হয়। সিঁড়িতে পুলিশ ছিল ধাক্কা খেয়ে সেও পড়ে যায়। হরবিলাস পালায়।

কিরীটিও তাকে অনুসরণ করে। শশধরকে থানায় নিয়ে যায়।

বাইরে ছিল একটা তেজী ঘোড়া। চোখের পলকে ঘোড়ায় চড়ে হরবিলাস ঘোড়া ছুটালো! চন্দনলালের মোটরজীপে কিরীটিও তাকে অনুসরণ করে।

আগে চলেছে হরবিলাস ঘোড়া ছুটিয়ে, পশ্চাতে জীপে কিরীটি ও চন্দনলাল।

হঠাৎ একটা নদী পার হতে গিয়ে ঘোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে, হরবিলাস ছিটকে পড়ে। আহত হয়, গ্রেপ্তার হয়।

থানায় হরবিলাসের মুখোস খুলতে দেখা গেল, সে নটুবিহারী। সব খুলে বলে। রণেন্দ্র শুনে থমকে যায়, শশধরের পরিচয় সুমিতার পরিচয়ে সে বজ্রাহত!

ছুটে আসে রণেন্দ্র সুমিতাদের ওখানে, ছিঃ, সুমিতা, তোমরা, তুমি এই, এই তোমাদের পরিচয়! সুমিতা নির্ব্বাক।

কিরীটি আসে। সুমিতাকে বলে, এখন কি করবেন? চলুন আমার সঙ্গে।

সুমিতা শুধায়, কাকামণির কি ফাঁসি হবে?

জানি না। বিচারকরাই বলতে পারবেন।

চুনিলালবাবুর লাল চুনি

অনীশ দেব

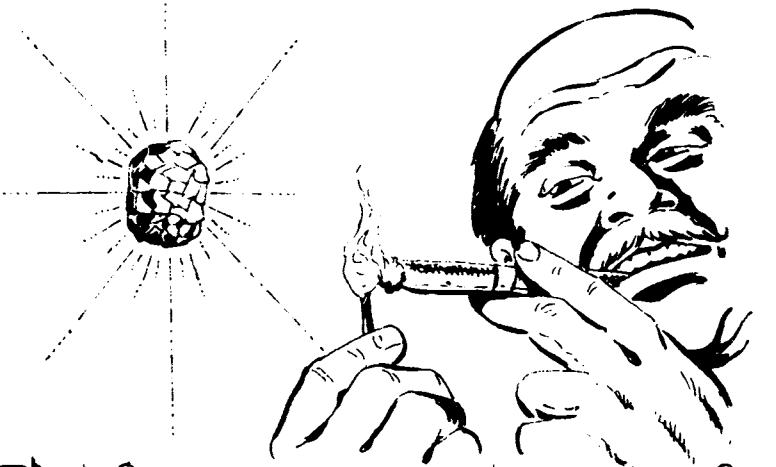

ব্যাপারটা ঠিক খুন নয়, গুপ্তাসাব, তবে অনেকটা খুনের মতো।" গাড়ির জানালার বাইরে চোখ রেখে বিকেলের কলকাতা দেখতে-দেখতে কথাটা বলল ইনস্পেক্টর রঘুপতি যাদব।

ক্যাডবেরি রঙের মারুতি আটশো শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড় ছুঁয়ে এগোচ্ছিল বাগবাজারের দিকে। গাড়ির পেছনের সিটে উদ্বিগ্ন মুখে বসে ছিল রঘুপতি। ওর পাশেই বসে অধ্যাপক ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত, সংক্ষেপে 'এসিজি'। তাঁর সরু—সরু আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত বিদেশি সিগারেট।

এমনিতে এসিজির প্রিয় দেশি সিগারেট। কিন্তু রঘুপতি কোথা থেকে যেন এক 'কার্টন' বিদেশি সিগারেট জোগাড় করে এসিজিকে উপহার দিয়েছে একটু আগেই। আর সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছে একটা সমস্যা, যেটা ঠিক খুন নয়, খুনের মতো।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রাক্তন ছাত্র রঘুপতিকে দেখছিলেন এসিজি।

ছোট করে ছাঁটা চুল, কাঁচাপাকা চওড়া গোঁফ, ফরসা মুখে সামান্য বসন্তের দাগ। হাতের শিরা এবং পেশি দুষমনদের সাবধান করে দেওয়ার মতো। আর চোয়ালের উদ্ধত রেখা সেখানে জুড়ে দিয়েছে একটা বেপরোয়া ভাব। এ ছাড়াও একটা 'কিলার ইন্সটিংকট' যেন আবছাভাবে খুঁজে পাচ্ছিলেন এসিজি।

ছাত্রজীবনের রঘুপতির সঙ্গে আজকের কাজপাগল ইনস্পেক্টর রঘুপতি

যাদবের কতটা অমিল, সেটাই ভাবছিলেন ওর প্রাক্তন 'সার' অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

"এ ছাড়া, সার, ব্যাপারটার মধ্যে পাখিও আছে—" এসিজির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলল রঘুপতি, "আপকা ফেভারিট—পঞ্ছি। অওর উসকে সাথ এক রুবি কি কহানি।"

মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মেরে চোখে জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে তুললেন অশোকচন্দ্র, "রুবির কাহিনী? তার মানে?"

"রুবি—যাকে বাংলায় আপনারা চুনি বলেন। জেমস্টোন। খুব কস্টলি।"

ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন এসিজি। বললেন, "তোমার টেনশান কমাও, রঘুপতি। তখন থেকে যেরকম খাপছাড়াভাবে ইনফর্মেশনের টুকরো ছড়িয়ে চলেছ, তাতে আমার মতো থিঙ্কিং মেশিনেরও মস্তক ঘুর্ণিত। তোমাকে তো বহুবার বলেছি, গায়ের জোরের লড়াইয়ে স্পিডটা একটা ফ্যাক্টর, কিন্তু বুদ্ধির লড়াইয়ে নয়। নাউ, কাম অন, বেশ রয়েসয়ে গুছিয়ে গল্পটা বলো আমাকে।"

একটু আহত হয়ে রঘুপতি বলল, "বলছি, গুপ্তাসাব, কিন্তু 'ঘুর্ণিত, মানে কী?"

হো-হো করে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ হুনুর। ছোট-হয়ে-আসা সিগারেটের টুকরোটা গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়ে বললেন, "সে তোমাকে পরে বলে দেব। এখন শুরু করো তোমার 'রুবি কি কহানি—"

ওঁদের গাড়ি তখন বাগবাজারের বাটার দোকানের কাছে বাঁ দিকে বাঁক নিচ্ছে।

রঘুপতি যাদব একটু গম্ভীর মুখে বলতে শুরু করল। ওর ভুরু কুঁচকে গেল, চোখ সামান্য সামান্য ছোট হয়ে এল।

ওর পাশে বসা খদ্দরের ঢোলা পাঞ্জাবি ও পাজামা পরা বৃদ্ধা মানুষটি তখন আনমনাভাবে মাথার সাদা চুলের গোছায় টান মারছেন, আর বাগবাজার বাটার মোড়ে পুজোর কেনাকাটার ভিড় দেখছেন। কিন্তু তাঁর কান ও মস্তিষ্কের মনোযোগ পুরোপুরি রঘুপতির দিকে। রঘুপতির কাছ থেকে সংক্ষেপে যা জানা গেল, তা হল এই:

বাড়িটার নাম 'লালমহল'। বাগবাজারের গঙ্গার ঘাটের কাছাকাছি দু'মহলা পুরনো বাড়ি। বাড়ির দালানে বিশাল-বিশাল ডোরাকাটা থাম। থামের মাথায় কার্নিসের খাঁজে গোলাপায়রার বাস। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে এখনও ছোট মাপের দুর্গাপুজো হয়।

বাড়িটার রং লাল। অন্তত একালে তাই ছিল। কালের প্রকোপে সেই লাল কোথাও গোলাপি, কোথাও বা বর্ণহীন হয়ে পড়েছে। বাড়ির সদর দরজায় রংচটা শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা 'রায়বাহাদুর রবীন্দ্রলাল গোস্বামী'।

রবীন্দ্রলাল অন্তত চল্লিশ—বিয়াল্লিশ বছর আগে ইহলোক ছেড়েছেন। তবে তাঁর চার ছেলে এখনও বহাল তবিয়তে লালমহলে বাস করেন।

বড় ছেলে শ্যামসুন্দরলাল গতকাল মারা গেছেন। তিনি সবসময় পাখি নিয়ে মেতে থাকেন—মানে, থাকতেন। বাড়ির অনেকটা অংশ তাঁর খাঁচায়—খাঁচায় ছয়লাপ।

মেজো ছেলে চুনিলাল মণিরত্নের ব্যবসা করেন। দেবদেবীভক্ত ধর্মভীরু মানুষ। অন্য ভাইদের মতো সংসারধর্ম করেননি।

সেজো রঙ্গলাল হিসেবমতো বেকার। তবে শোনা গেছে নাকি টুকটাক সাপ্লাইয়ের কাজ করেন।

আর সকলের ছোট গজেন্দ্রলাল এখনও ঠিক কোনও ব্যবসায় থিতু হয়ে বসতে পারেননি।

ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল, দুপুর দুটো নাগাদ।

শ্যামসুন্দরলালের কাছে একটা ফোন এসেছিল। কে ফোন করেছিল সেটা জানা যায়নি। তবে টেলিফোনে উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে-বলতেই তিনি আচমকা হার্টফেল করে মারা যান।

তাঁর চিৎকার বাড়ির অনেকে ছুটে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

ব্যাপারটায় এমনই কোনও জটিলতা ছিল না। অত্যন্ত স্বাভাবিক মৃত্যু। তা ছাড়া শ্যামসুন্দরলালের বয়সও হয়েছিল প্রায় বাষট্টি।

কিন্তু গোলমাল বাধালেন চুনিলালবাবু। তিনি বললেন যে প্রায় দু'লাখ টাকা দামের একটা টকটকে লাল চুনি তিনি তাঁর বড়দার কাছে রাখতে দিয়েছিলেন।

সেটার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

সেইজন্যই গুপ্তাসাবকে জরুরি তলব করেছে রঘুপতি। খুঁজে বের করতে হবে চুনিলালবাবুর চুনি।

রঘুপতি কথা শেষ হতে-না-হতেই এসিজি প্রশ্ন করলেন, "শ্যামসুন্দরলালের মারা যাওয়ার ব্যাপারটাকে তুমি 'খুনের মতো' বলছ কেন?"

"বলছি কী আর সাধে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রঘুপতি। তারপর বলল,

"ওই হতচ্ছাড়া জেবরাতের জন্যে ক'দিন ধরেই কোনও এক আদমি শ্যামসুন্দরবাবুকে থ্রেট করছিল। তাতে উনি ভয়ও পেয়েছিলেন, আবার খুব এক্সাইটেডও হয়ে পড়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল, উনি এভাবে মারা না গেলে হয়তো ওই আন্‌নোন পার্সনের হাতে খুন হয়ে যেতেন—"

এসিজি এক ফাঁকে সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিলেন আবার। চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "সেই লোকটা কেমন করে জানল যে, চুনিটা শ্যামসুন্দরলালবাবুর কাছে আছে?"

ঠোঁট উলটে রঘুপতি বলল, "কে জানে! হয়তো কারও কাছ থেকে ইনফর্মেশন পেয়েছে।"

"যখন শ্যামসুন্দর মারা যান তখন চুনিলাল কোথায় ছিলেন?'

"বাড়িতেই।" কথাটা বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রঘুপতি কী যেন দেখল। তারপর বলল, "সার, আমরা লালমহলে এসে গেছি—"

বাড়ির সামনে ভাঙাচোরা ট্রামরাস্তা। কোথাও-কোথাও জল জমে আছে। বাড়ির উলটোদিকে দুটো বিশাল মাপের গোডাউন। তার পেছনেই বোধ হয় গঙ্গা।

ড্রাইভারকে গাড়ি পার্ক করতে বলে রঘুপতি এসিজিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, "আইয়ে, সার—ওয়েলকাম টু লালমহল।"

এসিজি প্রাক্তন ছাত্রের ভঙ্গি দেখে সামান্য হাসলেন। তারপর মাথার সাদা চুলে হাত চালিয়ে বললেন, "চলো, দেখা যাক তোমার চুনিলালবাবুর চুনি উদ্ধার করা যায় কি না।"

ডোর-বেল টিপতেই বাড়ির দরজায় একজন বয়স্ক পুরুষ এসে হাজির হলেন। দেখে বনেদি বাড়ির 'পুরাতন ভৃত্য' বলেই মনে হল। রঘুপতি নিজের পরিচয় দিতেই দ্রুত আদর-আপ্যায়ন শুরু হয়ে গেল।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে রঘুপতি যাদব নিচু গলায় বলল, "ব্যাপারটা লালবাজার পর্যন্ত গড়াত না। তবে চুনিলালবাবুর থোড়া বহত আবার লেভেল কানেকশন্স আছে। সেই জন্যই—"

কথা বলতে-বলতে ওঁরা চৌকো মাপের বিশাল ঠাকুরদালানে এসে পড়েছিলেন। তার একপাশে চণ্ডীমণ্ডপ। সেখানে প্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। এখন শুধু শেষ তুলির টান আর সাজসজ্জা বাকি।

হঠাৎই ওঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন শ্যামলা রঙের একজন ভদ্রলোক।

তাঁর ডান হাতের তিন আঙুলে রুপো দিয়ে বাঁধানো তিনটে পাথরের আংটি। প্রকট হেসে তিনি বললেন, "আগমনের খবর পেয়েছি, তাই রিসিভ করতে এসেছি।

অধমের নাম রঙ্গলাল, চুনিটা বেপাত্তা হয়েছে গতকাল।"

এসিজি অবাক হয়ে লালমহলের রঙ্গলালবাবুকে দেখছিলেন।

পরনে ফতুয়া গোছের পাঞ্জাবি আর ধুতি। মাথার মাঝখানে সিঁথি। তেল-চকচকে কোঁকড়ানো চুল। ছোট-ছোট চোখ। কপালের বাঁদিকে একটা ছোট্ট আঁচিল। নাকটা সামান্য বড় মাপের। দাড়ি-গোঁফ কামানো মুখে প্রসাধনের সুবাস। আর সদাসঙ্গী আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

"শ্যামসুন্দরলালবাবু কোন ঘরে মারা গিয়েছিলেন?" রঘুপতি জানতে চাইল।

রঙ্গলাল অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করে বললেন, "দোতলার পাখিঘরে, ওই ঘরটার ঠিক ওপরে—" আঙুল তুলে দূরের কোণে একটা ঘর দেখালেন তিনি।

এসিজি যে-কথাটা মনে-মনে ভাবছিলেন, সেটাই মুখে প্রকাশ করলেন, "আপনি কি সবসময় ছড়া কেটে কথা বলেন?"

রঙ্গলালবাবু মাথা সামান্য নিচু করে বললেন, "আমি একজন স্বভাব-কবি, কবিতায় কথা বলা আবার হবি।"

রঘুপতি যে এই উত্তর শুনে ঠোঁট টিপে হাসল সেটা বৃদ্ধ গোয়েন্দার চোখ এড়াল না।

পুজো এবার দেরিতে। তাই রোদ্দুর পড়ে আসছে তাড়াতাড়ি। উঠোন থেকেও রোদ সরে যাচ্ছে পুবের দিকে।

মাথার ওপরে কয়েকটা পায়রা ঝটপট করছিল। শানবাঁধানো উঠোনে নানা জায়গায় ওদের অপকীর্তির ছাপ।

ওঁরা তিনজনে উঠোন পেরিয়ে এগোলেন দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে। তখনই কোথা থেকে ছুটে এল বছর ন'-দশের একটা ছোট্ট মেয়ে। হাঁফাতে—হাঁফাতে রঙ্গলালবাবুকে লক্ষ করে বলল, "জেঠু, মেজোজেঠু বলেছে ওঁদের পাখিঘরে নিয়ে বসাতে—"

কথাটা বলেই মেয়েটা ছুটে চলে গেল।

রঙ্গলালবাবু বললেন, "গজেন্দ্রর ছোট মেয়ে, সবসময়—"

"—চলে ধেয়ে।" পাদপূরণ করে হেসে উঠলেন এসিজি।

পুরনো আমলের শানবাঁধানো চওড়া সিঁড়ি। পালিশ- করা মেহগনি কাঠের রেলিঙ। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এর দেওয়ালে এক অভিজাত পুরুষের তৈলচিত্র। গিল্ট ফ্রেমে বাঁধানো। কে জানে, ইনিই হয়তো স্বর্গত রবীন্দ্রলাল গোস্বামী।

এসিজি আর রঘুপতি রঙ্গলালকে অনুসরণ করে উঠছিলেন। রঘুপতি চাপা গলায় ওর প্রাক্তন সারকে বলল, "অজিব ব্যাপার, গুপ্তাসাব। যাঁর নাম চুনিলাল তিনি চুনি, মানে হিরে-জহরতের বেওসা করেন। যাঁর নাম রঙ্গলাল তিনি সবসময় মজাক করে কথা বলেন। তবে যিনি মারা গেছেন—"

রঘুপতির কথায় বাধা দিয়ে অশোকচন্দ্র গুপ্ত বললেন, "শ্যামসুন্দরলাল গোস্বামীর নামটা প্রথম থেকেই আমার পিকিউলিয়ার লাগছিল। এরকম নাম কখনও শুনিনি। তবে 'শ্যামসুন্দর' নামে এরকম মুনিয়া পাখি পশ্চিমবাংলার স্থায়ী বাসিন্দা। বেহালার অক্সফোর্ড মিশনের বাগানে এরা বাসা বাঁধে। মাপে চড়ুইপাখির মতো। মাথা-কালো, বুক-সাদা, বাকিটা গাঢ় বাদামি রঙের। ইংরেজি নাম, 'ব্ল্যাক হেডেড মুনিয়া', আর লাতিন নাম, 'লোনচুয়া মলাক্কা'। সুতরাং শ্যামসুন্দরলালবাবুর শখটাও তাঁর নামের সঙ্গে মিল রেখে।"

"তা হলে বাকি রইলেন গজেন্দ্রলালবাবু। তিনি কি হাতির ব্যবসা করেন, না কি হাতির খোঁজখবর রাখা তাঁর শখ?"

সামান্য মজা করে বলা রঘুপতি যাদবের শেষ কথা বোধ হয় রঙ্গলালবাবুর কানে গিয়ে থাকবে। কারণ হঠাৎই তিন-চার ধাপ ওপর থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "হস্তী নয়, হস্তীদন্ত, গজেন্দ্রর পয়মন্ত।"

এসিজি আর রঘুপতি চোখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। গজেন্দ্রলাল তা হলে হাতির দাঁতের ব্যবসা করে!

গতকালই একজন মানুষের মৃত্যু ঘটে গেছে এ বাড়িতে। অথচ রঙ্গলালকে দেখে মোটেও মনে হচ্ছে না, তেমন কোনও আঘাত পেয়েছেন।

তবে বাড়িটাকে কেমন যেন বেশিরকম চুপচাপ মনে হল। শুধু পায়রার বক-বকম ওঁদের কানে আসছিল।

এসিজির সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল খানিক আগেই। দোতলার পাখিঘরে পৌঁছেই তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরালেন। ঘরটাকে একপলক দেখার পর তিনি যে বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, সেটা রঘুপতি যাদব বুঝতে পারল।

কারণ পাখিঘরে সাজানো রয়েছে অসংখ্য পাখির স্টাফ করা মডেল। নানা মাপের রংবেরঙের পাখি। কিন্তু ওরা সকলেই স্থির, চুপচাপ।

পাখিরঘরটাকে ঘর না বলে হলঘর বলাই ভাল। ঘরের মাপ অন্তত বিশ ফুট বাই তিরিশ ফুট। ঘরের মেঝেতে সাদা-কালো মার্বেল পাথরের নকশা। সেই নকশায় সময়ের কোনও ছাপ পড়েনি। এখনও দিব্যি ঝকমকে তকতকে।

চুনিলালবাবু একটা আরাম কেদারায় চিন্তিত মুখে বসে ছিলেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। চোখ লাল।

ওঁদের ঢুকতে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সংক্ষেপে পরিচয়ের পালা শেষ করে নিয়ে বললেন, "কিছু মনে করবেন না, ইনস্পেক্টর যাদব। সরাসরি কাজের কথায় আসি। অশৌচ অবস্থায় কী বিশ্রী ঝঞ্ঝাটে পড়লাম বলুন তো!"

একটু থেমে কয়েকটা চেয়ার দেখিয়ে তিনি অশোকচন্দ্র গুপ্ত আর রঘুপতি যাদবকে বসতে বললেন, "বসুন, আপনারা বসুন। আপনারা আসছেন শুনে ছোটভাইকে বাইরের কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে আমি আপনাদের জন্যে ওয়েট করছি।"

এমন সময় ছোট্ট মেয়েটা এক দৌড় ঘরে এসে ঢুকল। রঙ্গলালবাবুর কাছে গিয়ে বলল, "বসন্তদা, চা নিয়ে আসছে। মা পাঠিয়ে দিয়েছে—"

কথাটা শেষ করেই মেয়েটা বেণী দুলিয়ে আবার দে ছুট।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই চা, মিষ্টি ইত্যাদি ট্রেতে সাজিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মাঝবয়েসি একজন লোক। শ্বেতপাথরের তৈরি একটা গোল টেবিলে কাপ-প্লেটগুলো নামিয়ে রাখতেই রঙ্গলালবাবু সেগুলো সবিনয়ে এগিয়ে দিলেন রঘুপতি ও অশোকচন্দ্রের দিকে।

চুনিলালবাবুর পরনে হাফহাতা সাদা শার্ট আর পাজামা। গলায় সরু সোনার চেন। মাথার চুল পাতলা হয়ে এসেছে। জুলপির কাছটায় চুলে দিব্যি পাক ধরেছে। ভুরু লোমশ। দুই ভুরুর মাঝখানে চিরস্থায়ী বিরক্তির ভাব।

এসিজি ঘরটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলেন।

ঘরের আসবাবপত্র যা কিছু সবই ব্রিটিশ আমলের। একপাশে বড় মাপের চেয়ার—টেবিল। চেয়ারে ফুলকাটা তাকিয়া বসানো। টেবিলে গাদাগুচ্ছের বই আর কাগজপত্র। সেইসঙ্গে আছে পেন—পেন্সিল, আতশকাচ, পেতলের পেপারওয়েট আর কয়েকটা পাখির পালক। টেবিলের বাঁ দিকে রাখা কর্ডলেস টেলিফোন।

দেখে বোঝাই যায়, এটা ছিল শ্যামসুন্দরলালের পড়াশোনার ঘর।

ঘরটার তিন দিকের দেওয়ালে বড়—বড় মাপের দেওয়াল আলমারি।

তাতে ঠাসা রাজ্যের বই। এসিজির নজরে পড়ল, সেখানে সলিম আলি ও ডিলন রিপলির কয়েক খণ্ডে লেখা ভারত ও পাকিস্তানের যাবতীয় পাখির হাতবই পরপর সাজানো রয়েছে।

ঘরের সিলিং—এ ঝুলছে দুটো চার ব্লেডের পাখা। দেখে বোঝা যায়, ব্লেডগুলো কাঠের তৈরি। আর ঘরের দু'দিকের দেওয়ালে ডিজাইন করা শৌখিন পেতলের ব্র্যাকেটে ঝুলছে আধুনিক বৈদ্যুতিক বাতি। অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় চুনিলালবাবুর সুইচ টিপে বাতিগুলো জ্বেলে দিলেন। তারপর রঘুপতির কাছে এসে বললেন, "আমার দাদা দেবতুল্য মানুষ ছিলেন। ওঁর হার্টের প্রবলেম ছিল ঠিকই, কিন্তু হয়তো আরও কয়েক বছর বাঁচতেন। আমার জন্যেই অকালে বড়দার প্রাণটা গেল। বউদির দিকে আমি আর তাকাতে পারছি না। অথচ আমারও উপায় নেই। চুনিটা খুঁজে না-পাওয়া গেলে আমাকেও হয়তো গুপ্তঘাতকের হাতে মরতে হবে। তাই শোক তাকে তুলে রেখে পাগলের মতো চুনি খুঁজতে বসেছি...."

চুনিলালবাবু থামতেই রঘুপতি তাকাল অশোকচন্দ্রের দিকে।

বৃদ্ধ তখন চোখ বুজে সিগারেটে জম্পেশ টান দিচ্ছেন।

রঘুপতি বলল, "গুপ্তাসাব, আমার সঙ্গে চুনিবাবুরই টেলিফোনে কথা হয়েছিল। আপনি ওঁকে কী জিজ্ঞেস করবেন করুন—"

এসিজি চোখ খুলে পাখির মেলার দিকে তাকালেন। কম করেও একশো পাখি সাজানো আছে ঘরের ডান দিকটায়। তার সবই পশ্চিমবাংলার পাখি। ছোট মাছরাঙা, বাঁশপাতি, টুনটুনি, চন্দনা, দোয়েল, কাদাখোঁচা, শ্যামা, ময়না, নীলকণ্ঠ, চাকদোয়েল, বেনেবউ, এমনকী একটা মোহনচূড়াও আছে। পাখিগুলোর পায়ের কাছে সাদা কার্ডে ওদের পরিচয় লেখা—ঠিক যেমনটি জাদুঘরে থাকে।

এসিজি মাথার সাদা চুলে টান মেরে জানতে চাইলেন, 'ট্যাক্সিডার্মি করা এই পাখিগুলো কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে?"

চুনিলালবাবু বললেন, "দাদার খেয়াল। বেশিরভাগই কেনা। তবে কয়েকটা বোধ হয় নিজে অর্ডার দিয়ে করিয়েছে।"

"চুনির ব্যাপারটা আমাদের একটু খোলসা করে বলুন—"

চুনিলালবাবু ওঁদের কাছাকাছি একটা চেয়ার নিয়ে বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ উসখুস করে তারপর বললেন, "আমি মণিরত্নের ব্যবসা করি।

মানে, দামি পাথর কেনাবেচা করি। নিজে পাথর কাটিংও করি, পালিশও

করি। তবে সেরকম এক্সপার্ট নই। ছাদের দক্ষিণ দিকের একটা ছোট ঘরে আমার কাটিং মেশিন আর গ্রাইণ্ডিং মেশিন আছে।

"সে যাই হোক, পাথরের কাজকারবারে আমাকে প্রায় রোজই বটতলা আর মেছুয়ায় যেতে হয়। সেখানে মহাজনদের কাছ থেকে দরকারমতো জিনিস নিয়ে আসি। তো দিনসাতেক আগে মেছুয়াতে এক মহাজনের ঘরে আমি একটা বার্মিজ রুবি পেয়ে যাই। চুনিটার রং ঠিক পায়রার রক্তের মতো গাঢ় লাল। আর একেবারে বেদাগ।

"আমি সেখানে গিয়েছিলাম খড় কিনতে—"

"খড় মানে?" চুনিলালকে বাধা দিয়ে জানতে চেয়েছেন এসিজি।

"খড় মানে একেবারে র' পাথর। যেটা দেখে দামি পাথর বলে একেবারেই বোঝা যায় না।

সেগুলো অ্যাসিডে ট্রিট করে ঠিকমতো কেটে পালিশ—টালিস করতে পারলে অনেক দামি পাথর পাওয়া যেতে পারে। এর আগে বেশ কয়েকবার খড় কিনে আমি ভাল প্রফিট করেছি।"

"তাপর কী হল?" অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল রঘুপতি।

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার একজন কোটিপতি কাস্টমার বার্মিজ চুনির কথা বলে রেখেছিল। এই চুনিটার হদিস পেতেই আমার মনটা নেচে উঠল। একটা তাকে বেচতে পারলে অন্তত থার্টি পার্সেন্ট প্রফিট করা যাবে।"

"সেই কাস্টমারের নাম কী?" রঘুপতি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল।

চুনিলালবাবু অবাক চোখে তাকালেন রঘুপতির দিকে, "মাপ করবেন, ইনস্পেক্টর যাদব। কাস্টমারের নাম বলতে পারব না—ট্রেড সিক্রেট।"

মাথার সাদা চুলের গোছায় হাত চালিয়ে এসিজি জিজ্ঞেস করলেন, "পাথরটার সাইজ কীরকম ছিল?"

চুনিলাল গোস্বামী ব্যবসায়ীর ঢঙে বললেন, "প্রায় সাড়ে ন' রতি। মানে, পৌনে ন' ক্যারাট-এর কাছাকাছি।"

"ক্যারাটের হিসেব কেমন জট পাকিয়ে যায়," হেসে বললেন এসিজি, "এক ক্যারাট মানে কত গ্রাম?"

"দুশো মিলিগ্রাম। এই পাথরটার ওজন প্রায় পৌনে দু' গ্রাম মতো ছিল। আর বেশ লম্বাটে।"

"ফির কেয়া হুয়া?" রঘুপতির ধৈর্যে যে ভালরকম টান পড়েছে সেটা

ওর প্রশ্নের ঢঙেই বোঝা গেল।

চুনিলাল কী যেন চিন্তা করছিলেন। রঘুপতির প্রশ্নে চমকে উঠে বললেন, "পাথরটা আমি ওই চেনা মহাজনের কাছ থেকে দু' সপ্তাহের ধারে নিয়ে আসি। কিন্তু ওটা নিয়ে আসার পরদিন থেকেই কেউ আমাকে টেলিফোন করে হুমকি দিতে থাকে। বলে যে, পাথরটা যেন আমি কাউকে বিক্রি না করে সোজা আবার মহাজনের কাছে ফেরত দিয়ে আসি।

"মিস্টার গুপ্ত, আমাদের হিরে-জহরতের লাইনে উড়ো টেলিফোনে হুমকি দেওয়ার ব্যাপার নেহাতই মামুলি। তাই আমি প্রথম-প্রথম ব্যাপারটাকে পাত্তা দিইনি। কিন্তু দিনতিনেক যেতে-না-যেতেই হুমকির ব্যাপরটা সিরিয়াস চেহারা নিতে থাকে। মার্কেট থেকে কানাঘুষোয় খবর পেলাম, এতবড় বার্মিজ চুনি বাজারে বহুদিন আসেনি। তাই হিসেবছাড়া দাম দিয়ে কেনার মতো দু'-তিনজন কাস্টমার নাকি ওটার জন্য হন্যে হয়ে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের এজেন্টরা নাকি মারাত্মকরকম বিপজ্জনক।

"তখন আমি...." একটু থেমে চুনিলালবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "তখন আমি ব্যাপারটা বড়দাকে খুলে বলি। বড়দা ছিলেন দেবতুল্য মানুষ। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে একরকম পুত্রস্নেহে ছোট-ছোট ভাইদের মানুষ করেছেন। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি সজাগ হয়ে দেখাশোনা করেছেন। আমাদের সমরকম বিপদ-আপদ থেকে আগলে-আগলে রেখেছেন—" চুনিলালবাবুর চোখে জল এসে গেল। মুখটা সামান্য ঘুরিয়ে নিয়ে শার্টের হাতা দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, "বড়দা চলে গিয়ে আমাদের মাথার ওপর থেকে বটগাছের ছায়া সরে গেল। আমার বিপদের কথা শুনে বড়দা আমাকে বললেন, 'তোরকোনও চিন্তা নেই। তুই চুনিটা আমার কাছে দে, আমি ওটা রেখে দেব। তারপর দেখি, কে ওটা আমার কাছ থেকে নিতে পারে।'

"আমি সেইমতো বড়দাকে পাথরটা দিয়ে দিই পরশুর আগের দিন, মানে শুক্রবার। কিন্তু আশ্চর্য, তার পরদিন থেকেই সেই নাম-না-জানা লোকটা বড়াকে যা-তা বলে শাসাতে থাকে।

"দাদার একটাই দোষ ছিল—অল্পেতেই ভীষণ রেগে যেতেন। এই করে-করেই হার্টের ট্রাব্‌ল বাধিয়েছিলেন। আগে দু'বার স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। তাই দাদা যখন লোকটার সঙ্গে টেলিফোনে চিৎকার করে কথা বলতেন, তখন আমার ভয় করত। পরশু রাতেই আমি ঠিক করি, ঢের হয়েছে, চুনি বেচে

প্রফিটে আর কাজ নেই। ওটা আমি মহাজনকে ফেরতই দিয়ে দেব। কিন্তু দাদাকে সে-কথা বলতেই তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। ফলে আমি গৃহশান্তির কথা ভেবে চুপ করে যাই।

"তারপর....তারপর, কাল দুপুরে, ওই লোকটা আবার টেলিফোন করে। দাদা তখন এই ঘরে ওই চেয়ারটায় বসে ছিলেন। দাদার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আমি পাখিঘরে ছুটে আসি। দাদা তখন টেলিফোনে বলছেন, 'আমি থাকতে কেউ চুনির গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটতে পারবে না। আমাকে ভয় দেখানো অত সহজ নয়...'

"আমি দাদাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলাম। কারণ দাদার তখন চোখ-মুখ লাল, বড়-বড় শ্বাস নিচ্ছেন। ভয় হচ্ছিল, খারাপ কিছু না একটা হয়ে যায়....."

চুনিলালবাবু একটু থামতেই এতক্ষণ নীরব সাক্ষী হয়ে বসে-থাকা রঙ্গলাল বললেন, "সেই মুহূর্তে আমিও ছুটে আসি, গজেনকেও পেলাম পাশাপাশি—"

চুনিলালবাবু বিরক্ত হয়ে তাকালেন ছোট ভাইয়ের দিকে, "আঃ, রঙ্গ, কী হচ্ছে। পদ্য নিয়ে পাগলামির একটা লিমিট থাকা দরকার। এখন কি একটু স্বাভাবিকভাবে কথা বলা যায় না!"

রঙ্গলালের মুখে আহত ভাব ফুটে উঠল। তিনি মিনমিন করে স্বগতোক্তির মতো বললেন, "লিমিট থাকলে সেটা কখনও কবিতা হয় নাকি! কবিতার নামে সেটা তখন হয়ে যায় ফাঁকি...."

"দোহাই, তোর স্বভাব-কবিতা এবার বন্ধ কর!" চুনিলালবাবু যে বেশ রেগে গেছেন সেটা তাঁর মুখ দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল।

একটু সময় নিয়ে তারপর তিনি খবর পড়ার মতো নিরুত্তাপ গলায় বললেন, "তারপর...আমাদের তিন ভাইয়ের চোখের সামনেই বুক খামচে ধরে বড়দা টেবিলে কাত হয়ে পড়েন। চেয়ারে বসা অবস্থাতেই তিনি টেবিলে পড়েছিলেন বলে সেরকম আঘাতে পাননি। কিন্তু বুকের কষ্টটা নিশ্চয়ই খুব মারাত্মক হচ্ছিল, কারণ, তিনি বুকের কাছে হাত ঘষছিলেন বারবার। আর যন্ত্রণার টুকরো-টুকরো শব্দ বেরিয়ে আসছিল তাঁর মুখ দিয়ে।

"আমি গজেনকে পাঠালাম পাড়ারই এক ডাক্তারকে তক্ষুনি ধরে নিয়ে আসতে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, বড়দার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর

মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। শরীর প্রায় স্থির । মুখ থেকে একটানা গোঙানির মতো শব্দ বেরিয়ে আসছিল।

"বড়দা আমাকে বলেছিলেন, চুনিটা তিনি লুকিয়ে রেখেছেন। এমন জায়গায় লুকিয়েছেন যে, কেউ ওটা খুঁজে পাবে না। সে-কথা আমার মনে ছিল। তাই ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে নিষ্ঠুরের মতো চেঁচিয়ে জানতে চেয়েছি, 'বড়দা, চুনিটা কোথায় রেখেছ?'

"উত্তর বড়দা গোঙানির মতো শব্দ করে দু'বার বললেন, 'পেলি না গো. পেলি না গো—' তারপরই সব শেষ।

"কাল দুপুর থেকে আমরা দাদার সৎকার নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর কাল সারারাত ধরে আমি চুনিটার খোঁজ করেছি। বউদি ওই শোকের মধ্যেই আমাকে হয়তো সবাই অমানুষ ভাবছে, মিস্টার গুপ্ত, কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার বুঝুন! একে ওই হুমকি। তার ওপর চুনিটার দাম পৌনে দু'লাখ টাকা। মহাজনকে যে এককথায় দাম দিয়ে দেব তারও উপায় নেই। তাই মরিয়া হয়ে লোকজন ধরে লালবাজারে খবর দিয়েছি।"

কথা শেষ করে চুনিলালবাবু মাথা নিচু করলেন । হাতের পিঠ দিয়ে চোখ মুছলেন কয়েকবার।

রঘুপতি জিজ্ঞেস করল, "আপনার সব জায়গা খুঁজে দেখেছেন? সিন্দুক-টিন্দুক, ব্যাঙ্কের লকার—সব?"

চুনিবাবু ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ। তারপর বললেন, "আজ সকালেই, বউদিকে ব্যাঙ্কে নিয়ে গিয়েছিলাম। লকারে ওটা নেই।"

অশোকচন্দ্র গুপ্ত ইতিমধ্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে-করতে চলে গিয়েছিলেন পাখির ঝাঁকের কাছে। রাং-বেরঙের পাখিগুলো দেখতে-দেখতে কল্পনায় যেন ওদের ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। ঘাড়ের কাছে হাত নিয়ে সাদা চুলের গোছায় টান মারলেন কয়েকবার। তারপর দূর থেকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন চুনিলালবাবুর দিকে, "কোনও জায়গায় খুঁজতে বাকি রাখেননি? সব জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন?"

চুনিলালবাবু বিষণ্ণ হাসলেন। বললেন, "হ্যাঁ, প্রাণের দায়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি। যে করে হোক চুনিটা মহাজনকে ফেরত দিয়ে আমাকে আগে প্রাণে বাঁচতে হবে।"

পাখিগুলো ভীষণ আগ্রহ নিয়ে দেখছিলেন এসিজি। আর একই সঙ্গে কী যেন ভাবছিলেন।

নীচের তলা থেকে একটা বাচ্চার কান্না ভেসে এল। সেইসঙ্গে কোনও মহিলার বকাবকির শব্দ।

রঙ্গলালবাবুও বোধ হয় ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলেন। তিনি হঠাৎই বলে উঠলেন, "মেজদা, এমনও তো হতে পারে, বড়দা মারা যাওয়ার সময় চুনিটা কোথায় আছে সেটা বলার চেষ্টা করছিলেন—"

বোঝা গেল, মেজদার ধমকে স্বভাব-কবি তাঁর কাব্য প্র্যাকটিস আপাতত মুলতুবি রাখার চেষ্টা করছেন।

কিন্তু রঙ্গলালবাবুর কথায় ঝটিতি ঘুরে তাকালেন 'থিঙ্কিং মেশিন' অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

দু'ভাইয়ের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, "শেষ কথাটা আপনার ঠিক শুনেছিলেন?"

চুনিলাল ইতস্তত করে বললেন, "আমার তো 'পেলি না গো' বলেই মনে হয়েছিল। গোঙানির মধ্যে স্পষ্ট করে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।"

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, "তুই কী শুনেছিস, রঙ্গ?"

একটু আমতা-আমতা করে রঙ্গলাল বললেন "আমার...আমার যেন 'গেলি না গো' বলে মনে হয়েছিল...."

"এর তো বাংলাটাও গণ্ডগোলের।" এসিজি সিগারেটে টান দিয়ে বললেন, "বাক্যের প্রথমটা 'তুই' সম্বোধনে, আর শেষটা 'তুমি'....কেমন যেন গোলমেলে মনে হচ্ছে...."

রঘুপতি যাদব বেশ চিন্তিতভাবে রঙ্গলালবাবুকে বলল, "আপনি ওই শেষ কথাটা একবার আপনার বড়দার মতো করে বলে শোনাতে পারেন?"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। এ তো কোনও শক্ত কাজ নয়।" মেজদার দিকে একপলক তাকিয়ে রঙ্গলাল সোজা গিয়ে শ্যামসুন্দরলালবাবুর চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর টেবিলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন, "গেলি না গো, গেলি না গো!"

ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো টান-টান হয়ে গেলেন এসিজি। হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিলেন মেঝেতে। তারপর হো-হো হেসে উঠলেন। সে-হাসি আর

থামতেই চায় না।

ঘরের সকলেই তো এসিজির কাণ্ডকারখানা দেখে হতবাক।

রঘুপতি অবাক সুরে বলেল, "সার, কেয়া বাত হ্যায়? কোই চুট্‌কুলা ইয়াদ আয়া?"

কোনওরকমে হাসি থামিয়ে এসিজি বললেন, "চুট্‌কুলা—মানে, চুটকিও বটে, রঘুপতি। আশা করি তোমার মিষ্ট্রি সল্‌ভ হয়ে গেছে।"

চুনিলালবাবুকে লক্ষ করে তিনি বললেন, "একটা চিমটে এনে দিন। আপনার অমূল্য চুনি বোধ হয় আমি খুঁজে দিতে পারব।"

কথাটা শোনামাত্রই রঙ্গলালবাবু তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একটু পরেই তিনি ফিরে এলেন, হাতে একটা লম্বা চিমটে—যা দিয়ে অনায়াসে কোনও দৈত্যের মাথার পাকাচুল বাছা যায়।

রঙ্গলালের পিছু-পিছু যিনি এলেন, চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি গজেন্দ্রলাল।

চুনিলালবাবু তাঁকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় কীসব বলতে লাগলেন।

কিন্তু ততক্ষণে রঙ্গলালবাবুর হাত থেকে চিমটে নিয়ে স্টাফ করা পাখিগুলোর একটার কাছে গিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছেন অশোকচন্দ্র।

পাখিটা মাপে পায়রার চেয়ে ছোট। মেটে রঙের শরীরে কালো ছোপ-ছোপ দাগ। পেটের দিকটা সাদা। আর সরু লম্বা ঠোঁট।

এসিজি ওঁদের সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "এই পাখিটার নাম কাদাখোঁচা। মাছ, শামুক-টামুক খায়। নাকিসুরে ডাকে। গ্রামবাংলার সব জায়গাতেই দেখা যায়। এটার ডান চোখটা দেখুন— দেখেই বোঝা যায়, এটা নিয়ে কারিকুরি করেছে কেউ...."

এসিজি কথা বলতে-বলতেই ডান চোখের পুঁতিটা খুঁচিয়ে তুলে চিমটে দিয়ে তার ভেতরটা আরও খোঁচাচ্ছিলেন।

হঠাৎই বেরিয়ে পড়ল হারানো চুনিটা। মেঝেতে ঠিকরে পড়ে কয়েকবার লাফিয়ে তারপর থামল।

ঘরের আলোয় ওটা লাল আভা ছড়িয়ে চিকচিক করতে লাগল।

একটা অস্ফুট শব্দ করে চুনিলালবাবু ছুটে এসে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিলেন লাল টুকটুকে পাথরটা। ওটা শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে ঘরের সিলিংয়ের

দিকে মুখ তুলে চোখ বুজে আবেগ, থরথর গলায় বললেন, "মা তারা, ব্রহ্মময়ী!"

তারপর পাথরটা শার্টের বুকপকেটে রেখে এসিজির হাত চেপে ধরলেন, বললেন, "মিস্টার গুপ্ত, আপনি দেবদূত হয়ে আজ আমাকে বাঁচালেন—"

এসিজি হেসে বললেন, "আমি নয়, আপনাকে বাঁচিয়েছেন রঙ্গলালবাবু। উনি ঠিকই বলেছেন।

শ্যামসুন্দরলালবাবু মারা যাওয়ার সময় 'পেলি না গো, পেলি না গো' বলেননি, উনি বলেছিলেন, 'গেলি না গো গেলি না গো'। কথাটা বাংলা নয়—কাদাখোঁচা পাখির বৈজ্ঞানিক নাম। এই দেখুন, এই কার্ডে ইংরেজি আর লাতিন নাম—দুটোই লেখা আছে।"

সকলে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেল কার্ডে লেখা নাম দুটো: Fantail Snipe (Gallinago gallinago) ।

রঘুপতি যাদব এগিয়ে এসে অভিনন্দন জানাল এসিজিকে, "সার, য়ু আর এ জিনিয়াস!"

অশোকচন্দ্র নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, "সে শুধু তোমার মতে, রঘুপতি। নাও, এবার চলো—"

রঙ্গলালবাবু এসিজির সামনে এসে জোড়হাত করে দাঁড়ালেন। আকর্ণ হেসে ছন্দে বললেন, "প্রাচীন গ্রিসে জ্ঞানী ছিলেন অ্যারিস্টটল, আপনি আরও জ্ঞানী দুঁদে ব্যারিস্টট্‌ল।"

এসিজি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যারিস্টট্‌ল মানে?"

"ওই ওয়ার্ডটা আমার ইনভেনশন—" মাথা নামিয়ে বিনয়ের হাসি হাসলেন রঙ্গলাল, "কবিতার শেষটা মেলানোর জন্যে ব্যারিস্টার আর অ্যারিস্টটলের সন্ধি করেছি—"

আবার হো-হো করে হেসে উঠলেন ডক্টর অশোকচন্দ্র গুপ্ত।

মিঃ কাকুম্

সেকেন্দার আলি সেখ

ছোটবেলা থেকেই পটলামামা ভীষণ আড্ডারসিক। বাড়ির কাছাকাছি নদীপাড়ে-ই বসে আড্ডা দেয়। জায়গাটা মন্দ নয়। পড়ন্ত বিকেলে সূর্যটা যখন মুঠো-মুঠো আবীর ছড়িয়ে দেয় নদীর বুকে, তখন সারা নদীপাড় অপরূপ সাজে সেজে ওঠে। ক্ষয়সূর্যের লালিমা জলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। মনে হয়, কে যেন হাজার-হাজার ক্যুইন্টাল রঙ ঢেলে দিয়েছে নদীর জলে, ঢেউয়ের মাথায়। আবীর জলের সেই বর্ণচ্ছটা ঠিকরে এসে পড়ে ডায়মন্ড হারবারের সাগরিকা হোটেলে।

দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা নেমে আসে। জ্বলে ওঠে রাস্তার আলো। নদীর বুকে মাছ ধরার নৌকোগুলোতে জ্বলে ওঠে কেরোসিনের লম্ফ। ঠিক তখনই আড্ডার সদস্যরা একে একে আসতে থাকেন। কবি সুব্রত ভুঁইয়া আসেন, আসেন-শিল্পী অমলেন্দু বিকাশ দাস, লিটিল ম্যাগের সম্পাদক-আজিজুল হক, লোকাল একটা ইস্কুলের মাস্টার-তপন ত্রিপাঠী। সব্বাইকে নিয়ে জমে ওঠে আড্ডা। গান-হাসি-কবিতা-সিনেমা-খেলাধূলা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। শেষে সমবায় ভিত্তিতে চাঁদা দিয়ে চা-বিস্কুট খেয়ে, ইতি হয় আড্ডার।

রবিবার ছুটির দিনে পটলামামা কী জানি কী একটা কাজে অনেক আগেই পৌঁছে গেছে ডায়মন্ড হারবার। ষ্টেশন থেকে হাঁটা শুরু করবে, ঠিক তখনই

হন্যে হয়ে একজন বৃদ্ধ যাত্রী পটলামামাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'নদীপাড়টা কতদূর বলতে পারেন?'

—'মাত্র দশ মিনিটের রাস্তা। আমিও নদীর ধারে যাবো। আমার সঙ্গে যেতে পারেন। হেঁটে গেলেই হবে। অবশ্য আপনি রিক্সা-ভ্যান ধরতে পারেন।'

বৃদ্ধ লোকটিকে ঠিক যতটা দুর্বল ভাবা যায়, ততটা দুর্বল যে তিনি নন তা হাঁটাচলা দেখেই মনে হ'ল। দস্তুর মতো পটলামামার সঙ্গে সমানতালে হাঁটতে লাগলেন।

লোকটির বয়েস বড়জোর সত্তর হবে। মাথার চুল একটাও সাদা হয়নি। মুখের দাঁতগুলোও রয়েছে-সেই কিশোর বয়েসী-ছোকরার মত আস্ত। তবে বয়সের ছাপটা বোঝা যাচ্ছে মুখের ভাঁজ দেখে। কপালে-মুখে বয়সের বলিরেখা স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে। লোকটার মাথায় সাহেবদের মতো ঢেউ খেলানো টুপি। বুকে-কালো দড়িতে বাঁধা পাওয়ার ফুল চশমা, আর পকেটে হাত ঘড়ির মতো কী একটা যন্ত্র। যন্ত্রটা একবার একবার কানে লাগিয়ে কী যেন শুনতে থাকেন। কথা কম বলেন। চোখে-মুখে তাঁর শাণিত বুদ্ধিমত্তার ছাপ।

রাস্তা হাঁটতে-হাঁটতে পটলামামা-ই জিজ্ঞাসা করল—'এই ডায়মন্ডহারবার শহরে কী প্রথম এলেন?'

—'হ্যাঁ, জীবনে কোনদিন আসিনি।'

—'কোথায় যাবেন? কার বাড়িতে?'

—'কারোও বাড়িতে নয়, ইংরেজদের পুরানো কেল্লাটা দেখবো, তারপর ফলতায় মিঃ বোস মানে জগদীশ চন্দ্র বসুর ল্যাবরেটরিটা দেখতে যাবো।'

—'হঠাৎ কী মনে করে?'

বৃদ্ধ লোকটি পটলামামার প্রশ্ন শুনে মৃদু হেসে উঠলেন—'সেসব অনেক কথা। সেসব কথা নাই বা শুনলেন।' লোকটি প্রসঙ্গ চেপে যাবার চেষ্টা করলেন।

পটলামামা অহেতুক প্রশ্ন না করে বৃদ্ধ লোকটির সঙ্গে হাঁটতে লাগলেন পাশাপাশি। কাছাকাছি গিয়ে পটলামামা মনে-মনে একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—'সোজা চলে যান। সামনেই পুরানো কেল্লা—ডান হাতে ঘুরলেই।'

বৃদ্ধ লোকটি তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলে জানতে চাইলেন—'আপনি যাবেন না?'

—'না।' এই নদীপাড়ে বসে আড্ডা দেব।' পটলামামা পুরানো বটের নিচে বাঁধানো চাতালে বসে পড়ে।

—'ঠিক আছে, আমিও একটু রেস্ট নিই—, একটু পরেই না হয় যাবো।'

নদীর ঠাণ্ডা বাতাস মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মন প্রাণ জুড়িয়ে দিল দু'জনরাই। লোকটি টুপি খুলতে-খুলতে বলেন—'জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া অনেক জায়গায় ঘুরেছি কিন্তু শান্তি পেলাম কই! সত্যি এখানে একটা লাইফ আছে।'

আড্ডাপ্রিয় পটলামামা জানতে চাইল—'এত জায়গা আপনি ঘুরেছেন?'

—'ইয়েস, আমি সাতটা মহাদেশই ঘুরেছি।'

কথা বলার ফাকে পটলামামা সেই পুরানো প্রশ্নটা আবার একবার করল—'এত ঘোরাঘুরি কেন? তাছাড়া ডায়মন্ড হারবার এলেন কী মনে করে?'

বুড়ো লোকটি আনমনে বিড়বিড় করে বললেন,—

'আপনি যখন বাঙালি, তখন খুলেই বলি। কারণ, আপনি আমার দেশের লোক, নিশ্চয়ই আমার ক্ষতি করবেন না।'

পটলামামা উৎসাহের সঙ্গে বলে—'কথা দিলাম। আপনার কোনও ক্ষতি করব না বরং আপনাকে যতটা পারি হেল্প করবো।'

বৃদ্ধ লোকটি হ্যেঁ-হ্যেঁ-হ্যেঁ করে একটানা হাসির ঝড় তুলে বললেন—'চলুন তাহলে সামনে এগোই। আপনাকে সব বলছি—। সান-রে থাকতে -থাকতে ওটাকে খুঁজে নিতে হবে।'

—'কি খুঁজবেন?'

—'সব বলছি মশাই, সব বলছি।—আসুন।'

পটলামামার আড্ডা বসবে সেই সন্ধ্যেবেলা। এখন তো হাতে তেমন কাজ নেই। অবসর সময়টা কাটানোর জন্য আর লোকটির ডায়মন্ড হারবার আগমনের রহস্য জানার জন্য বলল—'চলুন তাহলে।'

পথ হাঁটতে-হাঁটতে লোকটি জানালেন—'নিশীথ সূর্যের দেশ' নরওয়ে-সুইডেন থেকে আসছি। ওখানকার এক লাইব্রেরিতে বই পড়তে-পড়তেই এসব কথা জানলুম।'

—'কি বই পড়লেন? কী কথা জানতে পারলেন?'

—'তাহলে ডিটেল্‌সেই বলি। ইন্ডিয়া যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, আইমিন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠনের সময় ওই বইটি লেখা হয়। রাইটার-ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন আর্মি মিঃ ভিনসেন্ট

থর্প। মিঃ থর্প সেই বইটি লিখেছেন তাঁর অভিজ্ঞতার নিরিখে। তিনি সেই সময় জার্মানী, জাপানে যুদ্ধ করার পর সৈনিক হিসাবেই চালান হয়েছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি ভূমিকাতে লিখে গেছেন, টানা তিন বছর ছিলেন, চিংড়িখাল ফোর্টে। ডায়মন্ডহারবার ফোর্টের তখন ওই নামই ছিল।'

পটলামামা মনের সব ক্ষোভ ভুলে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থাকে বৃদ্ধ লোকটির মুখের দিকে। সুদূর নরওয়ে থেকে তিনি কেনই বা এখানে এসেছেন তা জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে।

লোকটি বলতে লাগলেন—'মিঃ ভিনসেন্ট থর্প লিখে গেছেন- ভারতবর্ষের হাজার-হাজার উদ্ভিদের কথা। অবশ্য সে সব বিরল প্রজাতির উদ্ভিদ এখন সব পাওয়া যাবেনা। সব ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে অবশ্য আমারও মাথাব্যথা নেই। আমি জানতে পেরেছি 'সেপটোমালো সিনিগার গোস্ট' নামক এক উদ্ভিদের, ওই উদ্ভিদ ডায়মন্ড হারবারেই আছে। যতদূর জানা গেছে পৃথিবীর আর কোথাও নেই।'

পটলামামা জানতে চায়—' সেপটোমালো সিনিগার গোস্ট' এ ধরনের গাছ এখানে আছে বলে তো শুনিনি! ওই গাছ নিয়ে কী করবেন?'

—'হ্যেঁ-হ্যেঁ-হ্যেঁ একদম হেসে নিলেন সেই লোকটি। হাসি থামিয়ে বললেন—'মৃত্যুর পরে মানুষকে বাঁচানো যায় কীনা তা নিয়েই তো আমার গবেষণা। মৃত্যুর পর যেসব আত্মা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, তাদের—'

—'বুঝেছি, বুঝেছি। আপনি নিশ্চয়ই নতুন করে জন্ম নেবার কথা বলছেন? মৃত্যুর পর বেঁচে ওঠা কি সম্ভব? তাহলে তো মানবসম্পদের কোন অভাব থাকবে না?'

'রাইট। সেই সব আত্মাকে ভূত হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেই আমি মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে চাই। ওরা যাতে মানুষের মতো দেহধারণ করে কাজকর্ম, পড়াশোনা, গবেষণা করতে পারে, তার ব্যবস্থা আমি করবই। সব মৃত মানুষকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে চাই।'

পটলামামাও একজন ভূত বিশারদ। তাই সে মন দিয়ে সব কথা শুনতে-শুনতে বলে—' কিভাবে তা সম্ভব হবে? আমিও ভূত, ভৌতিক ও পরলৌকিক আত্মার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড্। আপনি আজই আমাকে আপনার অ্যাসিসট্যান্ট করে নিতে পারেন।'

—'ধন্যবাদ। আমিও গবেষণার সব কৃতিত্ব 'বাঙালিকরণ' করতে চাই। আমি বিদেশে থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ-তো আমার মাদারল্যান্ড। ইন্ডিয়াতে আমার ফান্ডামেন্টাল রাইট রয়েছে। হনুমান যেভাবে বিশল্যকরণী এনে মৃত লক্ষণের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, ঠিক তেমনিই 'সেপটোমালো সিনিগার গোস্ট' দিয়ে মৃত বাঙালির সব প্রাণ ফিরিয়ে দিতে চাই।'

পটলামামা ভ্রূ কুঁচকে জানতে যায়—' জানবেন কীভাবে সেই গাছটা কেমন?'

বৃদ্ধ লোকটি কোন উত্তর না দিয়ে, আঁতিপাতি করে খুঁজতে থাকেন নিজের ব্যাগ্। সেই ব্যাগ হাতড়ে বার করলেন পোকায় কাটা একটা বই—'এই দেখুন, এই দেখুন সেই ছবিটা।'

পটলামামা মনোযোগ দিয়ে 'সেপটোমালো সিনিগার গোস্ট' গাছের ছবিটা দেখতে থাকে। পাতাটা লাল বিছুটির মতো। তবে রঙটা ধূসর। কান্ডের পরতে-পরতে রেশমের মতো রোঁয়া। তার নিচে বিদেশি ভাষায় লেখা গাছের নাম।

লোকটি বললেন—'আপনি সুইডিস ভাষা জানেন?'

স্বীকার করল পটলামামা—'না জানিনা। বিদেশী ভাষা বলতে ইংরাজীটাই জানি।'

—'তাহলে কীভাবে হবে? এই বইটার তো ইংরাজী সংস্করণ হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

—'তাতে কী হয়েছে? আপনি পড়ে তর্জমা করে দিলেই হবে।'

—'বেশ-বেশ।'

কথা বলতে-বলতে হুগলী নদীর কিনারে এসে পৌঁছায় ওরা। পটলামামা বলে—'এটাই ইংরেজদের পুরানো কেল্লা। এখন এই এলাকাটা চেনবার উপায় নেই। নদী পাড় ভাঙতে-ভাঙতে দ্রুত এগিয়ে আসছে। তবে ওই দেখুন, সেই কেল্লা। ঘরগুলো আগে মাটির নিচে ছিল, কিন্তু এখন জোয়ারের জলে মাটি ধুতে-ধুতে, মাটির নিচের ইটগুলো বেরিয়ে পড়েছে।'

লোকটি জানাল—'হিউয়েন সাং, ম্যাগেলান, কলম্বাস সবার কথা পড়েছি। রাক্ষুসী নদী কোথায় খেয়ে নিয়েছে আবার কোথাও তাম্রলিপ্তের মতো, মানে তমলুকের মতো মাটি উগরে দিয়ে ডাঙা বানিয়ে দিয়েছে।'

কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ লোকটি খুঁজতে লাগলেন তার সেই প্রয়োজনীয় গাছ।

খেজুর গাছের জঙ্গল পেরিয়ে, বাবলা গাছের কাঁটা সরিয়ে দুঁদে উদ্ভিদ বিজ্ঞানীর মতো খুঁজতে লাগলেন 'স্টেপটোমালো সিনিগার গোস্ট'। তারপর একমুঠো মাটি তুলে বললেন—'যুগান্তরে সব উপাদানই পরিবর্তিত হয়। মাটির এ যা লক্ষণ দেখছি—এতো হাল্‌কা দোঁয়াশ বেলে মাটি। এই মাটিতে তো গাছটা জন্মাতে পারেনা।' তারপর অত্যন্ত ব্যথিত চোখে বৃদ্ধ লোকটি পটলামামাকে জিজ্ঞাসা করেন—'জানেন, এককালে এখানে প্রচুর নুন তৈরী হত। নদীর জলেও স্যালাইন ছিল খুব। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে নদীতে জল কমলে, নদীর পাড়ে নুন ফুটে ভুষোখড়ি হয়ে থাকত। সেই নুনের আস্তরণে সূর্যের আলো পড়লে তা চিক্‌চিক্ করত। সেটা দেখেই তো সাহেবরা এই জনপদের নাম দেয় 'ডায়মন্ড হারবার।'

পটলামামা ইতিহাসের কথায় মন না দিয়ে ভাবতে থাকে সেপটোমালোর কথা। গাছটা না পাওয়া গেলে ভূতেদের উদ্ধার হবে কী করে। তাই থাকতে না পেরে জিজ্ঞাসা করে—'গাছের তাহলে কী হবে? আপনি এতদূর থেকে এসে—।'

বৃদ্ধ লোকটি ক্লান্ত হয়ে পুরানো ভাঙ্গা কেল্লার এক ঢিবিতে ঠেস দিয়ে বসে বলেন—'জানেন, আপনার ওই ভূতেরাও খুব বিচ্ছু। সেপটোমালো সাত মহাদেশের কোথাও নেই, তা আপনাকে আগে বলেছি। এখন এখানে যা ছিল তাও বেটারা উপড়ে দিয়েছে নষ্ট করে দিয়েছে।'

—'কোথাও পাবেন না?'

—'পেতে পারি, তবে সেটা চেষ্টা সাপেক্ষ। আন্দামান দ্বীপে থাকতে পারে। গাছটা বানের তোড়ে এখান থেকে ভাসতে-ভাসতে বঙ্গোপসাগরের দিকে ভেসে যেতে পারে।'

পটলামামা অবাক চোখে জিজ্ঞাসা করে— আন্দামানের টুকরো-টাকরা অতো দ্বীপের মধ্যে সেপটোমালো কোথায় লুকিয়ে আছে, তা খুঁজবেন কী করে?'

—'সে ব্যবস্থা হবে। ওখানকার জারোয়া বা জঙ্গীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে কাজটা হাসিল করতে হবে। তবে তার আগে ফলতা থানার পাশে জগদীশ চন্দ্র বসুর বাগানবাড়িতে মানে ল্যাবরেটরিতে—একবার নথি খুঁজে দেখতে হবে।'

'দেখতে-দেখতে অন্ধকার নেমে আসে। জমাট অন্ধকারে ঢেকে যায় পুরানো

কেল্লা। বৃদ্ধ লোকটি আফশোষ করে বলেন—'আজও হেরে গেলাম। অন্ধকারে গাছ চেনা সম্ভব নয়। চলুন ফেরা যাক্।'

বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে পটলামামা ওঠে ডায়মন্ড হারবার কেল্লার মোড়ে। বাইরের অতিথিকে সম্মান জানানোর জন্যই পটলামামা বলল—'চলুন—। রেস্টুরেন্টে বসে একটু টিফিন করা যাক্।'

মোগলাই আর কফির অর্ডার দিয়ে পটলামামা টেবিলের এককোণে আসন নেয়। তারপর পকোড়া খেতে-খেতে জিজ্ঞাসা করে—'আপনি সেপটোমালো সিনিগার গোস্ট নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন?'

—'কেন? আপনি কি ইংরাজী কাগজ, মানে আপনাদের কলকাতা থেকে প্রকাশিত ' স্টেটসম্যান' পড়েননি? পড়ে জেনে নিতে পারেন। আমি তো এসব নিয়ে বহুদিন ধরে কাজ করছি।

পটলামামা অধীর আগ্রহে জানতে চায়—' ঠিকই তো, আমারই ভুল। এতক্ষণ আপনার সঙ্গে এত কথা বলছি, অথচ আপনার নামটা জানা হয়নি।'

—'আমার নাম কাকুম্। মানে মিঃ কাকুম্ নামেই দেশে-বিদেশে আমি পরিচিত।'

—'কাকুম্! এ আবার কী ধরনের নাম হল?' চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে পটলামামা।

বৃদ্ধলোকটি হো-হো করে হেসে উঠে বলেন—'আমার পুরো নাম শ্রী কার্তিক কুমার মন্ডল। অতো বড়ো নাম সহজেই কেউ উচ্চারণ করতে পারেন না। নাম নিয়ে তাই বিপত্তি হয়।'

—'কি রকম, কি রকম?'

—'সেবার বেজিং শহরে গিয়েছিলুম একটা সেমিনারে। ওখানকার রিপোর্টররা-ই আমার নামটা ছোট করে 'মিঃ কাকুম্-মিঃ কাকুম্' বলে আমাকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করল। পরদিন সকালে, ওখানকার খবরের কাগজ 'চায়না এক্সপ্রেস'-এ দেখলাম কার্তিক কুমার মন্ডল 'কাকুম্' হয়ে গেছে। পরে মস্কো শহরেও কাকুম্ নামটা বেশ রাতারাতি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। মস্কোবাসীরাও আমাকে কাকুম্ নামে ডাকতে লাগলেন। সেই থেকে ওই কাকুম্।'

পটলামামা মৃদু হাসির ঢেউ তুলে জিজ্ঞাসা করে—'আচ্ছা মিঃ কাকুম্, আপনি সেপটোমালো নিয়ে কীভাবে কাজ করবেন?'

—'সেসব অনেক কথা। আগেই বলেছি না, বিশল্যকরণীর মতো ভারতীয়

এই জড়িবুটির অনেক কদর। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি তো আমাদের দেশের বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের জন্য ওত্ পেতে বসে আছে। তেমনি, সেপটোমালো—যতদূর জানা আছে, প্রথম ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়। আমি ওই উদ্ভিদ নিয়ে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে—'

—'বুঝেছি, বুঝেছি। ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্র নিয়ে আমিও কমবেশি পড়াশোনা করেছি।'

গল্প করতে করতে মোগলাই খাওয়া শেষ হয়। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে মিঃ কাকুম্ বলেন—'ফলতা ঘুরেই আমি আন্দামান রওনা দেব। ক্যালকাটা পোর্টট্রাস্টের সদর অফিসে আমার বন্ধু মিঃ জগমোহন রয়েছেন। ওঁকেই আজ টেলিফোনে জানিয়ে দেব এম. ভি. হর্ষবর্ধনে-ই যাতে পরশুদিন পাড়ি জমাতে পারি, তার টিকিটের ব্যবস্থা করতে।'

—'আপনি সেপটোমালো পেলেন কী না তা জানব কী করে?'

—'নিশ্চয়ই জানতে পারবেন, নিশ্চয়ই জানতে পারবেন। আমি সেপটোমালো পাই না পাই, আন্দামান থেকে চিঠি দেব।'

মিঃ কাকুম্‌কে বিদায় দিয়ে বেশ বিষণ্ণচিত্তে পটলামামা ফিরে আসে সান্ধ্যকালীন আড্ডায়। আড্ডায় ইতিমধ্যে অনেকেই এসে গেছেন। এসে গেছেন কবি-শিল্পী-সাংবাদিক বন্ধুরা। আড্ডার বন্ধুরা কেউ সিগারেট টানছেন, কেউ লিটিল ম্যাগাজিনের প্রুফ দেখছেন, কেউবা খবরের কাগজ নিয়ে ভর সন্ধ্যেয় হুমড়ি খেয়ে রয়েছেন।

পটলামামাকে দেখেই অমলেন্দুবিকাশ-ই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন—'অমন মন খারাপ কেন মিঃ পটল?

পটলামামা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে ওদের সামনাসামনি এসে বসে।

আড্ডায় মধ্যমণি পটলার অমন মনমরা অবস্থা দেখে কবি সুব্রত ভুঁইঞা জানতে চান—'পটলবাবু, আপনার মুখে অমন কাজল কালো বাদল মেঘ কেন?'

তপন ত্রিপাঠীও রসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'পটলবাবু আপনার কী জাহাজ ডুবেছে? নিশ্চয়ই নয়! তাহলে মিছিমিছি বদন ব্যাজার কেন?'

পটলামামা গুম্ হয়ে বসেছিল। অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট করে বলল—'পাওয়া গেল না!'

—'কি পাওয়া গেল না।' সবাই হুমড়ি খেয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

—'গাছ।'

—'কি সেই গাছ? কী নাম? গাছটা কার দরকার?'

—'সেপটোমালো সিনিগার গোস্ট। এই গাছটা নাকি সাত মহাদেশের কোথাও নেই, রয়েছে আমাদের ভারতবর্ষে। আবার ভারতবর্ষের কথা বলি কেন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক আর্মি মিঃ ভিনসেন্ট থর্প লিখে গেছেন মানে ওই গাছটার হদিশ দিয়ে গেছেন ডায়মণ্ড হারবার কেল্লায়।'

—'সেকি! শেষে আমাদের ডায়মন্ড হারবার কেল্লায়!' অবাক বিস্ময়ে কথাটা উচ্চারিত হয় সবার মুখে।

—'হ্যাঁ, কেল্লার চারধারে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হল, কোথাও সেই সেপটোমালোর সন্ধান পাওয়া গেলনা।'

অমলেন্দুবিকাশ আবার রসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—'পটলবাবু আপনি ভূতন্তশাস্ত্র মানে ভূতের উপর থিসিস লেখা ছেড়ে দিয়ে, হঠাৎ উদ্ভিদতত্ত্ব নিয়ে মেতে উঠলেন কেন?'

—'উদ্ভিদতত্ত্বের আমি কী জানি! আমাকে নিয়ে গেলেন নরওয়ের এক ভদ্রলোক। উনিই অনেকদিন ধরে মৃত ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য গবেষণা করে বেড়াচ্ছেন। জড়িবুটি দিয়ে উনি পাচন তৈরী করে—'

কবি সুব্রত ভুঁইঞা পান চিবোতে-চিবোতে মুখ ভর্তি পানের পিক্ ফেলে, জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁট মুছতে-মুছতে জিজ্ঞাসা করেন—'কে সেই অমন লোক যে মরা মানুষকে বাঁচাবে? ভগবান ছাড়া কেউ কি মরা মানুষ—

—'না মানে, এখনও পারেননি, তবে পারবেন বলে আমিও আশা করি। ভদ্রলোক কেল্লা ঘুরে ওষুধের খোঁজে চলে গেলেন ফলতায় বোস ইনস্টিটিউটে। ওখান থেকে উনি আন্দামান যাবেন ওই সেপটোমালোর খোঁজে। আমিই তো ওনাকে বাসে তুলে দিয়ে এই আসছি।'

—'সেকি অমন লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলে না পটলবাবু?' তপন ত্রিপাঠী প্রিয়জন হারানোর মতো কষ্টে মুষড়ে পড়েন।

—'ভদ্রলোক কী আবার আসবেন?' সুব্রত ভুঁইঞায় প্রশ্ন।

—'ভদ্রলোকের নামটা কী?' অমলেন্দুবিকাশ জানতে চান।

পটলামামা ঢোক গিলে মুখের ঘামটা রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে বলে—'সেপটোমালোর সন্ধান পেলেই উনি আমাকে আন্দামান থেকে চিঠি দেবেন বলে গেছেন। আপনারা দেখবেন। ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে পৃথিবীর বুকে এক

অসাধ্যসাধন করে দেবেন। মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাতে পারলে আমার ভূতত্তশাস্ত্রও লেখা হয়ে যাবে।'

অমলেন্দু আবার জানতে চান—'ভদ্রলোকের নামটা কি?'

—'মিঃ কাকুম্।'

—'কাকুম্! উনি কী চাইনিজ?'

—'না, না। চাইনিজ নন, ইন্ডিয়ান। তবে গবেষণার তাগিদেই দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান।'

নামটা অমন খটোমটো কেন?

—'নামটা অমন খটোমটো নয়। ভদ্রলোকের পাসপোর্ট নেম্ কার্তিক কুমার মণ্ডল। বিদেশী রিপোর্টাররা ওটা সংক্ষেপ করে নিয়ে কাকুম্ নামেই ডাকে।' পটলা কাকুম্ নামের রহস্য খুলে বলতে থাকে।

সেই রহস্যের কথা মন দিয়ে শুনতে থাকেন সবাই। শুধু রেনেসাঁস লিটিল ম্যাগের সম্পাদক আজিজুল হক একমনে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে থাকেন।

পটলামামা আবার বলে—'দেখে নেবেন আপনারা, মিঃ কাকুম্ অচিরেই একদিন ওয়াল্ড ফেমাস মানুষ হবেন। আমি সামনের মাসের মধ্যেই চিঠি পেয়ে যাবো।'

—'পটলবাবু, আপনাকে তাহলেও তো আড্ডায় আর পাবোনা? আপনিও কাকুমের সঙ্গে বিদেশে পাড়ি দেবেন?'

—'আজ না হোক কাল তো আমাকে ফরেনে যেতেই হবে। ভূতত্তশাস্ত্র মানে ভূতের উপর থিসিস লেখা শেষ হলেই নোবেল অ্যাওয়ার্ডটা আনতে বিদেশে যেতে হবেই।'

আজিজুল হক কপালে একটা চাপড় মেরে বলে—'পটলাবাবু আপনার বিদেশে যাওয়া হচ্ছেনা।'

—'কেন? কেন?' পটলামামা অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করে।

—'আপনার বিদেশ যাওয়া হবেনা তার কারণ মিঃ কাকুম্ গতকালই ইহলোক ত্যাগ করেছেন। খবরটা—'

—'মিঃ কাকুম মারা গেছেন? ফুঃ—কী বাজে কথা বলছেন আজিজুলদা।' এইতো আধঘন্টা আগে ওনার সঙ্গে কেল্লায় ঘুরলাম। একসঙ্গে টিফিন সারলাম। ওনাকে বাসে তুলে দিয়েই তো এখানে এলাম।'

—'অ্যাবসার্ড হতেই পারেনা। উনি গতকালই ফলতা যাবার পথে দোস্তপুর মোড়ে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। এই দেখুন, এই দেখুন ডায়মন্ড হারবারের 'প্রতিবাদ' পত্রিকায় খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে।'

পটলামামা হুমড়ি খেয়ে খবরের কাগজটা দেখতে থাকে, তারপরে আনমনে খবরের কয়েক লাইন পড়ে ফেলে—'ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী কার্তিক কুমার মন্ডল (কাকুম্) শনিবার বিকালে ডায়মন্ড হারবার রোডের দোস্তপুরে পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। পুলিস সূত্রে জানানো হয়েছে, বিরল প্রজাতির সেপটোমালো সিনিগার গোস্ট নামক উদ্ভিদের খোঁজে তিনি নরওয়ে থেকে ডায়মন্ড হারবার আসেন। পরে ডায়মন্ড হারবার থেকে তিনি ফলতায় আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর বাগানবাড়িতে যাবার পথে দুর্ঘটনায়.....।'

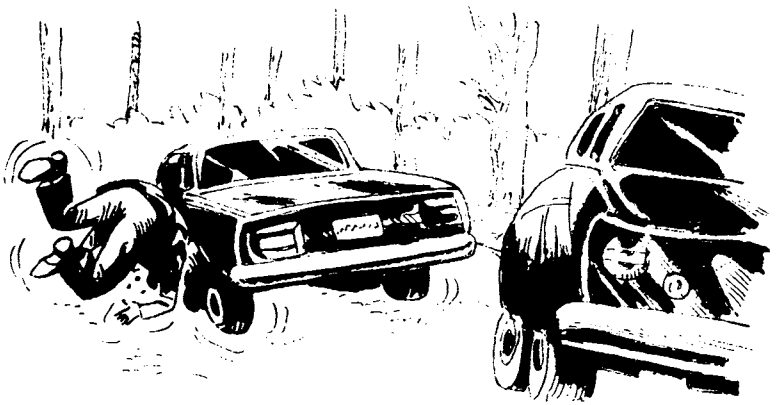

খবরের কাগজটা পড়া শেষ করেই পটলামামা ব্যর্থ সৈনিকের মতো এক বুক ব্যথা নিয়ে বলে—'আপন্ গড্। আমি—লোকটাকে তো আজই দেখলাম।'

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একজন অন্যজনের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। বন্ধুদের চোখের ভাষাতে পটলা একজন মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয় এবং মনের সব যুক্তি হারিয়ে ফেলে ভেঙ্গে পড়ে কাকুমের ব্যথায়।

মিঃ কাকুম্ উদ্ভিদবিজ্ঞানী না ভূত? সে প্রশ্নের উত্তর পটলামামা আজও মেলাতে পারেনি!

বিড়াল ভূত

নিরুপম ঘোষাল

আমার ঠাকুমা প্রায় বলতেন, বুঝলি ভাই, আমি মরেও তোদের ছেড়ে যাব না। কাছাকাছিই থাকব। আমি হেসে বলতাম, তুমি মারা গেলে তো ভূত হবে ঠাকুমা, মানুষ তো নও থাকবে কি করে? ঠাকুমা বলতেন, মানুষ যা পারে না, ভূত তা পারে। ভূত হল সাংঘাতিক জিনিস। বলতাম, তার মানে, তুমি মরে ভূত হয়ে কাছাকাছি থাকবে, ধরবে? রক্ত চুষে খাবে? ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে হেসে বলতেন, শোন নাতির কথা। তোদের ধরতে যাব কেন? তোরা তো আমার নিজের লোক। তোদের কেউ ক্ষতি করছে কিনা, সেটাই দেখব। বলতাম, আচ্ছা, তা নয় হল। কিন্তু থাকবে কোথায়? ঠাকুমা বলতেন, এত বড় বাড়ি উঠোন, গাছপালা। থাকার কি একটু জায়গা হবে না। নইলে সিঁড়িঘরের নিচে বিড়াল হয়ে থাকব। ঠাকুমার বয়স তখন নব্বই ছুঁই ছুঁই। এ বয়সেও লাঠি ভর দিয়ে ঠুক ঠুক করে হাঁটতেন। পুজোর ফুল তুলতেন। কুল আমের আচার রোদে দিতেন। কাঁথা সেলাই করতেন মাঝে মধ্যে। নিজে পান ছেঁচে খেতেন। কত গল্প যে জানতেন ভূত-প্রেত, দৈত্য দানব, রাক্ষস-খোক্কস, ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামী, জন্তু-জানোয়ার। বলতেনও বেশ মজা করে। রাত্রিবেলা ঘুমবার সময় তো শুনতামই। গরমের আর পুজোর ছুটিতে দুপুরবেলা খোলা বারান্দায় শীতল পাটি বিছিয়ে কত গল্প শুনেছি। ইস্কুলের

বন্ধুরা পর্যন্ত বলতো, ইস তোর কি মজা। ঠাকুমার কাছে কত গল্প শুনতে পারিস। আমাদের ঠাকুমাও নেই, গল্পও শুনতে পারি না।

ঠাকুমা মারা যাবার দিনটা মনে পড়ে। ভীষণ মনে পড়ে। সকাল থেকে বিছানায় শোয়া। কথা জড়িয়ে ঘরের সকলকে ডাকলেন। বাবাকে বললেন, তুই আজ অফিস যাস না। মাকে বললেন, বৌমা, নাতিকে খাইয়ে দাও। আমাকে বললেন, মন দিয়ে পড়াশুনো করবে ভাই। বাবা-মা'র কথা শুনবে কেমন?

আমি ছোট, টের পাইনি। বাবা-মা বুঝতে পেরেছিলেন। বাবা অফিস গেলেন না। ঠাকুমার ঘরে বসে রইলেন। সকালে মা আমাকে ভাত খাইয়ে দিলেন। মা বলেছিলেন, আজ তোমার স্কুলে যেতে হবে না। ঠাকুমার পাশে গিয়ে বসে থাক। মা নিজে রান্নাঘরে তালা লাগিয়ে ঠাকুমার পাশে এসে বসলেন। খবরটা পাড়ার কয়েকজনের কানে গিয়ে পৌঁছল। ঠাকুমার ঘরে প্রতিবেশিদের ভিড়। আমি দেখছিলাম, বাবা-মা'র চোখ ছল ছল। প্রতিবেশিরা নীরব। ঠাকুমা ক্ষণে ক্ষণে চোখ তুলে সকলকে দেখছেন, আবার চোখ বুজে থাকছেন। কিছু সময় এভাবে। হঠাৎ দেখি, ঠাকুমা চোখ খুলে সবাইকে দেখতে গিয়ে মাথাটা একবার ঝাঁকুনি খেয়ে, পরক্ষণে চোখ বুজে মাথাটা কাৎ হয়ে গেল। কিছু বুঝে ওঠবার আগেই বাবা ডুকরে কেঁদে উঠলেন মা-মা। সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চিৎকার কান্না, বাবা মা'র কান্না শুনে এবারে আমার কান্না পেয়ে গেল। অবুঝের মত আমিও কাঁদছি। প্রতিবেশিদের চোখেও জল। কেউ কেউ বাবা-মা'কে ঘিরে বোঝাচ্ছেন। ঘরের মধ্যে এতক্ষণের নিরবতা মুহূর্তে কান্না চিৎকার চেঁচামেচিতে পরিণত হল। কিন্তু যাকে নিয়ে সকলের কান্না চিৎকার, সেই ঠাকুমা নীরব। চোখ তুলে আর তাকাচ্ছেন না। এতক্ষণে বুঝলাম, ঠাকুমা আর নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এখন আমাকে কে গল্প শোনাবে। ভূত-প্রেত রাক্ষস-খোক্কস দৈত্য-দানব, ব্যাঙ্গামা-ব্যাঙ্গামী, জন্তু-জানোয়ারের গল্প। রাতেরবেলা বা গরম ও পুজোর ছুটিতে বারান্দায় পাটি বিছিয়ে ঠাকুমা আর আমাকে গল্প শোনাবে না। আমার কি কষ্ট। কয়েক রাত ঘুমোতে, খেতে পারিনি। দেখতে দেখতে ঠাকুমার শ্রাদ্ধশান্তি কাটল। ঠাকুমা নেই সত্যি হলেও আমার মনে হত ঠাকুমা আছেন। রোদে আচার দিতে গেছেন। নয়তো, পান ছেঁচে খাচ্ছেন। রাত হলে গল্প শোনাবেন।

মাত্র কয়েক মাস। অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটল বাড়িতে। সকাল থেকে একটা

সাদা বিড়াল বাড়িতে ঘুর ঘুর করতে দেখা গেল। রান্নাঘরে কেউ থাচ্ছে। কলপাড়ে এঁটো ফেলতে যাচ্ছে। বিড়ালটা পেছন পেছন মিউ মিউ ডাকছে। প্রথমে কেউ আমুল দেয়নি। কার না কার। কোত্থেকে এসেছে। চলেও যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু ও-মা। চলে যাবে কি। সিঁড়িঘরের নিচে গুল ঘুঁটের মাঝে মহানন্দে আস্তানা গেড়ে বসেছে। সারাদিন তো থাকেই। রাতের বেলা ঘুমায়। গুল ঘুঁটে নষ্ট না করে ফেলে এই ভয়ে, মা কখনও রেগে-মেগে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে। বাড়িতে কোনদিন বিড়াল কুকুর পোষা হয়নি। তাই আমার চোখে বিড়ালটা পড়লেই তাড়িয়ে বাড়ি ছাড়া করে দিয়েছি। কিন্তু না, ঘুরেফিরেই বাড়িতে সিঁড়ির নিচে। কতবার তাড়ানো যায়।

ঘরে বেশ ইঁদুরের উপদ্রব। সাঁ সাঁ করে এ ঘর সে ঘর, কার্নিশে, আলমারিতে দৌড়ে বেড়ায় । কুট কুট করে জিনিস-পত্তর কাটে, খায়। লেপ-কাঁথা বই-পত্তর আস্ত রাখে না। কিন্তু বিড়ালটা আসার পর থেকে ইঁদুরের উৎপাত প্রায় নেই বললেই চলে। রাতের অন্ধকারে বিছানা থেকেই টের পাই বিড়ালটা ইঁদুর তাড়া করে বেড়াচ্ছে। চিঁ চিঁ ডাক। ইঁদুরের লেজ কামড়ে হয়তো ধরেছে। নয়তো, বিড়ালের থাবা খেয়ে ইঁদুর পালাচ্ছে। আরেকটা ব্যাপার, রান্নাঘরের কোন জিনিসে ফাঁক পেলেও মুখ ছোঁয়ায় না বিড়ালটা। এসব কারণে, মা একদিন বাবাকে বললেন, দেখছি, বিড়ালটা আসার পর থেকে বাড়িতে ইঁদুরের উপদ্রব কমেছে। বাবাও বললেন, হ্যাঁ, লেপ-কাঁথা বই-পত্তরও এখন আর ইঁদুর কাটতে সাহস পাচ্ছে না। আমি বললাম, বিড়ালটা খুব ভাল, উপকারী। আমার কথা শেষ হতেই বাবা বললেন, আমার মা নয় তো? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিরে তোর ঠাকুমা নয় তো বিড়ালটা? মনে নেই তোকে ঠাকুমা বলত না, আমি মারা গিয়েও তোদের কাছাকাছি থাকব। সিঁড়িঘরেও থাকতে পারি। মা বললেন, হ্যাঁ মা প্রায় এমন কথা বলতেন। ব্যস, আমার মনে পড়ে গেল ঠাকুমার সেই কথা। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, বিড়াল ঠাকুমা বিড়াল ঠাকুমা—দৌড়ে গেলাম সিঁড়িঘরের নিচে। দেখি বিড়ালটা শুয়ে আছে। আমাকে দেখে ডাকল। সত্যি ঠাকুমা কথা রেখেছে। ভেবে, মনটা খুশিতে ভরে গেল।

এরপর, বিড়ালের ঘরটা ঠিক করে দিলাম। গুল ঘুঁটের ফাঁকে একটা কাঠের বাক্স বসিয়ে দিলাম। সামনে শীত আসছে ভেবে, সিঁড়িঘরের মুখে মায়ের

পুরনো কাপড় ঝুলিয়ে দিলাম। খাবারের সময় ডেকে বসাই। পাত থেকে খাবার তুলে দিই। বিড়ালটা মহানন্দে খায়। ঘুমায়। মা আর বিড়ালটাকে তাড়ান না। বরং বিড়ালটাকে ডেকে খাবার দেন। খোঁজখবর রাখেন বাবা। এভাবে, সেই বিড়ালটা ওরফে ঠাকুমা হয়ে উঠল ঘরের একজন। এখন আর কোথায়ও যায় না। ঘরেই ঘুর ঘুর করে। কেউ ডাকলে মিউ করে সাড়া দিয়ে কাছে আসে। পা চাটে। লেজ গুটিয়ে গা ঘেঁসে বসে। কারও বিছানায় শুয়ে থাকে। এর মধ্যে হয়েছে কি, রাত তখন সামান্য গভীর। আমরা সবে শুয়েছি। হঠাৎ একসঙ্গে অনেক গুলো মিউ মিউ ডাক। বাবা বললেন, ব্যাপার কি? মা অন্ধকারে লাইট জ্বালিয়ে, দরজা খুলে সিঁড়িঘরের সামনে আসতেই, বলে উঠলেন ও-মা, বিড়ালটা কি সুন্দর সুন্দর বাচ্চা দিয়েছে। মায়ের কথায় বাবা উঠে এলেন। আমিও ধড়ফড় করে বিছানা ছেড়ে এলাম। উফ্ কি আনন্দ। দেখি, তিনটে বাচ্চা বিড়াল। বড় বিড়ালটাকে ঘিরে চকচক করে দুধ খাচ্ছে। বাবা বললেন, বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। মা পুরনো কিছু কাপড় এনে বিড়ালগুলোর গায়ে চাপিয়ে দিলেন। বাবা বলেন ঘরে দুধ হবে? মা বললেন হবে। মা দুধটাকে সামান্য গরম করে বিড়ালগুলোকে দিল। বাচ্চা বিড়ালগুলো খেল না, বড় বিড়ালটা খুশিতে খেল। আমার সারারাত চোখে ঘুম নেই। কখন সকাল হবে। খালি মনে পড়ছিল ঠাকুমার কথা। বাবা খুব ভোরে অফিস যান। মাকে তাই অনেক সকালে উঠতে হয়। আমি উঠি তার অনেক পরে। কিন্তু সেই রাতের পরদিন বাবা মায়ের সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙলো। চোখমুখ কচলেই এক দৌড়ে সোজা সিঁড়িঘর। কিন্তু অবাক কাণ্ড, সিঁড়িঘরে কোথায় বিড়াল, কোথায় বিড়ালের বাচ্চা। সিঁড়িঘর, কাঠের বাক্স ফাঁকা। আমার চোখ ফেটে যেন জল আসছিল। মা যখন বললেন, আমি তখনই সন্দেহ করেছিলাম, বিড়ালটা বাচ্চা দেবার মতলবে সিঁড়িঘরে আস্তানা গেড়েছিল। বাবাকে তখন দেখি মিটিমিটি করে হাসছেন। আমার তখন শুধুই মনে হচ্ছিল, ঠাকুমা বিড়াল হবে কেন ঠাকুমা কি এতই ফেলনা। ঠাকুমা মরে ভূত হলেও বিড়ালটা নয়।

সমাপ্ত